৯ অগস্ট ১৯৮৯ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ সাত টাকা

নবলক্ষমেলা

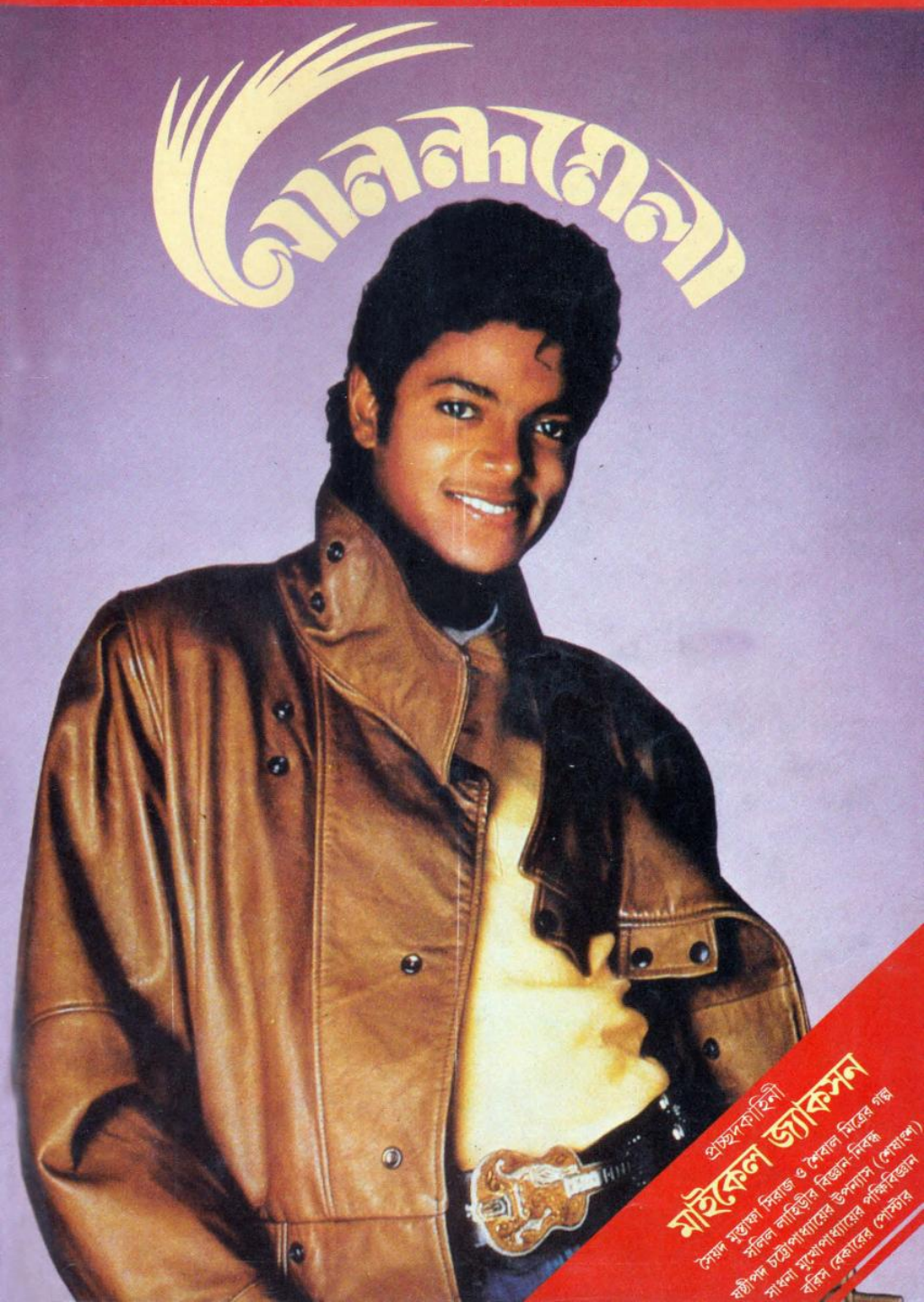

প্রচ্ছদকাহিনী
মাইকেল জ্যাকসন

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও শৈবাল মিত্রের গল্প
সলিল লাহিড়ীর বিজ্ঞান-নিবন্ধ
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস (শেষাংশ)
সাধনা মুখোপাধ্যায়ের পক্ষিবিজ্ঞান
বরিল বেহারের পোস্টার

মিল্ক বিকিস-এর স্নেহ পেলে
ভবিষ্যৎ হয় ঝলমলে

ব্রিটানিয়া মিল্ক বিকিস
বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সা

ব্রিটানিয়া

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - বুকলাভার

স্ক্যান করেছেন - বুকলাভার

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা আপনি স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে শীঘ্রই নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

পরিবারের স্বাস্থ্যের জন্যে বরদান

১ কিলো চকোলেট কমপ্লান

Complan®

COMPLETE PLANNED FOOD
CHOCOLATE FLAVOUR

FREE!
Collect a ceramic mug with this pack.

No need to add milk

বিনামূল্যে!

৫০০ গ্রামের দুটিন চকোলেট কমপ্লান কেনার বদলে, ১ কিলোর একটিন কিনুন আর ৪/- টাকা বাঁচান, সঙ্গে লাভ করুন বিনামূল্যে একটি সেরামিকের মগ্ !
কমপ্লান-এ আছে আপনার পরিবারের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ।

আজই কিনুন!

23
সুপরিকল্পিত মাত্রায়,
২৩টি একান্ত
প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ

কমপ্লান®

GX/58/244 BEN

Sreeleathers Sreeleathers Sreeleathers

বাবু বিবি ছুট্‌ফটে
খেয়ালী ও মজারু
বুদ্ধিমান প্রমাণ করে
পিঠে রেখে ক্যাঙারু

Kangaroo
School Bag,

- ওয়াটার প্রুফ
- শক্তপোক্ত
- সুন্দর দেখতে
- টেকসই
- টিফিন বক্স আর ওয়াটার বট্‌লের জন্য দু'টি আলাদা পকেট

A Quality Product of—
Sreeleathers
3, Lindsay Street, Calcutta-700 087
Phone : 29-9611

Sanchar

For trade enquiries write to :
SANCHAR
MEDIA COMMUNICATION NETWORK
6A, Metropolitan Bldg
7, J. L. Nehru Road CAL-13 Tel: 28-8268

সূচীপত্র ২৪ শ্রাবণ ১৩৯৬ □ ৯ অগস্ট ১৯৮৯ □ ১৫ বর্ষ ৯ সংখ্যা

আনন্দমেলা

সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)

গোয়েন্দা তাতারের দ্বিতীয় অভিযান
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৭০

গল্প

জ্যোৎস্নারাতের বিপদ-আপদ
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১৪
চক্রান্ত ফাঁস শৈবাল মিত্র ৬৪

প্রচ্ছদকাহিনী

মাইকেল জ্যাকসন স্বপ্নাতীত সরকার ৩২
সারা পৃথিবী জুড়ে···গৌতম চক্রবর্তী ৩৭

ধারাবাহিক উপন্যাস

উদাসী রাজকুমার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৯২
ঝিল্লির খই, লাল বাতাসা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭

বিজ্ঞানবিচিত্রা

পাখি ও শাবকের কথা সাধনা মুখোপাধ্যায় ১১
বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ২৩
মেরি কুরি চঞ্চল পাল ২৪
মহাকাশ-দূষণ সলিল লাহিড়ী ২৬

ভ্রমণ

বুড়িবালামের তীরে বীথি বসু ৫২

কবিতা

নস্যি শৈলেনকুমার দত্ত ১৯
দেখেছি কালিদাস ভট্টাচার্য ১৯

কেরিয়ার গাইড

সাংবাদিক হতে গেলে অমর দাশ ৮১

বিদ্যালয়-পরিচিতি

শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুল রেবা ঘোষ (মৈত্র) ৮৫

কমিকস

টারজান ৩১, রোভার্সের রয় ৬১, গাবলু ৬৯, টিনটিন ৮৭, পঞ্চরত্ন ৮৯

খেলাধুলো

বিশ্বকাপ ফুটবলে···তানাজি সেনগুপ্ত ৪১
বিশ্বকাপের মূল পর্বে···কৃশানু ভট্টাচার্য ৩২
মাঝমাঠের লড়াই গৌতম সরকার ৪৩
রোয়িংয়ে বাংলার ছেলেমেয়েরা চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫
প্রতিকূল স্রোতে উর্মিলা-সুমিতা অমিতাভ রায় ৪৬
খেলার খবর ৪৭
সফল স্টিভ সুজন সেন ৪৮
শিশির ঘোষ ৪৯, বরিস বেকার ৫০

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিচাপাটি ৬, আকাশ চেনো ৮, বাইরের জানালা ১০, কুইজ ২০, আকাশে ওড়ার কথা ৩০, দেহসৌষ্ঠব ৪৮, নিজের হাতে বানাও ৬৩, শব্দসন্ধান ৬৭, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৯১, কে প্রথম ৯৪, নানারকম ৯৬, বইয়ের খবর ৯৮

৫২

দূর বিদেশে নয়, বাড়ির কাছেই আছে অনেক দ্রষ্টব্যস্থান। আছে সমুদ্র কিংবা পাহাড়। আছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নানা জায়গা। শুধু বেরিয়ে পড়লেই হল। এবারের

৩২

বিশ্বজোড়া নাম মাইকেল জ্যাকসন-এর। কোনও অনুষ্ঠানে তিনি গান গাইতে গেলে সেখানে যেমন ভিড় করেন লক্ষ মানুষ, তেমনই তাঁর ব্যক্তিগত জীব নিয়েও সর্ব সাধারণের কৌতূহলের শেষ নেই। আশ্চর্য তাঁর জীবন-যাপন। আবার বিপুল খ্যাতি অর্থ ও প্রতিষ্ঠা পেয়েও তিনি তাঁর শৈশবের সারল্য এতটুকুও বিসর্জ দেননি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শিশুরা তাঁর বন্ধু। আফ্রিকার দুঃস্থ মানুষদের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে। তিনি সবার শিল্পী। সবার মুখে-মু একটাই নাম : মাইকেল জ্যাকসন তাঁকে নিয়েই এবারের প্রচ্ছদকাহিনী

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল
শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য
সহযোগী □ প্রবীর সেন, দেবাশিস সেনগুপ্ত

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার। দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

ভ্রমণ বুড়িবালামের তীরে এরকমই সুন্দর একটি জায়গায় । কলকাতা থেকে ওড়িশার বালেশ্বরের দূরত্ব ২৩২ কিলোমিটার । বালেশ্বর থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রসৈকত । চোখে পড়বে চাঁদিপুরে ফুলের সমারোহ । আর আছে অস্তগামী সূর্য ।

২৬

আমাদের এতদিন ধারণা ছিল, নিম্নাকাশ অর্থাৎ ট্রপোস্ফিয়ার নানা কারণে দূষিত হয়েছে, কিন্তু তার ওপরে মহাকাশ বা স্ট্রেটোস্ফিয়ার এবং তারও ওপরে মেসোস্ফিয়ার একেবারে দূষণহীন । মহাকাশ নিয়ে দুর্ভাবনা ছিল না এতদিন । মহাকাশও কী করে দূষিত হচ্ছে সে-বিষয়ে একটি নিবন্ধ ।

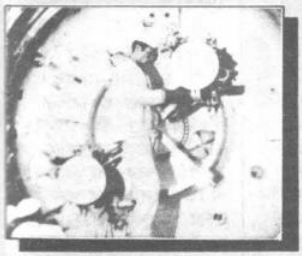

১৪

জটাবাবার পা অত ঠাণ্ডা কেন ? জটাবাবা কি জ্যান্ত মানুষ ? সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ভূতের গল্প 'জ্যোৎস্নারাতের বিপদ-আপদ' ।

৫০

উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতায় বরিস বেকার যে সাফল্য দেখিয়েছেন সাম্প্রতিককালে তার নজির পাওয়া কঠিন । পশ্চিম জার্মানির এই টেনিস-খেলোয়াড় পৃথিবীর সব দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন । তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে । এবারের বড় আকর্ষণ বরিস বেকারের পোস্টার ।

আগামী সংখ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ ঘোষ ও অসীমরতন ঘোষের প্রচ্ছদকাহিনী

কলকাতা ৩০০

অরবিন্দ গুহর গল্প

দেশলাই

রতন ভট্টাচার্যের উপন্যাস (প্রথমাংশ)

রেলগাড়ির কামরায়

Disproportionate Returns for SMALL INVESTMENTS & What more & Old age Pension too.

INVEST in your CHILD'S STUDIES.

In doing so:

1) You have done your duty to your child.

2) You have assured him good future too.

3) You have insured your future too.

What steps You have to take?

ADMISSION TO TURNING POINT SCHOOL

Can be a TURNING POINT in the life of your child.

* **An Exclusively English Medium Boarding School**

Admission open from Class I to VII. One class will be added each year till Class X. (CBSE syllabus) It is a SCHOOL Sponsored & run by

LINKMAN INSTITUTE

52/B Rash Behari Ave Jn. (Lane opp. Gurudwara) Calcutta 700 026 Mon-Sat: 6 am—8 pm. Sun: 12 noon—6 pm

Enquiries: Phone: 46-5137.

* The School is within greater Calcutta.

বাঙালি জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দ চন্দ্র

'আনন্দমেলা'য় প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রয়াত রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরূপরতন ভট্টাচার্যের দু'টি মূল্যবান প্রবন্ধ (১২ জুলাই সংখ্যায়) প্রকাশ করে আপনারা সমগ্র জাতির ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। প্রবন্ধ দুটিতে এই প্রচারবিমুখ বিজ্ঞানসাধকের প্রতি শুধু যে শ্রদ্ধাই নিবেদিত হয়েছে তাই নয়, তাঁর অসামান্য পারদর্শিতার পরিচয় তথ্য সহযোগে তুলে ধরা হয়েছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দ চন্দ্র প্রসঙ্গে আমার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা নিবেদন করি। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বারাসাতের নবপল্লীতে অবস্থিত সত্যভারতী বিদ্যাপীঠে সেখানকার কর্তৃপক্ষ শ্রদ্ধেয় রাধাগোবিন্দ চন্দ্রকে সংবর্ধনা দেন। আমি তখন ওই বিদ্যাপীঠের নবম শ্রেণীর ছাত্র। জীবন-সায়াহ্নে এই নক্ষত্রবিদ তাঁর অসাধারণ সম্পদ টেলিস্কোপ ও লক্ষাধিক টাকা মূল্যের ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহ বিদ্যাপীঠকে দান করেন। সেদিনের সেই ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের কথা আজও আমার মনে আছে। অনুষ্ঠানের অন্যতম বক্তা বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ প্রয়াত চণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন, "ভয় হয়, এ দানের দায় গ্রহীতারা যথোপযুক্ত বইতে পারবেন কি না !" অনুষ্ঠানের সভাপতি মহকুমাশাসক কিরণচন্দ্র ঘোষাল বলেছিলেন, "এক অমূল্য সম্পদ পেয়ে ধনী হল সত্যভারতী বিদ্যাপীঠ।" দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, চণ্ডিকাপ্রসাদবাবুর আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হয়েছে। সে গ্রন্থসংগ্রহ আজ ভস্মীভূত। ১৯৭১ সালে রাজনৈতিক গণ্ডগোলের সময় কিছু দুষ্কৃতকারী গোটা লাইব্রেরিটাই আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এবং যতদূর জানি একদিনের জন্যও ওই টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ-পর্যবেক্ষণ ঘটেনি। টেলিস্কোপটি আজ কোথায় কী অবস্থায় আছে জানি না।

এই জ্ঞানতাপস বৃদ্ধের জন্মদিনের প্রভাতে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডঃ অমূল্য গুপ্ত (বর্তমানে তিনি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের পদার্থবিভাগের প্রধান), বিদ্যাপীঠের প্রধানশিক্ষক প্রয়াত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সহকারী প্রধানশিক্ষক কালীপদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেতাম। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এই জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সঙ্গে আমার

যোগাযোগ ছিল। কর্মোপলক্ষে ১৯৬৮ সাল থেকেই আমি বারাসাতের বাইরে। শুনেছি তাঁর শেষ জীবন খুবই দুরবস্থায় কেটেছে। অভাব-অনটন ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও তাঁর সাধনায় ভাটা পড়েনি। ১৯৭৫ সালে তাঁর পরলোকগমনের সংবাদ পেয়ে স্বজনবিয়োগের বেদনা অনুভব করেছিলাম।

প্রবন্ধলেখক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, হার্ভার্ড মানমন্দির থেকে যে ছ' ইঞ্চি ব্যাসের দূরবিনটি (টেলিস্কোপ) চন্দ্র মহাশয় পেয়েছিলেন সেটি তাঁর সামর্থ্য (এখানে অমলেন্দুবাবু সামর্থ্য বলতে নিশ্চয়ই শারীরিক সামর্থ্যের কথা বলতে চেয়েছেন) কমে আসায় সদ্ব্যবহার করা সম্ভবপর হবে না বলে কোনও তরুণ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষের অনুরোধে প্রয়াত নক্ষত্রবিদ হায়দরাবাদের এক তরুণ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এম. কে. ভেইনু বাপ্পু-র হাতে সেটি তুলে দেন। আমার অনুসন্ধিৎসু মনে প্রশ্ন জেগেছে কোন সালের কত তারিখে চন্দ্র মহাশয় দূরবিনটি শ্রীভেইনু বাপ্পু-র হাতে তুলে দেন ? কীভাবে তিনি দেন ? কোনও অনুষ্ঠান হয়েছিল কি ? হলে, কবে এবং কোথায় ? ১৯৫৯ সালে সত্যভামা বিদ্যাপীঠকে তিনি যে দূরবিনটি দান করেন সেটিও ছিল ছ' ইঞ্চি ব্যাসের এবং যতদূর জানি সেটি তিনি বিদেশ থেকে পেয়েছিলেন। যদি কোনও বিদগ্ধ ব্যক্তি এ-ব্যাপারে কিছু জানাতে পারেন তা হলে কৃতজ্ঞ থাকব।

পীযূষকান্তি ঘোষ
কাটোয়া

প্রায়-অপরিচিত জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দ চন্দ্র সম্পর্কে 'আনন্দমেলা'র ১২ জুলাই সংখ্যায় 'বিজ্ঞানসাধক রাধাগোবিন্দ' ও 'রাধাগোবিন্দের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি' লেখা দু'টির জন্য অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। লেখকদ্বয়কে জানাই ধন্যবাদ। দ্বিতীয় রচনাটিতে রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের বিস্মৃতপ্রায় 'সবিতা ও ধরণী' পাণ্ডুলিপিটির পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গত, 'সবিতা ও ধরণী' ছাড়া একই লেখকের 'তারা চিনিবার সহজ উপায়', 'নক্ষত্রজগৎ' ও 'সৌরজগৎ'—এই তিনটি রচনা এখনও পাণ্ডুলিপির আকারে রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী কিছুদিনের মধ্যে 'সৌরজগৎ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে। বাকি দু'টিও গত কয়েক বছর ধরে মুদ্রণের অপেক্ষায় আছে। 'তারা চিনিবার সহজ উপায়' পাণ্ডুলিপিটি ১৩২৬ বঙ্গাব্দে লেখা।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা জটিল বিষয় নিয়ে রাধাগোবিন্দের বহু রচনা পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তাঁর গবেষণাকর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন।

রণতোষ চক্রবর্তী
সম্পাদক, রাধাগোবিন্দ চন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতি
নবপল্লী, বারাসাত
২৪ পরগনা (উত্তর)

আসল আর নকল ডাকটিকিট চেনার উপায়

আমি একজন ডাকটিকিট-সংগ্রাহক। আমার কাছে পাঁচশোর বেশি ডাকটিকিট আছে। কিন্তু কোন ডাকটিকিট আসল আর কোনটা নকল সেটা একেবারেই বুঝতে পারি না। এর ফলে আমাকে অনেকবার ঠকতে হয়েছে। দোকানে যেসব ডাকটিকিট কিনতে পাওয়া যায় তার কোনগুলি নকল ?

পম্পি চৌধুরী
এস-এন-কলোনি, বারাসাত
২৪ পরগনা (উত্তর)

চিঠির উত্তর : সংগ্রাহকদের সুবিধার জন্য জাল ডাকটিকিট সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য দেওয়া হল :

১) কিছু দোকানে অনেক সময় ডাকটিকিট বলে যা বিক্রি করা হয়, সেগুলি কোনও ডাকটিকিটই নয়। দেখতে কিন্তু অবিকল ডাকটিকিট, ধারের খাঁজকাটা দাঁত থেকে শুরু করে দেশের নাম, দাম সবই থাকে। কিন্তু সে নামে হয়তো কোনও দেশই নেই, বা থাকলেও সেগুলি নকল। স্টেট অব ওমান,

আনন্দমেলা
গ্রাহকদের জন্য বিশেষ ছাড়
এক বৎসর
১৮২·০০ টাকার পরিবর্তে
১৫৫·০০ টাকা (২৬ সংখ্যা)
দুই বৎসর
৩৫৪·০০ টাকার পরিবর্তে
৩০০·০০ টাকা (৫২ সংখ্যা)
আপনি যদি গ্রাহক হতে ইচ্ছুক হন তবে সত্বর আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানাসহ প্রয়োজনীয় ড্রাফট আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের নামে নিচের ঠিকানায় পাঠান :
সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১
ডাক মাশুল লাগবে না

ফিউজেরিয়া, স্কটল্যান্ড, তিব্বত, সিকিম, শারজা, স্টাফা, ডুফার, আজমান স্টেট, মানামা, আম-অল কোয়াইন ইত্যাদি দেশের ডাকটিকিট কেনার সময় একটু সতর্ক হওয়া দরকার।
২) এইসব তথাকথিত ডাকটিকিট স্ট্যানলি গিবন্স কিংবা অন্য কোনও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসম্পন্ন ক্যাটালগে তালিকাভুক্ত নয়। এগুলি 'লেবেল' নামে পরিচিত।
৩) 'লেবেল'-এ ডাকটিকিটের মতো পূর্ণ বিক্রয়মূল্য থাকে না।
৪) কোনও স্বীকৃত প্রদর্শনীতেও এই লেবেলের কোনও ঠাঁই নেই।
৫) সাধারণত ডাকটিকিটে উল্লেখ থাকে কী উপলক্ষে সেটি প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু নকল ডাকটিকিটে বা লেবেলে এসব কিছুই লেখা থাকে না।
৬) সত্যিকারের বা 'জেনুইন ডাকটিকিট' চেনার একমাত্র উপায় হল স্ট্যাম্প ক্যাটালগ অনুসরণ করা। সেই সঙ্গে আনন্দমেলা'র মতো পত্রিকা পড়া, যাতে নতুন নতুন ডাকটিকিটের খবর থাকে।

কবিতা রায়

মুরলিধর গার্লস' হাই স্কুল

'বিদ্যালয়-পরিচিতি' বিভাগে প্রকাশিত মুরলিধর গার্লস' হাই স্কুল (১২ জুলাই সংখ্যায়) সম্পর্কে সুলগ্না মুখোপাধ্যায়ের লেখায় কয়েকটি ভুল আছে। এগুলির সংশোধন বাঞ্ছনীয়। এই স্কুলের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে অন্যতম বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়, বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায় নন। শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু, শিপ্রা বসু নন। এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার ফুটবল খেলোয়াড় এবং শ্রীমতী চিরশ্রী বিশী স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও রবীন্দ্র-গবেষক প্রয়াত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের কন্যা। তিনি এই বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী এবং বর্তমানে দিল্লির একটি বিখ্যাত কলেজের বাংলার অধ্যাপিকা।

অপর্ণা রায়
সহ প্রধানশিক্ষিকা,
মুরলিধর বালিকা বিদ্যালয়
কলকাতা-২৯

জিমনাস্টিক্স

নানা বিষয় নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনী লেখা হয় 'আনন্দমেলা'য়। আমার অনুরোধ, যদি জিমনাস্টিক্স নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনী হয় তা হলে বিশেষ উপকৃত ও বাধিত হব।

কল্যাণ মণ্ডল
কলকাতা-৩৫

যোহান্স গুটেনবার্গ

দৈনন্দিন জীবনে ছাপাখানার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এই ছাপাখানার প্রসঙ্গে 'আবিষ্কারের নেপথ্যে' বিভাগে যোহান্স গুটেনবার্গ প্রসঙ্গে চঞ্চল পালের লেখাটি (৩১ মে সংখ্যায়)

আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। চঞ্চলবাবুকে অশেষ ধন্যবাদ। আশা রাখি, তিনি এরকম যুগান্তকারী আবিষ্কারকদের প্রসঙ্গ নিয়ে 'আনন্দমেলা'য় আরও লিখবেন এবং আমাদের সামনে তাঁদের তুলে ধরবেন।

মৃণালকান্তি ঘোষাল
পানিত্রাস, হাওড়া

'বাইরের জানালা' চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠছে

গত ৩ মে সংখ্যায় 'বাইরের জানালা' বিভাগে সুভাষ চক্রবর্তীর 'রেইনম্যান-এর হফম্যান' লেখাটির জন্য তাঁকে এবং আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এই বিভাগটি অতীব আকর্ষক হয়ে উঠছে।

চন্দনা মুখার্জি
কলকাতা-১৯

১৯ এপ্রিল 'আনন্দমেলা কুইজ প্রতিযোগিতা'র ফল

(১) কোন গ্রহকে পৃথিবীর যমজ বলা হয় ?
উত্তর : শুক্রগ্রহ।
(২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটিকে বলা হয় 'জিপ কোড'। আমরা কী বলে থাকি ?
উত্তর : পিন কোড।
(৩) 'দি ফল অব আ স্প্যারো' গ্রন্থের লেখক কে ?
উত্তর : সেলিম আলি।
(৪) সাঁওতালদের লিপিকে কী বলা হয় ?
উত্তর : অলচিকি।
(৫) অ্যাথলেটিক্সে ডেকাথলন কতদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় ?
উত্তর : দু' দিন।
(৬) নিয়নবাতির ফিলামেন্ট কিসের তৈরি ?
উত্তর : নিয়নবাতিতে ফিলামেন্ট থাকে না।
(৭) নীচের ছবিটি কার ?
উত্তর : জে· আর· ডি· টাটার।
(৮) মহাভারতে কর্ণের ধাত্রী-জননী কে ?
উত্তর : রাধা।
(৯) ভুটানের সরকারি ভাষার নাম কী ?
উত্তর : জংখা।
(১০) সোল ওলিম্পিকে ভারতীয় হকি-দলের ক্যাপ্টেন কে ছিলেন ?
উত্তর : সোমাইয়া।
(১১) মহিউদ্দিন মহম্মদ কী নামে মুঘল সম্রাট নামে পরিচিত ছিলেন ?
উত্তর : ঔরঙ্গজেব।
(১২) কোন আবিষ্কারের প্রসঙ্গে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখ করে থাকি আমরা ?
উত্তর : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লারকানা জেলার মহেঞ্জোদারো গ্রামে (বর্তমানে পাকিস্তানে) সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন।

১৯ এপ্রিল 'আনন্দমেলা কুইজ প্রতিযোগিতা'-য় বিজয়ী হিসেবে তিনজন ১০০ টাকার পুরস্কার পাবে। পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে আনন্দ পাবলিশার্সের ১০০ টাকার বইয়ের কুপন।

বিজয়ীদের নাম : *(১) কাকলি কুমার*
সল্ট লেক, কলকাতা-৯১
(২) অরূপরতন ঘোষ
আগরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা
(৩) সুরঞ্জন চক্রবর্তী
সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪

বিজয়ীদের কাছে কুপন ডাকযোগে যথাসময়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের আকাশ

অরূপরতন ভট্টাচার্য

শ্রাবণ মাস শেষ হতে চলেছে। বর্ষাকাল, আকাশে মেঘ, মাঝে-মাঝেই বৃষ্টি। কিন্তু বৃষ্টি ঝরে যাওয়ার পরেই সে আকাশের চেহারা বদলে যায়। বৃষ্টি-ধোয়া নির্মেঘ অন্ধকারের আকাশপট তারায়-তারায় খচিত, তা আমাদের মন মুগ্ধ করে।

সন্ধের অন্ধকার একটু ঘন হয়ে আসুক। রাতের গভীরে তারারা ফুটে উঠুক তাদের স্বাভাবিক চেহারা নিয়ে—তারা-ঘেরা আকাশে তখন অনেক উজ্জ্বল তারকামণ্ডল আমাদের নজরে আসবে।

রাত্রে খেয়ে-দেয়ে ঘুমোতে যাওয়ার সময়ে একবার মাথার উপরে চোখ তুলে তাকানো যাক। আকাশের প্রায় মাঝখান দিয়ে ব্রাহ্মণের উপবীতের মতো চলে গেছে ছায়াপথ—উত্তর থেকে দক্ষিণে ঈষৎ তেরছাভাবে। ছায়াপথে অজস্র তারার ঘন সন্নিবেশ—এ যেন ফুল বিছানো রাম-লক্ষ্মণের হেঁটে চলার মতো সাদা, শুভ্র সামান্য চওড়া একটা পথ। শহর থেকে একটু দূরে খোলা, ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে এই ছায়াপথকে দেখতে দেখতে কত সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়।

এখন রাত একটু গভীর হলে আকাশপটে ছায়াপথকে লক্ষ করবার সময়ে একটি বিশিষ্ট তারকামণ্ডল নজরে আসবে। উত্তর আকাশের তারকামণ্ডল এটি—নাম সিগনাস (Cygnus)। উজ্জ্বল তারায়-তারায় এ অনেকটা যিশুখ্রিস্টের ক্রসের মতো। যে-কোনও ক্রসে দুটো রেখা ছেদ করে যাওয়ার কথা। সেখানে জটিলতা কিছু নেই। এখানেও তাই। ফলে ক্রসটিকে খুঁজে বের করার সময়ে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

এ হল উত্তর আকাশের ক্রস। কিন্তু দক্ষিণ আকাশেও এ রকম একটি ক্রস আছে। এটির নাম ক্রাক্স্ (Crux) বা ক্রাক্স্ অসট্রেলিস (Crux Australis)। আমরা বলি দক্ষিণ ক্রস। আকারে এটি মোটেই বড় নয়, কিন্তু ক্রসের জন্য যে চারটি তারা কম করে দরকার, সেই চারটি তারাই ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো, চিনতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে ফাল্গুন-চৈত্র মাস থেকে পর-পর কয়েক মাস সিগনাসের মতো ছায়াপথের কোলের উপরে এটিকে দেখা গেলেও যেতে পারে। তবে দক্ষিণ আকাশে আমাদের আকাশপটে দিগন্তের খুব কাছাকাছি এর অবস্থান। সেইজন্যই ভয় হয়।

সিগনাস মণ্ডলের অর্থ হল হংস বা হাঁস। সেইজন্য এই মণ্ডলকে হংসমণ্ডল নামেও ডেকে থাকন কেউ-কেউ।

মণ্ডলের আরও কিছু তারা মিলে বেশ কল্পনা করা যায়, হাঁস যেন ডানা মেলে উড়ে চলেছে আকাশের বুক চিরে। মণ্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটির নাম ডেনেব (Deneb)। ডেনেব আছে ক্রসের মাথায়, মণ্ডলটির একেবারে উত্তরে। খালি চোখে আকাশে যত উজ্জ্বল তারকা দেখা যায়, ঔজ্জ্বল্যের হিসেবে তাদের পর-পর সাজালে, ডেনেবের স্থান উনিশ। মেধার দিক দিয়ে ক্লাসের নাইনটিনথ্ বয়ের মতো।

আকাশে এক-একটা তারকামণ্ডলকে চিনবার সময়ে এই সব উজ্জ্বল তারাদের আগে জেনে নিয়ে এগোতে হয়—তা হলে তারায় তারায় ফুটে-ওঠা মণ্ডলগুলি চেনা যায় সহজে। পথ-ঘাট খুঁজে বের করার সময়ে যেমন অঞ্চলের সবচেয়ে দর্শনীয় বা সবচেয়ে নজরে আসার মতো কোনও কিছু ধরে আমরা এগোই, আকাশ চেনার বেলাতেও ঠিক তেমনই।

সিগনাসের দক্ষিণে ক্রসের একেবারে নীচের দিকে ঈষৎ পশ্চিম ঘেঁষে আছে লাইরা (Lyra) মণ্ডল। এই মণ্ডলটিও উত্তর আকাশের মণ্ডল। লায়ার শব্দটির অর্থ বীণা। সেইজন্য বাংলায় কেউ-কেউ মণ্ডলটিকে বলেন বীণামণ্ডল। কিন্তু তারায়-তারায় কীভাবে যে বীণার কল্পনা করা হয়, তা বুঝে ওঠা কঠিন। মণ্ডলটি আকারে খুব বড় নয়। কিন্তু এর একটি উজ্জ্বল তারা মণ্ডলটিকে বিশিষ্ট করে রেখেছে। এটি হল ভেগা (Vega) তারকা। বাংলায় একে বলা হয় অভিজিৎ। খালি চোখে দেখা তারাদের মধ্যে ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে এটি পঞ্চম।

এক সময়ে অশ্বিনী, ভরণী থেকে রেবতী পর্যন্ত ভারতীয়দের ২৭ নক্ষত্রের সঙ্গে অভিজিৎ নক্ষত্রকে যোগ করে এক-একটি নক্ষত্র এক-একটি স্ত্রী হিসেবে পুরাণে চাঁদের সবসুদ্ধ ২৮ জন স্ত্রীর কল্পনা করা হয়েছিল।

উত্তর থেকে নামতে নামতে এবার ছায়াপথের উপরে আর একটা মণ্ডল আমাদের নজরে আসবে। প্রায় মাথার উপরের আকাশে এটিকে দেখতে পাওয়ার কথা। এর নাম অ্যাকুইলা (Aquila) মণ্ডল। সুন্দর মণ্ডল—মণ্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা অলটেয়ার (Altair)। বাংলায় এটির নাম শ্রবণা। এটিকে নিয়ে শ্রবণা নামেই একটি নক্ষত্রের কল্পনা। বাইশসংখ্যক নক্ষত্র এটি, আর পুরাণে এ চাঁদের এক স্ত্রীও বটে। তারকাটি আছে আমাদের কাছ থেকে ১৬ আলোকবর্ষ দূরে। এটি খালি চোখে দেখা আকাশের একাদশ উজ্জ্বলতম তারকা, ইলেভেনথ্ বয়।

অ্যাকুইলার অর্থ ঈগল। আর সিগনাসের হাঁসের মতো অ্যাকুইলার ঈগলকেও চেনা যাবে খুব সহজে।

অ্যাকুইলা মণ্ডলকে চিনলে আর একটি তারকামণ্ডলকেও চেনা যায় অ্যাকুইলার দক্ষিণে। এটি একটি রাশি, নাম ধনু রাশি, বিদেশী নাম স্যাজিটেরিয়াস (Sagittarius)। কিন্তু রাশি কাকে বলে?

সূর্যের রোজ ঘুরে আসার পথ ছাড়াও বার্ষিক চলার একটা পথ আছে। এই পথটাকে বলে ক্রান্তিবৃত্ত বা ইকলিপটিক (ecliptic)। এই বৃত্তাকার পথ জুড়ে ১২টা তারকামণ্ডলের কল্পনা করা হয়েছে সমান দূরত্ব বজায় রেখে। এই ১২টা তারকামণ্ডলই ১২টা রাশি নামে পরিচিত। এরা হল মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। এদের মধ্যে এবারে আমরা কেবল ধনু রাশিকে চেনার চেষ্টা করব।

ধনু রাশির নামে যে প্রাচীন অস্ত্রটির উল্লেখ আছে, রাশিটির মধ্যেই সেটি দেখা যায় সুন্দরভাবে। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে আছে এক ধনুর্ধর, ঘোড়ার পিঠে বসে যে তীর ছুঁড়ছে। প্রাচীনকালের জ্যোতিষীরা এইভাবে ধনু রাশির কল্পনা করেছিলেন। ধনু রাশি আছে আকাশের বেশ কিছুটা দক্ষিণ দিকে।

ধনু রাশিতে অনেক তারার সমাবেশ, কিন্তু বিশেষভাবে নজরে আসার মতো তেমন উজ্জ্বল তারা একটিও নেই। তবু ধনু রাশির ধনুর্ধর আর তীর ছোঁড়ার ছবিটি বেশ বোঝা যায়। ধনু রাশির তীর-ধনুকটি আছে রাশিটির পশ্চিমদিকে, ওখানে ধনুর্ধর যেন ধনুকে তীর যোজনা করে কাকে লক্ষ করছে।

ধনু রাশির তারাদের নিয়ে আছে ভারতীয় জ্যোতিষের ২৭ নক্ষত্রের দু'টি নক্ষত্র, পুরাণে চাঁদের দুই স্ত্রী। এদের একটি পূর্ব আষাঢ়া—সংখ্যায় বিংশতি, অন্যটি উত্তর

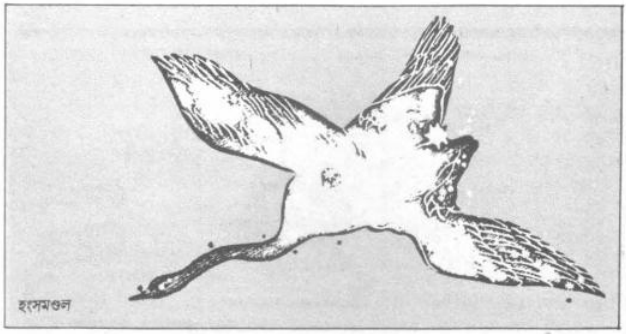

হংসমণ্ডল

২৪ শ্রাবণ রাত্রি সাড়ে দশটা, ৩১ শ্রাবণ রাত্রি দশটা, ৬ ভাদ্র রাত্রি সাড়ে নটা এবং ১৩ ভাদ্র রাত্রি নটার তারাশোভিত আকাশপট—আমাদের অঞ্চলের আকাশসঙ্গী

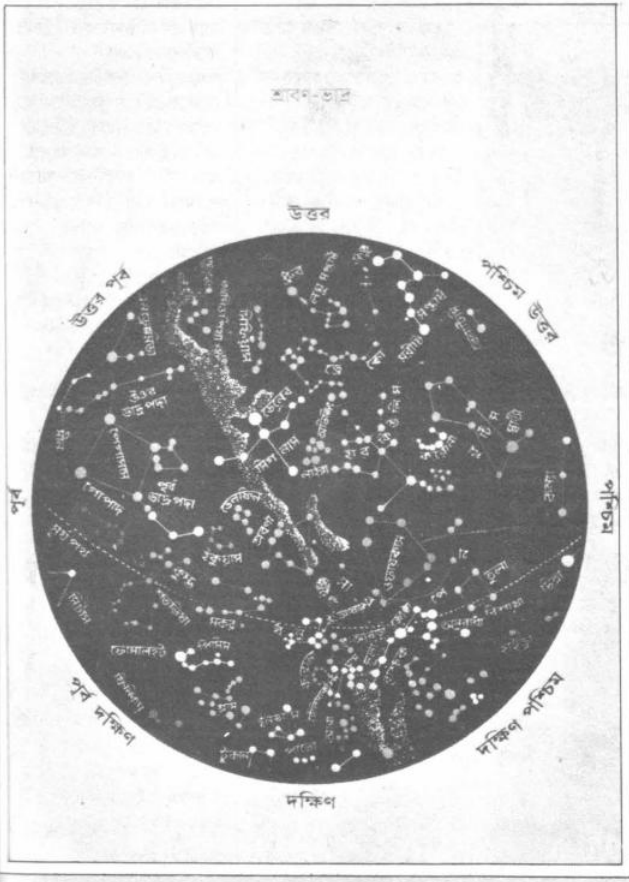

আষাঢ়া—পরিচয়ে একবিংশতি। নক্ষত্র-তালিকায় পর পর আছে এরা। ছায়াপথের পূর্ব-পশ্চিমে এখনকার আকাশপটে আরও অনেক দর্শনীয় তারকামণ্ডল আছে, যে যার আপন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে দীপ্যমান। কিন্তু তাদের কথা এবারে নয়।

কোনও রাতে আকাশপট লক্ষ করবার সময়ে বোঝা যায়, সূর্য, চন্দ্র যেমন নজরে আসে, চলে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, তেমনই তারাদের নিয়ে তারকামণ্ডলও রাতের প্রহর পার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সরে যেতে থাকে পশ্চিম দিকে। ফলে কোনও সন্ধেতে পূর্ব আকাশে যে তারকামণ্ডলের উদয় হবে দিগন্তের আড়াল থেকে, মাঝরাতে সে উঠে আসবে প্রায় মাথার উপরে আর শেষরাতে সে আবার অস্ত যাওয়ার মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে। সন্ধের অন্ধকারে মাঝ-আকাশের তারকারা সেইজন্য রাত গভীর হলে ঢলে পড়বে পশ্চিমে।

আকাশপটে তারকার অবস্থান যদি প্রত্যেক সন্ধ্যায় একই রকম হত, তা হলে প্রহরে প্রহরে পটের পরিবর্তন ঘটলেও প্রত্যেক রাত্রে একই প্রহরে পট বদলাত না, সে থাকত একই রকমের। কিন্তু তা নয়। রোজ এক সময়ে তারকাপটও সামান্য বদলায়। আজ এক নির্দিষ্ট সময়ে কোনও তারকামণ্ডল যেখানে থাকবে, আগামীকাল ঠিক ওই সময়ে সেই তারকামণ্ডলকে ওখানে দেখা যাবে না। পুরো পটটি সরে যাবে ১ ডিগ্রি পশ্চিমে। ১ ডিগ্রি —একদিনে সে এমন কিছু নয়। কিন্তু বিন্দু বিন্দু বারিকণা, বিন্দু বিন্দু জলই তো সাগর মহাসাগর গড়ে তোলে, তেমনই একদিনের ১ ডিগ্রি ১৫ দিনে ১৫ ডিগ্রি, ১ মাসে ৩০ ডিগ্রি সরে যায়।

সেইজন্য আজকে নির্দিষ্ট সময়ে মাথার উপরে দেখা কোনও মণ্ডলকে ১৫ দিন পরে একই সময়ে দেখতে হলে তাকে আগের জায়গায় পাওয়া যাবে না। তখন তাকে খোঁজ করা দরকার তুলনায় ১৫ ডিগ্রি পশ্চিমে, ৩০ দিন হলে ৩০ ডিগ্রি পশ্চিমে। তা হলে মাথার উপরে দেখতে হলে ১৫ দিন তফাতের জন্য ১ ঘণ্টা আগেই উপরের আকাশে চোখ তুলে লক্ষ করতে হবে, তিন সপ্তাহ হলে প্রায় দেড় ঘণ্টা আগে।

মনে রাখতে হবে, আকাশপটের দিকের সঙ্গে পার্থিব উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম মিলবে না। সেইজন্য তারকাপটটিকে মাথার উপরে নিচুর দিক করে ধরে উত্তর-দক্ষিণ মিলিয়ে নিতে হবে। পূর্ব-পশ্চিম মিলে যাবে সঙ্গে-সঙ্গে।

ডাকটিকিটে ফরাসি বিপ্লব

ফরাসি বিপ্লবের ২০০ বছর উপলক্ষে সারা ফ্রান্সে দেখা দিয়েছে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা। বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে ফরাসি বিপ্লবকে স্মরণ করা হয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের ডাকটিকিটও প্রকাশ করেছে ফ্রান্স। তা ছাড়া চলতি বছরে তারা তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকেও ডাকটিকিটের মাধ্যমে নতুন করে তুলে ধরেছে। প্যারিস শহরের প্রসিদ্ধ স্থানগুলি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে পাঁচটি ডাকটিকিট। এদের মধ্যে আছে ল্যুভর জাদুঘর ও চিরপরিচিত আইফেল টাওয়ার।

ল্যুভর জাদুঘরের বর্তমান বাড়িটি একসময় ছিল বিরাট একটি প্রাসাদ। সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই প্রাসাদের মাটি খুঁড়ে মধ্যযুগের নানা সামগ্রী উদ্ধার করেছেন। ছোটখাটো শিল্পকর্ম থেকে বিরাটাকার দুর্গের ইঁদারা পর্যন্ত। দ্বাদশ শতাব্দীর একটি দুর্গ ও রাজা ফিলিপ অগস্ত-এর তৈরি অন্ধকূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। ডাকটিকিটে পিরামিডের মতো যে সৌধটি দেখা যাচ্ছে, সেটি ল্যুভর জাদুঘরের নতুন প্রবেশপথ।

প্যারিস শহরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ আইফেল টাওয়ার। আলেকজান্ডার গুস্তাভ আইফেল নামে এক এঞ্জিনিয়ার এটি তৈরি করেছিলেন। একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর তোরণ হিসেবে এই টাওয়ার প্রথমে গড়ে তোলা হলেও ফ্রান্সের ইতিহাসে এটি স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। অন্য দু'টি ডাকটিকিটে আছে শহিদদের জন্য তৈরি স্মৃতিসৌধ ও বাস্তিল-এর নতুন অপেরা হাউসের ছবি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ফ্রান্স ছাড়াও আমেরিকা, ব্রাজিল ও জার্সি দ্বীপ ফরাসি বিপ্লব নিয়ে ডাকটিকিট বের করেছে।

'পাপা' হেমিংওয়ে

কোন বিখ্যাত সাহিত্যিক 'পাপা' নামে পরিচিত ? হ্যাঁ, আমেরিকার মানুষ তাঁকে এই নামেই ডাকতে ভালবাসেন। বহির্বিশ্বে অবশ্য হেমিংওয়ে নামেই তাঁকে সবাই চেনেন। পুরো নাম আর্নেস্ট মিলার হেমিংওয়ে। আমেরিকার ইলিনয়েস প্রদেশের ওক পার্কে তাঁর জন্ম। তারিখ ২১ জুলাই, ১৮৮৯। চলতি বছরে তাই তাঁর জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে নানাভাবে। স্মরণ করা হচ্ছে তাঁর অবিস্মরণীয় সাহিত্যকীর্তিকে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি আজও জীবন্ত। নোবেলজয়ী এই সাহিত্যিকের জীবনও ছিল বৈচিত্র্যে ভরা। পিতা ডাক্তার। আর প্রথম জীবনে হেমিংওয়ে ছিলেন রিপোর্টার। 'স্টার' পত্রিকার সেই লেখাগুলিতেই তাঁর রচনাশৈলী বিকশিত হয়েছিল। ওই সময়েই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতায় কাতর হয়ে তিনি রেড-ক্রসের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে ইতালি যান। লাভ করেন সাহসিকতার জন্য সেখানকার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। শিকার, ষাঁড়ের লড়াই আর গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা—এই ছিল তাঁর বিশেষ শখ। ১৯৫৩ সালে তিনি পান বিখ্যাত পুলিৎজার পুরস্কার। আর পরের বছরেই বিশ্ব তাঁকে বরণ করে নোবেল পুরস্কার দিয়ে। কালজয়ী এই সাহিত্যিকের মৃত্যু হয় ১৯৬১ সালে।

কবিতা রায়

পাখি ও শাবকের কথা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর সব দেশেই পাখি পোষার রেওয়াজ আছে সেই প্রাচীনকাল থেকেই। আমাদের দেশেও মৌর্যযুগ থেকে পাখি পোষার চল হয়েছিল ব্যাপকভাবে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায়, সে-সময় রাজা-মহারাজাদের প্রাসাদে নানা জাতের পোষা পাখিদের জন্য দাঁড় নির্দিষ্ট করা থাকত। এইসব দাঁড়ে এসে বসত ময়ূর, চকোর, শুক, সারি প্রভৃতি পাখি। শূদ্রক যখন 'মৃচ্ছকটিক' রচনা করেন, তখন তো পাখি পোষা একটা বিশেষ 'হবি' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর লেখায় অবস্থাপন্ন মানুষের পক্ষিশালার বর্ণনা আছে। এভাবে ক্রমশ মানুষ শুধু পাখি-শিকার করে তাদের মাংস খেতেই নয়, পাখিদের ভালবাসতে, পাখিদের সঙ্গে বাস করতে এবং পাখি পুষতে শিখেছিল। ইতিহাসে নজির আছে ৫০০ বছর আগেও কোনও-কোনও রাজা শ্যেন বা বাজপাখি পুষতেন। এই বাজপাখির সাহায্যে তাঁরা অন্য পাখি শিকার করতেন।

পাখি পোষার ব্যাপারে সম্রাট আকবরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। তাঁর পক্ষিশালায় কুড়ি হাজারেরও বেশি পায়রা ছিল। তিনি পারস্য, তুরস্ক ও কাশ্মির থেকে অনেক পাখি আনিয়ে তাঁর পক্ষিশালায় রেখেছিলেন। লক্কা, লোটন, পরপাঁ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের পায়রা তিনিই তাঁর পক্ষিশালায় সৃষ্টি করিয়েছিলেন নানা জাতের পায়রার সংকর ঘটিয়ে।

এ তো গেল রাজা-মহারাজা ও সম্রাটদের পাখি পোষার গল্প। এবার আসি পাখি ও তার শাবকের কথায়। সুড়ঙ্গ থেকে শুরু করে

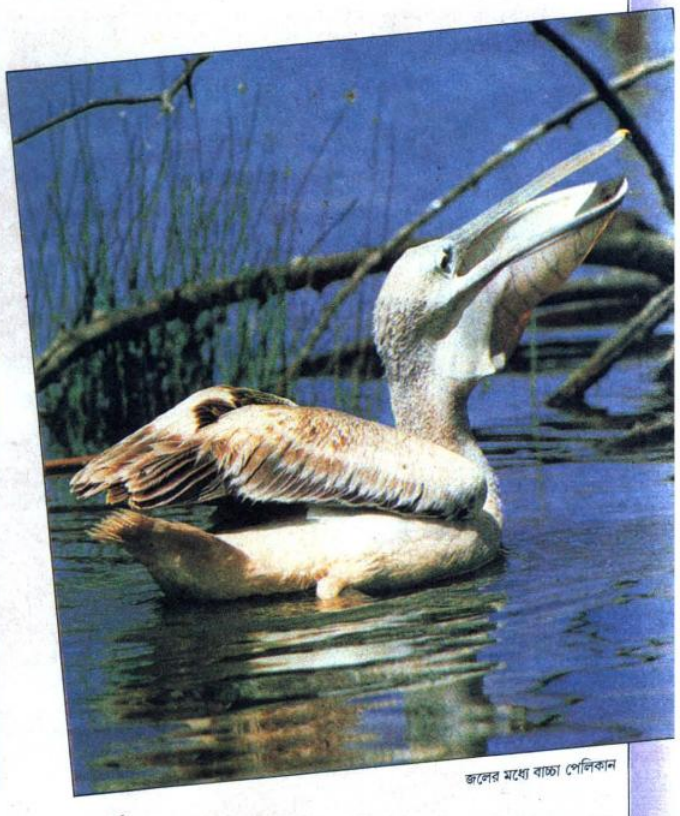

জলের মধ্যে বাচ্চা পেলিকান

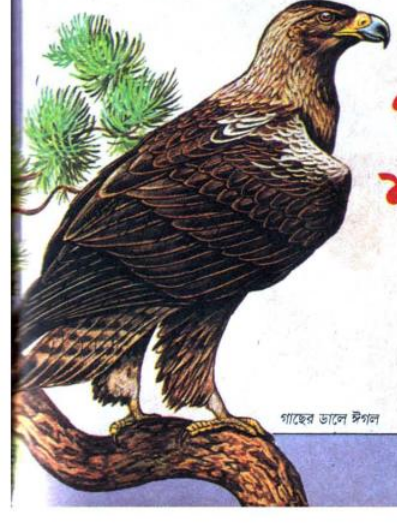

গাছের ডালে ঈগল

গাছের মগডালে—সব জায়গাতেই পাখি বাসা তৈরি করে ডিম পাড়ে নিজের-নিজের জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে। পাখি নিজের সুবিধেমতো বাসা তৈরি করে সেখানে ডিম পাড়ে এবং নিজের দেহের তাপে অর্থাৎ তা দিয়ে ডিম ফোটায়। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বেরোলে বাচ্চাদের লালন-পালন করে। কোনও-কোনও পাখি, যেমন, কোকিল, বউ-কথা-কও পাখিরা—এরা নিজেরা বাসা তৈরি না করে কাক বা অন্য পাখিদের বাসায় ডিম পাড়ে।

বাচ্চা-পাখিদের সাধারণত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর বাচ্চারা একেবারে অসহায়, দুর্বল, চোখে দেখতে পায় না। এরা শুধু কোনওরকমে মুখ হাঁ করতে পারে। এই শ্রেণীর পাখির মধ্যে কোনও-কোনও সামুদ্রিক পাখি, হেরন,

বাজপাখি এবং পেঁচাও আছে। এদের বলা হয় 'অ্যালট্রিকাল'। এদের শরীরে পালক থাকে না—থাকে শুধু ছাল-চামড়া। আর-এক শ্রেণীর পাখির বাচ্চাদের বলা হয় 'প্রিকোসিয়াল'। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, মুরগির ছানা। এদের গা পালকে ঢাকা থাকে, এদের চোখ দুটো উজ্জ্বল এবং এরা দৌড়তেও পারে নিজের মায়ের পিছু-পিছু এবং ঠোঁট দিয়ে খাবারও খুঁটে নিতে পারে।

কিন্তু মজার ব্যাপারটা হল, প্রিকোসিয়াল শ্রেণীর পাখির বাচ্চাদেরই শৈশব বেশি দিন স্থায়ী হয় এবং অ্যালট্রিকাল শ্রেণীর পাখির বাচ্চারা ওদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে। বাচ্চা সং-বার্ড, জন্মের সময় যার গায়ের পালক ছিল না এবং যারা খুবই দুর্বল ছিল, তারা খুব তাড়াতাড়ি বড় হতে থাকে। ইউরোপিয়ান কাক্কু, তার জন্মের সময় ওজন ছিল মাত্র পাঁচ গ্রাম, তিন সপ্তাহ পরে তার ওজন বেড়ে দাঁড়ায় পঞ্চাশ গ্রাম। দেহগঠনের সময় এই পাখির প্রধান খাদ্যই হয় প্রোটিন। অবশ্য পুরোপুরি বড় হয়ে গেলে এরা এই খাদ্যাভ্যাস বদলে ফেলে ফল ও শস্যবীজও খেতে পারে।

এইসব বাচ্চা এত তাড়াতাড়ি বড় হয়, কারণ বাবা ও মা-পাখি তাদের অনবরত খাইয়ে চলে। কোনও-কোনও পাখি তার বাচ্চাদের খাওয়াবার জন্য দিনে ৮৪৫টা চক্কর লাগায়, কোনও-কোনও পাখি বাচ্চাদের খাওয়াবার জন্য ৯০০ বারও উড়াউড়ি করে। অন্য দিকে আবার ঈগল পাখি মাত্র দু'বার বা তিনবার চক্কর কাটে সারাদিনে। ওরা এই দু-তিনবার ওড়াউড়ি করেই যে শিকার নিয়ে আসে, তা বাচ্চাদের পেট ভরার পক্ষে যথেষ্ট।

ফুল দিয়ে বাসা সাজিয়েছে পাখি

কোনও-কোনও পাখির বাচ্চাকে দু' সপ্তাহ ধরে এভাবে খাবার খাওয়াতে হয়। তারা জন্মাবার ন' দিন পরেই বাসা ছেড়ে উড়তে শেখে। অন্যদিকে আবার আছে অ্যালবাট্রস—জন্মাবার ছ' মাস পরে প্রথমবার সে সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। ওরা ঠিকমতো উড়তে এবং বেঁচে থাকতে পারবে কি না তা এই প্রথমবার ওড়ার কয়েক মাসের মধ্যেই নির্ণয় হয়ে যায়। জন্মাবার প্রথম বছরে অ্যালবাট্রস শাবকদের মৃত্যুর হার খুব বেশি।

বেশিরভাগ পাখিই বাসায় ঠোঁটে করে পোকামাকড় এনে বাচ্চাদের খাওয়ায়। কিন্তু সামুদ্রিক কোনও-কোনও পাখি আবার খাবার গিলে ফেলে বেশ খানিকটা হজম করে নেয়, তারপরে সেটা উগরে দিয়ে পাখিদের খাওয়ায়। এর ফলে পাখিরা বেশি খাবার বাসায় বহন করে নিয়ে যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে বাচ্চারাও খানিকটা পরিপাক করা খাবার খেতে পায়। এতে বাচ্চাদের খাবার হজম করার পক্ষে সুবিধে হয়। সি-গাল এবং সারসরা আবার খাবার নিয়ে এসে বাচ্চাদের সামনে ফেলে দেয়। বাচ্চারা সেই খাবার খেয়ে নেয়। খাবার খাওয়ানো ছাড়াও মা-পাখিরা বাচ্চাদের উড়তে উৎসাহ দেয় এবং খাদ্য-সংগ্রহের কলাকৌশল শেখায়। এ ছাড়া পাখিরা তাদের শাবকদের রক্ষা করবার জন্য সবরকম চেষ্টাই করে।

এইসব বাচ্চা কিন্তু তাদের বাবা-মাকে মোটেই চিনতে পারে না। সেইজন্য একটা হাঁসের বাচ্চা অনায়াসেই একটা শস্যক্ষেতের মুরগির বাচ্চার সঙ্গে মিশে যেতে পারে। যেসব বাচ্চা জন্ম থেকেই স্বাবলম্বী, তাদের নিয়েই মা-বাবাকে একটু মুশকিলে পড়তে হয়। মুরগির বাচ্চা সব-কিছুই খুঁটে নিতে থাকে মাটি থেকে। সেইজন্য তাকে কী খেতে হবে, কী-কী খেতে হবে না শেখাতে হয়। অনেক সময় মা-বাবা বাচ্চার সামনে ঠিকমতো খাবার ছড়িয়ে দিয়ে তাকে খাদ্য সংগ্রহে সাহায্য করে।

বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় বন্দিদশায় মাঝে-মাঝে এমু, পেলিকান, ক্রেন জন্মানোর চমকপ্রদ খবর পাওয়া যায়। ওড়িশার নন্দনকানন জুওলজিকাল পার্কে মার্চ মাসের ৪ তারিখে একটা এমু পাখির বাচ্চা জন্মাল। এমন একটা চমকপ্রদ খবর ছড়িয়ে পড়ায় ভুবনেশ্বর থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই জুওলজিকাল পার্কের ওপর সকলের নজর এসে পড়ল। নন্দনকাননে একটি পুরুষ-এমু ছিল আগে থেকেই। জয়পুরের চিড়িয়াখানা থেকে আর একটি স্ত্রী-এমু আনা হল। অনেক দিন পরে স্ত্রী-এমুটি আটটা ডিম পেড়েছিল দু' মাস আগে। এর মধ্যে পাঁচটি ডিম নষ্ট হয়ে গেল প্রায় দেড় মাস তা দেওয়ার পরে। কিন্তু এর মধ্যে থেকে ষষ্ঠ ডিমটি ফুটে একটি হৃষ্টপুষ্ট এমুর বাচ্চা বেরনোয় চিড়িয়াখানার সকলের মনই আনন্দে ভরে উঠল। এমু পাখি উড়তে পারে না। অস্ট্রিচের পরে যারা উড়তে পারে না তাদের মধ্যে এই পাখিই সবচেয়ে বিশালদেহী। এই পাখি ক্রমশই বিলুপ্তির পথে। কাজেই চিড়িয়াখানার মধ্যে এমুর বাচ্চা হওয়ার ঘটনা সত্যিই একটা আশ্চর্যের ব্যাপার।

এমু-মা ও তার বাচ্চারা

পাখি-মা বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে

এর আগেও মল্লিকবাড়ির মার্বেল প্যালেসের পক্ষিশালায় ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি পেলিকানের বাচ্চা হয়েছে। প্রায় ১৪ বছর আগে অসম থেকে একজোড়া সাদা পেলিকান আনা হয়েছিল এই পক্ষিশালায়। এদের একটি বিশাল ট্যাঙ্কের মধ্যে রাখা হয়েছিল এবং মাছ খেতে দেওয়া হত। এদের পালকের রং গোলাপি এবং তাতে কালোর ডোরাদাগ। ১৯৮৬ সালে জানুয়ারি মাসের ১২ তারিখে পেলিকানরা দুটি ডিম পেড়েছিল। এই ডিম দুটির যত্নের সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। একটা নতুন বাসাও তৈরি করে দেওয়া হল পাখিদের জন্য। সেইজন্যই বোধ হয় বিরক্ত হয়ে পেলিকানরা তাদের ডিম দুটি চারদিন পরেই চঞ্চু দিয়ে ঠুকরে ভেঙে ফেলে। তারপর তারা তাদের ইচ্ছেমতো একটি বাসা বাঁধল প্রাসাদের গেটের কাছে পাম গাছের নীচে। সেখানেই জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে আরও দুটি ডিম পাড়ল। এবারে আর ওদের কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হল না। এক মাস পরে একটা পাখির কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল এবং দেখা গেল ডিম ফুটে একটি ছানা বেরিয়েছে। মা-বাবার তত্ত্বাবধানে বাচ্চাটা শিগগিরিই খুব হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল। পাখিদের মাছের বরাদ্দও দু' কেজি থেকে বাড়িয়ে সাড়ে তিন কেজি করে দেওয়া হল। মা-পাখি বাচ্চাকে দুপুরের রোদ্দুর থেকে বাঁচাবার জন্য ডানা দিয়ে ঢেকে রাখত, বাবা যেত বাচ্চার জন্য খাবার খুঁজতে। এর পরে বাবা-মা বাচ্চাকে ঠোঁট থেকে বার করে খানিকটা হজম করে নেওয়া মাছ খাওয়াত। এইভাবেই বড় হয়ে উঠল বাচ্চা-পেলিকান। লিনটন চিড়িয়াখানায় একবার একটা চিড়-খাওয়া হাঁসের ডিম কৃত্রিম চামড়া জোড়া দিয়ে 'তা' দেওয়া হচ্ছিল। সাধারণত কেটে গেলে যে কৃত্রিম চামড়া লাগানো হয় তাই দিয়েই ডিমটা জোড়া দেওয়া হয়েছিল। এমনিতে হাঁসের বাচ্চা দেখতে ভাল নয় বলে ইংরেজিতে বলা হয় 'আগ্‌লি ডাকলিং' বা 'কুৎসিত হাঁসের বাচ্চা'। সেইজন্য ডিমের ভেতরের বাচ্চাটাকে সুন্দর করে তোলবার জন্যে চিড়িয়াখানার উৎসাহী-কর্মীরা সিরিঞ্জে করে ডিমের কুসুম, দই, ফল, বেবিফুড, মাংস ইত্যাদি মিশিয়ে ইঞ্জেকশন দিচ্ছিল। প্রচেষ্টাটা কতটা সফল হয়েছিল তা অবশ্য জানা নেই।

শাবক সহ অস্ট্রিচ

যোধপুর চিড়িয়াখানার বন্দিদশায় প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া পাখি 'ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড' একবার ডিম পেড়েছিল। চিড়িয়াখানায় ইন্ডিয়ান বাস্টার্ডের ডিম পাড়ার ঘটনা এই প্রথম ঘটল। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৮৩ সালে। আমেরিকার উইসকনসিনের চিড়িয়াখানায় বন্দিদশার একটি দুর্লভ প্রজাতির সাইবেরিয়ান ক্রেনের বাচ্চা জন্মেছিল। তার নাম রাখা হয়েছিল 'গান্ধী'। ইন্দিরা গান্ধী সেই সারসের বাচ্চাকে দেখতে গিয়েছিলেন।

জ্যোৎস্নারাতের বিপদ-আপদ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

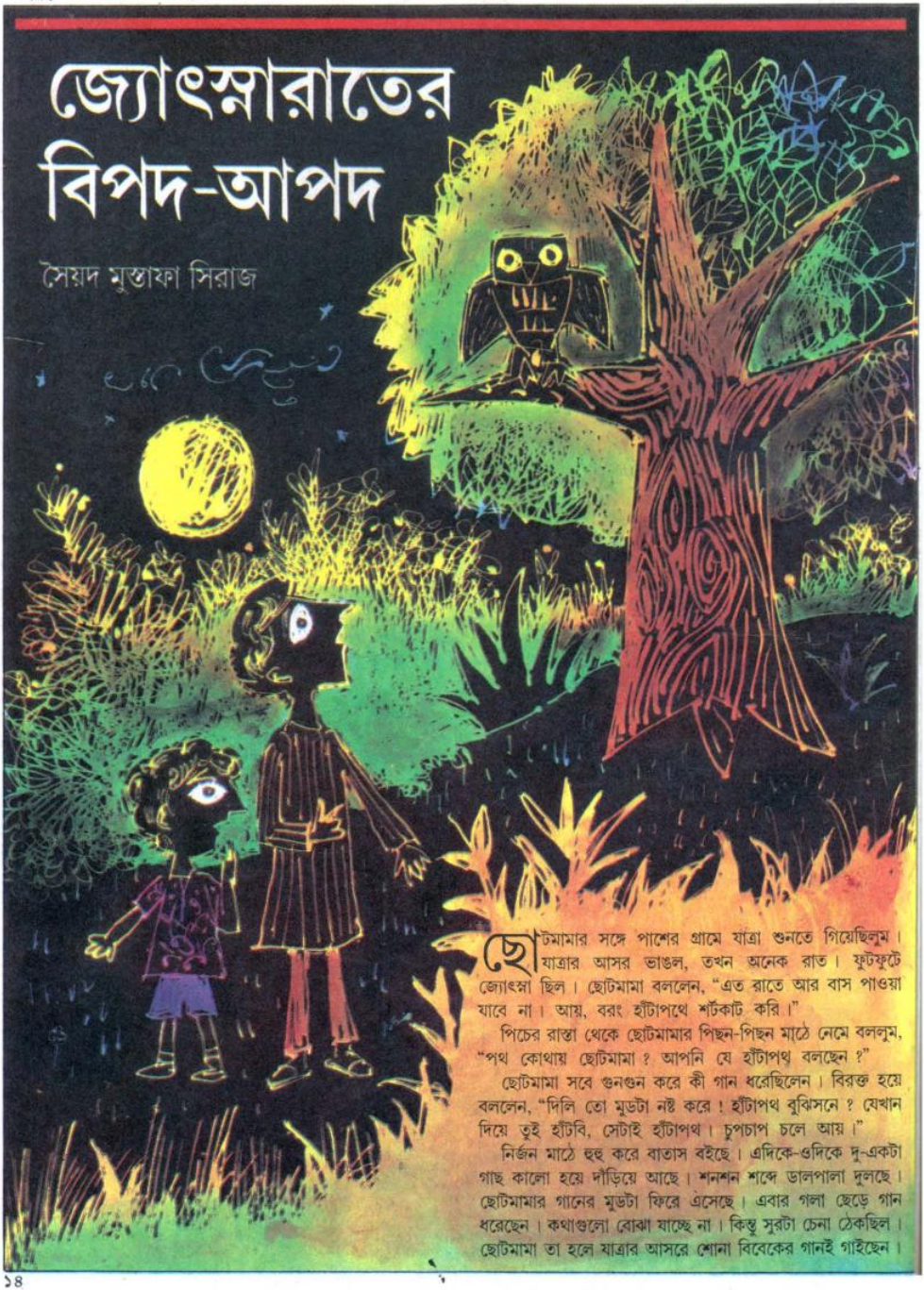

ছোটমামার সঙ্গে পাশের গ্রামে যাত্রা শুনতে গিয়েছিলুম। যাত্রার আসর ভাঙল, তখন অনেক রাত। ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল। ছোটমামা বললেন, "এত রাতে আর বাস পাওয়া যাবে না। আয়, বরং হাঁটাপথে শর্টকাট করি।"

পিচের রাস্তা থেকে ছোটমামার পিছন-পিছন মাঠে নেমে বললুম, "পথ কোথায় ছোটমামা? আপনি যে হাঁটাপথ বলছেন?"

ছোটমামা সবে গুনগুন করে কী গান ধরেছিলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন, "দিলি তো মুডটা নষ্ট করে! হাঁটাপথ বুঝিসনে? যেখান দিয়ে তুই হাঁটবি, সেটাই হাঁটাপথ। চুপচাপ চলে আয়।"

নির্জন মাঠে হুহু করে বাতাস বইছে। এদিকে-ওদিকে দু-একটা গাছ কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শনশন শব্দে ডালপালা দুলছে। ছোটমামার গানের মুডটা ফিরে এসেছে। এবার গলা ছেড়ে গান ধরেছেন। কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সুরটা চেনা ঠেকছিল। ছোটমামা তা হলে যাত্রার আসরে শোনা বিবেকের গানই গাইছেন।

একটু পরে আমরা একটা দিঘির পাড়ে পৌঁছলুম। অনেকগুলো তালগাছ সেখানে লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাতাগুলো অদ্ভুত শব্দে নড়ছে। হঠাৎ কে ধমক দিয়ে বলে উঠল, "কী হে ছোকরা, আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে ?"

কেমন খ্যানখেনে গলার স্বর। ছোটমামা থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "অদ্ভুত তো ! ঘর ছেড়ে দিঘির পাড়ে ঘুমোতে এসেছ। কে হে তুমি ?"

"আবার তুমি বলা হচ্ছে ? ভারী বেয়াদপ ছোকরা দেখছি।"

ছোটমামা একটু ভড়কে গিয়ে বললেন, "আপনি কোথায় ঘুমোচ্ছেন ?"

"তালগাছের ডগায়।"

এতক্ষণে টের পেলুম, সামনে একটা তালগাছের মাথা থেকে কেউ কথা বলছে। ছোটমামা হাসতে-হাসতে বললেন, "তালগাছের ডগা কি ঘুমোনোর জায়গা ? ঘুম পেলে বাড়ি গিয়ে ঘুমোন।"

"এটাই তো আমার বাড়ি।"

"তার মানে ?"

"মানে আবার কী ? যাও, বিরক্ত কোরো না। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।"

বিকট হাই তোলার শব্দ শোনা গেল। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ছোটমামা গোঁ ধরে বললেন, "এর একটা এস্পার-ওস্পার না করে যাব না। তালগাছের ডগায় কেউ ঘুমোতে আসে বলে তো শুনিনি। গাছের তলায় অবশ্যি অনেক মানুষকে ঘুমোতে দেখেছি। ও মশাই, শুনছেন ?"

"জ্বালাতন ! শোনো হে ছোকরা, এখনই কেটে না পড়লে বিপদ হবে বলে দিচ্ছি।"

ছোটমামার হাত ধরে টেনে বললুম, "আমার বড্ড ভয় করছে। চলুন ছোটমামা।"

ছোটমামা রেগে গিয়ে বললেন, "তুই বড্ড ভিতু ছেলে দেখছি। ব্যাপারটা তোর গোলমেলে মনে হচ্ছে না ? তালগাছের ডগায় কেউ ঘুমোতে আসে ? লোকটা নিশ্চয় চোর। পুলিশের ভয়ে ওখানে লুকিয়ে আছে।"

এবার ওপর থেকে হুঙ্কার শোনা গেল। "কী বললে ? কী বললে ? আমি চোর ? আমি পুলিশের দারোগা বংকুবিহারী ধাড়া। আমাকে চোর বলা হচ্ছে ? রোসো, দেখাচ্ছি মজা।"

তালগাছের ডগায় পাতাগুলো প্রচণ্ড নড়তে থাকল। এবার ছোটমামা হন্তদন্ত হাঁটতে থাকলেন। চাপা স্বরে বললেন, "দরকার হলে দৌড়তে হবে। রেডি হয়ে থাক।"

দৌড়নোর দরকার হল না। বংকুবিহারী ধাড়ার কোনও সাড়া পাওয়া গেল না আর। কিছুটা চলার পর ছোটমামা বললেন, "ব্যাপারটা বড্ড রহস্যজনক। বুঝলি পুঁটু ? আমার ধারণা, দারোগাবাবু কোনও চোরকে ধরার জন্য ওখানে লুকিয়ে আছেন।"

ছোটমামার কথা শেষ হওয়ামাত্র কে চাপা স্বরে বলে উঠল, "কোথায় লুকিয়ে আছেন দারোগাবাবু ?"

চমকে উঠে দেখি, সামনে একটু তফাতে কেউ সদ্য উঠে দাঁড়াল। জ্যোৎস্নায় চেহারাটা আবছা কালো। ছোটমামা থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "কে, কে ?"

"আজ্ঞে আমি।"

"আমি মানে কী ? তোমার নাম ?"

"নাম শুনে কী হবে ? দারোগাবাবু কোথায় লুকিয়ে আছেন বলুন।"

ছোটমামা কিছু বলার আগে আমি বলে দিলুম, "দিঘির পাড়ে একটা তালগাছের ডগায়।"

অমনি ছায়া-কালো লোকটা বলে উঠল, "ওরে বাবা ! আমি তো ওখানেই ঘুমোতে যাচ্ছিলুম। সর্বনাশ !"

বলেই সে উধাও হয়ে গেল। ছোটমামা হেসে ফেললেন। "এই লোকটাই চোর। বুঝলি তো পুঁটু ? একে ধরার জন্যই দারোগাবাবু ওখানে ওত পেতেছেন।"

বললুম, "কিন্তু উনি তো ঘুমোচ্ছেন বললেন ! নিজের বাড়িও বললেন !"

"ধুর বোকা ! পুলিশের কথা ওইরকমই। আসল কথাটা বললে চলে ? চোর সাবধান হয়ে যাবে না ?"

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত চোর সাবধান হয়ে গেল তো !"

ছোটমামা গুম হয়ে বললেন, "আমার কী দোষ ? চোর যে এখানে লুকিয়ে আছে, জানতুম নাকি ?"

আবার দু'জনে হাঁটতে থাকলুম। ছোটমামার গানের মুডটা চলে গেছে মনে হচ্ছিল। চুপচাপ হাঁটছেন আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। বরাবর দেখেছি, ছোটমামার সঙ্গে রাতবিরেতে বেরোলে বড্ড গোলমেলে কাণ্ড হয়। আমার গা ছমছম করছিল। ছোটমামাকে এদিক-ওদিকে তাকাতে এবং কখনও হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে কান করে কিছু শুনতে দেখছিলুম। জিজ্ঞেস করলে জবাব দিচ্ছিলেন না। কিছুক্ষণ পরে ফের উনি থমকে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "শোন পুঁটু ! কথাটা মনে আছে তা ? দরকার হলে দৌড়ুনোর জন্য রেডি থাকতে হবে।"

ভয়ে ভয়ে বললুম, "আবার দৌড়ুতে হবে কেন ছোটমামা ?"

"কিছু বলা যায় না। সামনে কালোমতো যে গাছটা দেখছিস, ওটা জটাবাবার থান। একবার এমনি রাত্তিরে ওখানে জটাবাবার পাল্লায় পড়েছিলুম। ওঃ ! সে এক সাংঘাতিক কাণ্ড।"

আরও ভয় পেয়ে বললুম, "তা হলে ওখান দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না, ছোটমামা।"

ছোটমামা পা বাড়িয়ে বললেন, "আয় না দেখি কী হয়। সেবার আমি একা ছিলুম। এবার দু'জনে আছি। জটাবাবা আমাদের ঘাঁটাতে সাহস পাবে না।"

"জটাবাবা কে, ছোটমামা ?"

"একটা বুড়োমতো লোক। মাথায় প্রচুর জটা।"

"সে ওখানে কী করে ?"

"বললুম না ওখানে ওর থান আছে ? দিনের বেলা লোকেরা এসে ওখানে মানত করে। ঢাকঢোল বাজিয়ে জটাবাবার পুজোও দেয়। তবে দিনের বেলা জটাবাবা কাকেও দেখা দেয় না।"

"দিনের বেলা জটাবাবা কোথায় থাকে ?"

ছোটমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, "চুপচাপ আয় তো। জটাবাবা শুনতে পেলে কেলেঙ্কারি।"

গাছটা প্রকাণ্ড। তলায় ঘন ছায়া। বাতাসে ডালপালা কেমন অদ্ভুত শব্দ করছিল। ছোটমামা আবার একটুখানি দাঁড়িয়ে গাছটাকে দেখে নিলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, "রেডি, স্টেডি, গো-ও !"

ছোটমামার পিছন-পিছন গাছটার তলায় যেই গেছি, আমার মাথায় কী একটা ঠেকল। চমকে উঠে হাত তুলে দেখি, একটা পা। বারণ ভুলে চেঁচিয়ে উঠলুম। "ছোটমামা ! ছোটমামা !"

"ধ্যাত্তেরি ! চ্যাঁচাচ্ছিস কেন ? বললুম চুপচাপ চলে আয়।"

"একটা পা। বড্ড ঠাণ্ডা, ছোটমামা !"

"চলে আয় না হতভাগা !"

"আমাকে যেতে দিচ্ছে না যে !" কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললুম।

বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা পা আমার গলা আঁকড়ে ধরে আছে। দু' হাতে ছাড়ানোর চেষ্টা করছিলুম। দম আটকে যাচ্ছিল।

ছোটমামা কাছে এসে বললেন, "কই, কোথায় পা?"

"আমার গলায়।"

ছোটমামা সেই ঠাণ্ডা ঝুলন্ত পা ধরে টানাটানি শুরু করলেন। হঠাৎ আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। খুব জোরে পায়ে চিমটি কেটে দিলুম। অমনি পা'টা গলা থেকে সরে গেল আর কে ওপর থেকে আর্তনাদ করে উঠল, "উহুহুহু! গেছি, গেছি! কী বিচ্ছু ছেলে রে বাবা!"

আমিও সাহস পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম, "ছোটমামা! টানুন! দু'জনে টেনে নামাই জটাবাবাকে।"

ছোটমামাও ততক্ষণে সাহসী হয়ে উঠেছেন। দু'জনে ঠাণ্ডা পা ধরে টানতে থাকলুম। জটাবাবা ঠ্যাং ঝুলিয়ে ডালে বসে থাকার বিপদ টের পেল এতক্ষণে। কাকুতিমিনতি করে বলতে থাকল, "ঘাট হয়েছে বাবারা! ছেড়ে দে। উহুহুহু, বড্ড ব্যথা করছে রে!"

ছোটমামা পা ছেড়ে দিলেন। আমিও ছেড়ে দিলুম। তারপর ছোটমামা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বললেন, "কী জটাবাবা? সেবার তো আমাকে একা পেয়ে খুব ভয় দেখিয়েছিলে? এবার আর ভয় পাচ্ছি না। কই, নেমে এসো। দেখি তোমার কত বুজরুকি।"

গাছের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে। ওপরের ডালে জটাবাবাকে আবছা দেখা যাচ্ছিল। পায়ে হাত বুলিয়ে "আহা-উহু" করছে। মাথার প্রকাণ্ড জটা পুঁটুলির মতো দেখাচ্ছে। ছোটমামার চ্যালেঞ্জ শুনে কোনও জবাব দিল না। চিমটিটা খুব জোর হয়ে গেছে তা হলে।

বললুম, "আমার ঘুম পাচ্ছে। চলুন ছোটমামা!"

ছোটমামা বীরদর্পে হাঁটতে থাকলেন। বললেন, "তোর বুদ্ধি আছে পুঁটু! খুব জব্দ হয়ে গেছে জটাবাবা!"

"জটাবাবার পা অত ঠাণ্ডা কেন ছোটমামা?"

"ঠাণ্ডা হবে না? জটাবাবাকে তুই জ্যান্ত মানুষ ভেবেছিস নাকি?"

চমকে উঠে বললুম, "জ্যান্ত মানুষ নয়? তা হলে কী?"

ছোটমামা চাপাস্বরে বললেন, "বাড়ি ফিরে বলব'খন। রাতবিরেতে নিরিবিলি জায়গায় ওসব কথা বলতে নেই।"

এবার ছোটমামার মনে সাহস জেগেছে। তাই যাত্রাদলের বিবেকের সেই গানটা গাইতে শুরু করলেন। কিছুটা চলার পর হঠাৎ গান থামিয়ে বললেন, "ভুল হয়ে গেছে। বুঝলি পুঁটু?"

"কী ভুল ছোটমামা?"

ডান দিকে আঙুল তুলে ছোটমামা বললেন, "ভুল করে কংকালিতলার ঝিলের ধারে এসে পড়েছি। এখানে কোথায় একটা শ্মশান আছে যেন। বড্ড বিপদে পড়া গেল দেখছি।"

একটু ভেবে নিয়ে ঝিলের ধারে-ধারে হাঁটতে শুরু করলেন। ঝিলের জল জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করছে। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে কিছুটা চলার পর কারা কথা বলছে শোনা গেল। ছোটমামা বললেন, "মনে হচ্ছে, জেলেরা ঝিলে মাছ ধরতে এসেছে। আয় তো! ওদের কাছে রাস্তাটা জেনে নিই।"

ঝোপঝাড়ের পর একটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে একটা ঝুপসিকালো গাছ। তার তলায় কারা বসে চাপাস্বরে কথাবার্তা বলছে। কিন্তু যেই আমরা সেখানে গেছি, লোকগুলো, "ওরে বাবা! এরা আবার কারা" বলে চ্যাঁচামেচি করে দৌড়ে উধাও হয়ে গেল।

ছোটমামা বললেন, "যা বাব্বা! আমাদের দেখে ওরা ভয় পেল কেন? আমরা মানুষ না ভূত?"

গাছটার তলায় গিয়ে দেখি, কে খাটিয়ায় শুয়ে আছে। ছোটমামা চাপাস্বরে বললেন, "সর্বনাশ! এখানেই তো তা হলে কংকালিতলার শ্মশান। ওরা একটা মড়া পোড়াতে এসেছিল।"

মড়াটা দেখে গা ছমছম করছিল। গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। মুখটা একপাশে কাত হয়ে আছে। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ছোটমামা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে পা বাড়িয়েছেন, সেই সময় খাটিয়া থেকে মড়াটা বলে উঠল, "চিতা সাজানো হয়েছে?"

ছোটমামা বললেন, "ওরে বাবা! এ যে দেখছি জ্যান্ত মড়া! পালিয়ে আয় পুঁটু!"

মড়াটা তড়াক করে উঠে বসে বলল, "পালিয়ে যাবেন না, পালিয়ে যাবেন না! একা থাকতে আমার বড্ড ভয় করবে।"

"পুঁটু! রেডি স্টেডি গো!" বলে ছোটমামা দৌড়ুতে শুরু করলেন।

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ছোটমামার পিছনে ছুটতে থাকলুম। কিন্তু বড্ড বিচ্ছিরি ঝোপঝাড়। কোথাও চষা খেতের মাটি গাদা হয়ে আছে। তার ওপর দৌড়নো কঠিন। বারতিনেক আছাড় খেলুম। ছোটমামা একবার থেমে পিছনে তাকিয়ে বললেন, "সর্বনাশ! মড়াটা ছুটে আসছে যে!"

মড়াটার আর্তনাদ শুনতে পেলুম, "দাদা! আমাকে ফেলে যাবেন না!"

আবার আমাদের দৌড়ুনো শুরু হল। এবার এসে পৌঁছলুম গাছপালাঘেরা একটা বাড়ির কাছে। ছোটমামা বললেন, "আবার ভুল হয়ে গেছে রে পুঁটু! অন্য একটা গ্রামে চলে এসেছি মনে হচ্ছে! আয় তো এদের ডাকি।"

কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর দরজা খুলে কে একজন বলল, "কাকে চাই?"

ছোটমামা বললেন, "দেখুন, আমরা বড্ড বিপদে পড়েছি। তাই..."

"বিপদটা কী আগে শুনি?"

"কংকালিতলার শ্মশানের ওখানে একটা মড়া ছিল। হঠাৎ সে..."

লোকটা ঝটপট বলল, "থাকারই কথা। আমাদের ছোটকর্তার মড়া। তা এখনও চিতেয় ওঠেননি বুঝি?"

ছোটমামা চাপাস্বরে বললেন, "আমাদের ফলো করে আসছিলেন ভদ্রলোক। বলছিলেন, শ্মশানে ওঁর একা থাকতে বড্ড ভয় করবে।"

"মলোচ্ছাই! আমাদের লোকগুলো কোথায় গেল? তারা ছিল না?"

"ছিল তো! আমাদের হঠাৎ ওখানে দেখে ওরা কেন যেন ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল!"

লোকটা খিখি করে হেসে বলল, "তা ভয় পাবারই কথা। রাতবিরেতে কাকেও চেনা কঠিন। এই তো আপনাদের দেখেও আমি দিব্যি ভয় পাচ্ছি।"

ছোটমামা জোরে হাত নেড়ে বললেন, "আমরা মানুষ! আমরা মানুষ! আমাদের ভয় পাবেন কেন?"

"কিছু বলা যায় না মশাই! দিনকাল যা পড়েছে। কে জানে কে কোন রূপ ধরে ঘোরে।"

ছোটমামা তার দিকে এক পা এগিয়ে বললেন, "আপনি আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখুন। আমরা মানুষ। এই ছেলেটা আমার ভাগনে। আমি ওর মামা। আমরা যাত্রা দেখে বাড়ি ফিরছিলাম। রাস্তা ভুল করে এই অবস্থা। এই নিন, আমার হাতটা ঠাণ্ডা না গরম দেখুন। আমরা ভূত হলে হাতটা বরফের মতো ঠাণ্ডা হবে।"

ছোটমামা হাত বাড়িয়ে আর এক পা এগোতেই লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, "হাত সরান! হাত সরান! ওরে বাবা! হাত বাড়িয়ে ঘাড়টি ধরে মটকাবার মতলব? বড়কর্তা! বড়কর্তা! একবার আসুন তো!"

হেঁড়ে গলায় বাড়ির ভেতর থেকে কেউ বলল, "কী হল রে ভুতু ?"

লোকটা বলল, "কারা এসে গণ্ডগোল বাধাচ্ছে।"

"দরজা বন্ধ করে দে।"

আমাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ছোটমামা বললেন, "কোনও মানে হয় ?"

বললুম, "চলুন ছোটমামা ! অন্য কোনও বাড়ির লোক ডেকে জিজ্ঞেস করে নিই।"

দু'জনে হাঁটতে থাকলুম। আশেপাশে আর কোনও বাড়ি নেই। ঝোপজঙ্গল আর উঁচু-নিচু সব গাছ বাতাসে দুলছে। একটু পরে আর একটা বাড়ি দেখতে পেলুম। ছোটমামার ডাকাডাকিতে বাড়ির ভেতর থেকে কে ঘুমজড়ানো গলায় সাড়া দিল, "কী হয়েছে ?"

ছোটমামা বললেন, "দয়া করে একটু বাইরে আসবেন ?"

"না। বাইরে যাবার সময় নেই। আমি ঘুমুচ্ছি।"

ছোটমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, "কোথায় ঘুমুচ্ছেন ? এই তো দিব্যি কথা বলছেন।"

"ঘুমুতে-ঘুমুতে কথা বলা আমার অভ্যেস।"

"কী অদ্ভুত ! আচ্ছা, ঠিক আছে। ঘুমুতে-ঘুমুতে বলুন, "আমরা কনকপুর যাব কোন রাস্তায় ?"

"কনকপুর ? সে আবার কোথায় ?"

"কনকপুর চেনেন না ? বাসরাস্তার ধারে অত বড় গ্রাম।"

"বাসরাস্তার ধারে তো কত বড়-বড় গ্রাম আছে।"

ছোটমামা হতাশ ভঙ্গিতে বললেন, "ভারী বিপদে পড়া গেল দেখছি। আচ্ছা, এ-গ্রামের নাম কী ?"

জবাব এল তেমনি ঘুমজড়ানো গলায়, "নাম একটা ছিল যেন। মনে পড়ছে না।"

ছোটমামা খাপ্পা হয়ে বললেন, "আপনি দেখছি ভারী অদ্ভুত লোক। নাম ছিল মানে কী ?"

এবার জোরালো নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল। ছোটমামা এবার খুব রেগে গেছেন। দরজায় দমাদ্দম লাথি মারতে শুরু করলেন। কপাট ভেঙে পড়ল মড়মড় করে। আমার ভয় করছিল। ছোটমামার কাণ্ড দেখে। পাশের বাড়ির লোকেরা জেগে গিয়ে হইচই বাধায় যদি ? রাতদুপুরে কারও বাড়ির দরজা ভেঙে ঢোকা কি ঠিক হচ্ছে ?

কিন্তু ছোটমামা একেবারে মরিয়া। ভেতরে পা বাড়িয়ে বললেন, "আয় পুঁটু ! লোকটাকে ঘুম থেকে জাগানো দরকার। ঘুমের ঘোরে মাথামুণ্ডু কীসব বলছে।"

ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে দেখলুম, একটা লোক উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার নাক ডাকছে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘুমোতে পারে মানুষ ? উঠোনে সাদা হয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে। লোকটার নাক থেকে ঘড়র-ঘড়র শব্দ হচ্ছে। ছোটমামা তার গায়ে ধাক্কা দিয়েই পিছিয়ে এলেন। বললুম, "কী হল ছোটমামা ?"

ছোটমামা চাপাস্বরে বললেন, "ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না, পুঁটু ! লোকটার গা বরফের মতো ঠাণ্ডা !"

আঁতকে উঠে বললুম, "চলে আসুন ছোটমামা !"

ছোটমামা ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, "পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে রে। বরং এক কাজ করি আয়। ওই বারান্দায় দু'জনে শুয়ে পড়ি। ভোরবেলা নিশ্চয় মানুষজনের দেখা পাব। তখন জিজ্ঞেস করে নেব।"

উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে একজন ঘুমন্ত লোক, যার গা নাকি বরফের মতো ঠাণ্ডা এবং এই বাড়িটাও তার। এখানে ঘুমনো কি ঠিক হবে ? কিন্তু ছোটমামা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন বারান্দায়। তারপর চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন। আমারও খুব ঘুম পাচ্ছিল। শুয়ে পড়লুম শানবাঁধানো বারান্দায়। দু'জনেই ক্লান্ত।

তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি।

ঘুম ভাঙল ছোটমামার ডাকাডাকিতে। চোখ খুলে উঠে বসলুম। তারপর খুব অবাক হয়ে গেলুম। এ কোথায় শুয়েছিলুম আমরা ? ভোরের আলোয় সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটা বটগাছের তলায় শুকনো ন্যাড়া মাটিতে মামা-ভাগনে খুব ঘুমিয়েছি। কোথাও ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই। শুধু জঙ্গল।

ছোটমামা বললেন, "হাঁ করে কী দেখছিস ? রাতবিরেতে বেরুলে একটু গণ্ডগোল হয়েই থাকে। চল, বাড়ি ফিরি।"

হাঁটতে-হাঁটতে বললুম, "রাস্তা চিনতে পারবেন তো ছোটমামা ?"

ছোটমামা করুণ হেসে বললেন, "দিনের বেলা আর ভুল হবে না। আমরা কোথায় চলে এসেছিলুম জানিস ? কংকালিতলার জঙ্গলে। প্রবলেম হল, রাতবিরেতে কিছু চেনা যায় না। চেনা জায়গাও অচেনা হয়ে যায়।"

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

এবার এল

সেরা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য হালফ্যাশনের স্ট্রাইপড্ ১০০% সুতী

আপনার ত্বককে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে বাছাই করা স্ট্রাইপড্ ১০০% সুতীর

belle পালোমা প্যান্টি

অভিনব, নরম স্ট্রাইপড্ ১০০% সুতীর কাপড়

সুস্থতম সুতীতে বোনা—তাই যেমন নরম—পরেও তেমন আরাম। আপনার ত্বককে দেবে স্বাচ্ছন্দ্য—দেখতেও দারুণ।

পা ও কোমর ঘিরে ইলাসটিকের স্বাচ্ছন্দ্য

এই কাজকরা, নরম ইলাসটিক দেখতেও ভালো—পরতেও ভালো। পরে দেখুন, মাপও একেবারে ঠিকঠাক।

মেয়েদের গঠন অনুযায়ী সুন্দর, আধুনিক কাট

এই প্যান্টি আপনার শরীরের আকার নেবে। বেশী আঁটো বা বেশী ঢিলে হবে না। চলতে ফিরতে কত আরাম!

বেল মানেই ভালো জিনিষ, ঠিক দাম

বাছাই করা সেরা উপাদান, বিদেশী মেশিনে সেলাই করা—বেল্ পালোমা প্যান্টি যেমন আরামদায়ক তেমন টেকসই।

পালোমা স্ট্রাইপস—১৮/-
পালোমা রিবড—১৬/-
পালোমা ডোরি—১২-৫০

যে সব কমিশন এজেন্ট/রিটেলাররা আমাদের সেরা মানের জনপ্রিয় অন্তর্বাস বিক্রী করতে চান, তাঁদের আমরা নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। এ ছাড়াও কলকাতার বড়বাজারে পাইকারী হারে পাওয়া যায়।

Belle Wears Private Ltd
54B Suburban School Road
Calcutta 700 025
Phone : 48-3708

belle দেখতে ভালো, পরতে ভালো, মন ভরালো বেল্ Paloma

HTA 3578 R1

নস্যি

শৈলেনকুমার দত্ত

সেবার গহন বনে ছুটেছি বাঘের পিছু
যত যাই এগিয়ে তবু বনেতে পাই না কিছু।
হাতে নেই তেমন আলো চলেছি আপন ধাঁচে,
মাটিতে তাকিয়ে দেখি সাপেরা পালিয়ে বাঁচে!
শেয়ালে তাকায় ভয়ে খোঁজে সে টিফিন কোটো,
যদি চাও পেসাদ পেতে বাছাধন একটু ছোটো!
হরিণের চোখটা দেখে রাইফেল লুকিয়ে রাখি,
দেখে তা গাছের ডালে সভয়ে কাঁপছে পাখি।
বাইসন একটা ছিল, দেখি তার চোখের দিকে,
পালাতে হবেই তাকে যদি চায় থাকতে টিকে।
হনুমান লাফায় গাছে ডাক দেয় হুপ্প হুপু,
কেউ বুঝি ডাকছে রে ওই চুপ চুপ একটু চুপু।
বাঘ যদি জানতে পারে আমরা টের পেয়েছি,
যাবে যে ভীষণ রেগে তা হলে তো মরেই গেছি।
বাঘেরা লুকোয় কোথা ভেবে তাই হচ্ছি সারা,।
ভুলটা একলা আসা, কে দেবে ওদের তাড়া!
শেষেতে টিফিনগুলো বসে খাই আপন মনে,
হঠাৎই নড়ল পাতা বাঁ দিকে গাছের কোণে।
দেখি এক ধুম্বো বাঘে পাকাল চক্ষু দুটি,
রাইফেল ঝুলছে গাছে, কী করে এখন উঠি!
ট্যাঁকেতে কৌটো ছিল তা থেকে নস্যি নিয়ে,
ছুঁড়ে দি' বাঘের নাকে, ছোটে সে ল্যাজ গুটিয়ে।
আমার এই বীরত্বটা কেতাবে নেই তো লেখা,
ঘটনা সত্যি বটে, তবে তা স্বপ্নে দেখা!

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

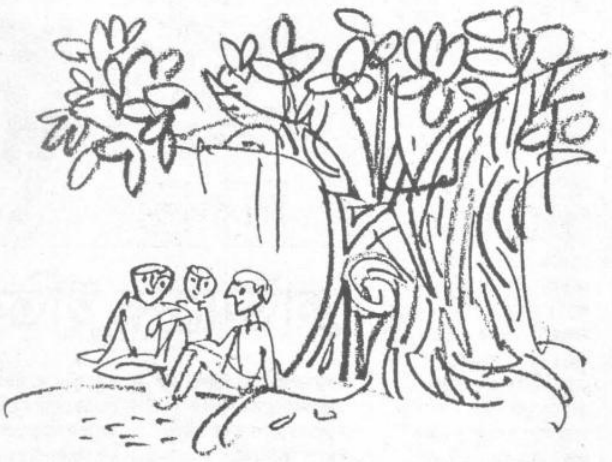

দেখেছি

কালিদাস ভট্টাচার্য

বৃদ্ধ গাছের জবুথবু ছায়াটাতে
যুবক ছেলেরা বসেছে এখন এসে,
ছায়াটা এখন চুপ করে শুয়ে আছে
জানি না কী কথা বলছে ছেলেরা হেসে।
চনমনে রোদে মাঠটা উঠেছে নেয়ে
দুষ্টু হাওয়ারা দুষ্টুমি করে বেশ,
ঝরাপাতাগুলো সাথে নিয়ে তারা ছোটে
দুলিয়ে দিচ্ছে পাখির গানের রেশ।
সব ছেলে মিলে এবার দাঁড়াল উঠে
সবাই হাসল ঠিক ফুলেদের মতো
সে হাসির ধারা মনের ভেতর থেকে
ঝরঝর করে ঝরছিল সুখ কত।
জবুথবু হাওয়া হয়েছে এখন বড়
থাকল সে শুয়ে অন্যরকম ভাবে
ছেলেগুলো উঠে হাঁটতে লাগল ধীরে
মনে হল তারা এবার ঘরেই যাবে।
সূর্যটা দেখি চলে গেছে পশ্চিমে
অনেক আবির মেখেছে সারাটা গায়,
দেখতে তখন ভালই লাগছে তাকে
তাই সুখ হাসে মনটার আঙিনায়।
দেখতে দেখতে সূর্য পালিয়ে গেল
জবুথবু ছায়া নেই আর কোনোখানে,
কালো কুচকুচে রাত্তির এল নেমে
আমি চললাম আমার বাড়ির টানে।

কুইজ

নিল ও'ব্রায়েন

ক্লাউনদের ইতিহাস

সচরাচর সার্কাসে যেমন কিম্ভূত-কিমাকার পোশাক পরা কমেডিয়ানদের দেখা যায়, বিশেষভাবে তাদের বোঝানোর জন্যই আজকাল আমরা 'ক্লাউন' বা 'ভাঁড়' কথাটা ব্যবহার করি। সে কখনও রংচঙে মজাদার পোশাক পরে, পরে বিচিত্র প্যান্টালুন। ফ্রিল-দেওয়া তার জামা। মাথায় ছুঁচলো টুপি। কখনও আবার সে মুখে মাখে চকচকে সাদা রং। তার সব অভিব্যক্তিই তখন হাসির উদ্রেক করে। আবার মাঝেমধ্যে তাকে সাদামাটা পোশাক পরতেও দেখা যায়। সে-পোশাক হয় খুব ঢোলা, না হয় তার গায়ের তুলনায় খুবই খাটো। এর সঙ্গে থাকে লাল পরচুলা ও নকল নাক। মাঝেমধ্যে এটা-ওটা কিছু কথা অবশ্য সে বলে থাকে। তবে প্রধানত নীরব ভাবভঙ্গি দিয়েই সে আমাদের হাসায়।

সার্কাসের ক্লাউনদের ইতিহাস সুপ্রাচীন। একেবারে সেই গোড়ার দিক থেকেই মঞ্চে ও মঞ্চের বাইরে কমেডিয়ানদের দেখা যেত। প্রাচীন রোমানদের আমলে মধ্যযুগীয় বিদূষকদের মতো ছিল ভাঁড়। রোমানদের সেই আমলে মঞ্চেও কৌতুক-অভিনেতাদের দেখা যেত। মূকাভিনয় থেকে শুরু করে কীসব মজার মজার কাণ্ডই না তারা করত! ঠিক আমাদের আধুনিক কালের ক্লাউনদের মতো। মধ্যযুগের যাযাবর কৌতুকশিল্পীদের মধ্যে ছিল সব রকমের কমেডিয়ান। এদের অনেকেই আবার 'জাগলিং' করত, দেখাতে পারত দড়ির খেলা ও আরও নানা ধরনের ভেলকি। এমনকী যখন এই যাযাবর ক্লাউনদের সংখ্যা খুব কমে এল, তখনও বিভিন্ন মেলায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা যেত। আর তারপর, অষ্টাদশ শতকে, তাদের সার্কাসে নিয়ে নেওয়া হল। আধুনিক সার্কাসের ক্লাউন এখনও সুদক্ষ 'জাগলার' ও 'অ্যাক্রোব্যাট'। সার্কাসের নিয়মিত শিল্পী ও খেলোয়াড়দেরও তারা টেক্কা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

মধ্যযুগের ধর্মীয় নাটকগুলিতে শয়তানকে 'কমিক' চরিত্র হিসেবে দেখানো হত। ক্রমেই তাদের কাণ্ডকারখানা আরও বেশি করে ভাঁড়ামিতে পর্যবসিত হল। অনেকের ধারণা, আজকের ক্লাউনদের অদ্ভুত মেক-আপ এসেছে ওই কমিক-শয়তানদের কাছ থেকে। তাদের মতো আজকের ক্লাউনরাও মুখে রং মাখে। তবে প্রাচীন আমলের সবচেয়ে ভাল ক্লাউনদের দেখা যেত ইতালীয় কমেডিগুলিতে। কাজের লোক সেজে তারা মজার মজার ঘটনা ঘটাত। শেক্সপিয়রের নাটকের বোকা কিছু চরিত্রকেও অনুপ্রাণিত করেছিল এই ইতালীয় কমিক চরিত্রগুলি। ইতালির বিভিন্ন প্রান্তে এই চরিত্রগুলির উদ্ভব। চাষিদের মতো ছিল তাদের বেশ-ভূষা। ঢোলা প্যান্টালুনও তারা পরত। মাথায় ছিল ছুঁচলো টুপি। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে 'ক্লাউন' হিসেবে পরিচিত একটি চরিত্র ইংরেজি মূকাভিনয়ে প্রধান হয়ে উঠল। ষোড়শ শতকের ইতালির দাস-চরিত্রের পোশাক-আশাকের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়েছিল তাদের বেশ-ভূষা। তবে পরনের প্যান্টটা ছিল কিছুটা আলাদা। আর মাথাতেও ছিল বিচিত্র পরচুলা। হাতে কিছু একটা জিনিস নিয়ে সর্বদাই সে অন্য চরিত্রদের তাড়া করত। এই ধরনের ক্লাউনদের মধ্যে সেরা ছিলেন যোশেফ গ্রিমাল্ডি। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় তিনি দর্শকদের সবার নজর কেড়ে নিয়েছিলেন। পরবর্তী কালের ক্লাউনদের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল বিরাট। তাঁর মতো সাবেকি পোশাক-পরা সব ক্লাউনকেও পরে 'জোয়ি' নামে ডাকা হত। গ্রিমাল্ডির মূকাভিনয় ছিল অসাধারণ। সাদামাটা সব জিনিসপত্র ও লোকজনদের নিয়ে এমন সব কাণ্ডকারখানা তিনি করতেন যাতে হাসির হুল্লোড় পড়ে যেত। ঝাঁটা বা ঝুলঝাড়ুর মতো জিনিসপত্র নিয়ে এমন ভঙ্গি করতেন যেন ওগুলি বাদ্যযন্ত্র! গ্রিমাল্ডি কখনও সার্কাসের ক্লাউন ছিলেন না। তবে তিনি যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, তা সার্কাসের আঙিনাতেও পৌঁছে গিয়েছিল। জোয়ি নামে যে ক্লাউনদের ডাকা হত সার্কাসের ক্লাউনরা তার চেয়ে আলাদা। তবে গ্রিমাল্ডির পর জোয়ি ক্লাউনরাও সার্কাসের অংশ হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল 'হুইমজিক্যাল ওয়াকার'।

উনবিংশ শতকের শেষদিকে এল নতুন ধরনের আর এক ক্লাউন। সাদামাটা তার পোশাক। বিরাট ব্যাগি প্যান্ট, গায়ের তুলনায় বিরাট লম্বা কোট, বড় বড় জুতো। আর মোটা গোল লাল নাক। এই ক্লাউনদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন গ্রক। তিনি ও চার্লি চ্যাপলিন এই চরিত্রকে চলচ্চিত্রে রূপ দেন। সার্কাসের স্টাইলের 'ক্লাউনিং' নির্বাক চলচ্চিত্রের পক্ষে বেশ উপযুক্ত ছিল। চ্যাপলিন এতেই যোগ করেন নতুন এক মাত্রা। তাঁর ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি ছিল অত্যুৎকৃষ্ট। তিনি এমন একজনকে সৃষ্টি করলেন যিনি সার্কাসের মতো ক্লাউন হয়েও, অত্যন্ত বাস্তব ও করুণ একটি চরিত্র।

কুইজ

প্রশ্ন

(১) ডাচ গুয়ানার বর্তমান নাম কী ? **কল্লোল বসু,** রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন হাই স্কুল ।
(২) 'দা আর্টিস্ট' নামে কোন ক্রিকেটার পরিচিত ছিলেন ? **ডোডো দাশগুপ্ত,** কলকাতা-১৪ ।
(৩) নুরউদ্দিন মহম্মদ কোন নামে অধিক পরিচিত ? **সুদীপ্ত পাল,** শান্তিনিকেতন ।

(৪) PTI-এর পুরোটা কী ? **পার্থপ্রতিম সরকার,** মেদিনীপুর ।
(৫) 'দা প্রিন্স' বইটি কার লেখা ? **সোমনাথ চ্যাটার্জি,** নদীয়া ।
(৬) টিভি সিরিয়াল 'মহাভারত'-এ ভীমের ভূমিকায় কে অভিনয় করছেন ? **অরিজিৎ সেনগুপ্ত,** মেদিনীপুর ।
(৭) সমরখন্দ রাশিয়ার কোন প্রদেশে অবস্থিত ? **শুভেন্দু মজুমদার,** কলকাতা-৬৪ ।
(৮) কোন দেশকে বলা হয় 'শ্বেত মানুষের কবর' ? **সঙ্গীতা বিশ্বাস,** ঝাড়গ্রাম ।

(৯) 'দানসাগর' বইটির রচয়িতা কে ? **পার্থসারথি ঘোষ,** কান্দি রাজ উচ্চ বিদ্যালয় ।
(১০) বিড়ালের মুখে দাঁতের সংখ্যা কত ? **সোমশেখর ভট্টাচার্য,** বিধাননগর রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় ।
(১১) হাজার হ্রদের দেশ কোনটি ? **ইন্দ্রজ্যোতি সাহা,** বার্নপুর ।
(১২) কে পেয়েছিলেন 'কবিকঙ্কণ' উপাধি ? **রানা বসু,** লেক টাউন ।
(১৩) প্রথম ভারতীয় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান টেস্ট ক্রিকেটারের নাম কী ? **সৌমেন দাশ,** উত্তর ২৪ পরগনা ।

গত সংখ্যার উত্তর

(১) শিবদাস ভাদুড়ী ও গোষ্ঠ পাল ।
(২) চলমান সিঁড়ি ।
(৩) জাভেদ মিয়াঁদাদ ।
(৪) God be with ye.
(৫) রিড ওনলি মেমারি ।
(৬) নীরদচন্দ্র চৌধুরী ।

জাভেদ মিয়াঁদাদ

রঞ্জিত সিং

(৭) ওয়াল্টার হান্ট ।
(৮) টেগুসিগাল্‌পা ।
(৯) ফ্লোরেন্স গ্রিফিথ জয়নার ।
(১০) কৃশানু দে ।
(১১) লখনউ ।
(১২) কাশ্মির ।
(১৩) বাঁশের গুঁড়ি ।
(১৪) রাজস্থান ।
(১৫) চিন ।
(১৬) ডঃ কেশব বলিরাম হেডগেয়ার ।
(১৭) রাজা মান সিং ।
(১৮) রঞ্জিত সিং ।
(১৯) নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ।
(২০) উত্তরপ্রদেশের মিরাট শহরের কাছে ।
(২১) অ্যাপলো বন্দর, বোম্বাই ।

গোষ্ঠ পাল

(১৪) 'হাজার চুরাশির মা' কার লেখা ? **সুরজিৎ বটব্যাল,** বাঁকুড়া ।
(১৫) শিশুদিবস কার জন্মদিনে পালিত হয় ? **সপ্তর্ষিসু ও জয়ন্ত,** বাঁকুড়া
(১৬) ধর্মরাজের কেরানি কে ? **পার্থ ঘটক,** বাঁকুড়া ।
(১৭) 'Land of Thunderbolt' কোন দেশকে বলা হয় ? **মনোমোহন সারদা,** কাছাড় ।
(১৮) কোন রাজনীতিবিদের ডাকনাম 'পিঙ্কি' ? **শেখ আবদুর রব,** বর্ধমান ।

(১৯) দক্ষিণ মেরু কে আবিষ্কার করেন ? **সৌরভ দাশ,** শান্তিনিকেতন ।
(২০) এই বছর কোন ভারতীয় কাহিনীচিত্র শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে ? **অঙ্কন বিশ্বাস,** কলকাতা-৪৬।
(২১) UNICEF-এর সম্পূর্ণ নাম কী ? **অপরূপা মাইতি,** ঝাড়গ্রাম রানি বিনোদমঞ্জরী রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় ।
(২২) 'Black Bradman' কাকে বলা হত ? **সৌমেন্দ্রনাথ মণ্ডল** পাঁশকুড়া ।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

বিষয় : রং

প্রশ্ন

(১) কোন রংয়ের মধ্যে পুরোপুরি মিশে আছে সব ক'টি রং ?

(২) চিনাদের কাছে সৌভাগ্যের প্রতীক কোন রং ?

(৩) আয়ারল্যান্ডের জাতীয় রং কী ?

(৪) যারা বর্ণান্ধ তারা কোন দু'টি রঙের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না ?

(৫) যাবতীয় রঙের সমন্বয়ের মধ্যে কোন দু'টি রং সবচেয়ে বেশি নজর কেড়ে নেয় ?

(৬) শেকসপিয়রের মতে, কে বা কী 'সবুজ চোখঅলা দৈত্য'।

(৭) প্রাচীনকালের রোমানরা যুদ্ধের সংকেত হিসেবে কোন রঙের পতাকা ব্যবহার করতেন ?

(৮) কার দুই দল অনুগামীকে বলা হত 'ব্রাউন শার্ট্‌স' ও 'ব্ল্যাক শার্ট্‌স'।

(৯) সাদা সোনা কী ?

(১০) প্রাচীন গ্রিকরা একটি রঙকে বাতাসের প্রতীক বলে মনে করত, সেই রংটিই আবার লিওনার্দো দা ভিঞ্চির কাছে ছিল পৃথিবীর প্রতীক। কোন রং ?

(১১) 'গ্রিন-স্টিক ফ্র্যাকচার' কী ?

(১২) সুন্দর স্বপ্ন দেখার জন্য প্রাচীন গ্রিকরা কোন রঙের জামা পরতেন ?

(১৩) 'হলুদ পাতা' কী ?

(১৪) কমলালেবু গাছের সুগন্ধী সাদা ফুল পশ্চিমের দেশগুলিতে সাবেক রীতি অনুযায়ী কারা পরে থাকেন ?

(১৫) মস্কোর 'রেড স্কোয়ার' অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি স্থান। কিন্তু এর সঙ্গে রঙের কোনও সম্পর্ক নেই। লাল কথাটির মানে কী ?

(১৬) 'কালো মৃত্যু' কী ?

(১৭) ইংরেজি এক উপন্যাসের একটি চরিত্র ছদ্মবেশ নিয়ে ফরাসি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের অভিজাতদের রক্ষা করেছিলেন। সেই চরিত্রটির গোপন নাম কী ?

(১৮) 'ব্লু পিটার' কী ?

(১৯) কোন আন্দোলনের নাম 'Black Sash Movement'

(২০) 'কর্পোরাল ভায়োলেট' কাকে বলা হত ?

উপরের ছবি :

(ক) এই বাড়িটির নাম কী ?

(খ) এটি কোনারকের মন্দিরের ছবি। এর একটি বিকল্প নামও আছে (সূত্র : নামের মধ্যে আছে একটি রং)।

(গ) এই প্রাণীটির নাম কী ?

কুইজ

(ক)

(খ)

(গ)

উত্তর : (১) কালো। (২) লাল। (৩) সবুজ। (৪) সবুজ ও লাল। (৫) হলুদের ওপর কালো। (৬) ঈর্ষা। (৭) লাল। (৮) অ্যাডল্‌ফ হিটলার। (৯) নিকেল ইত্যাদি মেশানো সোনার এক বিবর্ণ ধাতু-সঙ্কর। (১০) হলুদ। (১১) হাড়ের একটা দিক যখন ভেঙে যায় এবং আর-একটি দিক যায় বেঁকে। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এ ধরনের হাড় ভাঙতে দেখা গেছে। (১২) সাদা। (১৩) টেলিফোন-ডাইরেক্টরির যে অংশ হলুদ পাতায় ছাপা হয়, যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির গ্রাহকদের নাম ও টেলিফোন নম্বর থাকে। (১৪) বর এই ফুল পরে। (১৫) রুশ ভাষায় এর অর্থ 'সুন্দর'। (১৬) চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপে প্লেগ রোগ মহামারীর আকার নেয়। হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছিলেন সেই রোগে। (১৭) দা স্কারলেট পিম্পারনেল। (১৮) জাহাজ বন্দর থেকে ছাড়ার সময় সাদা বর্গক্ষেত্র আঁকা নীল পতাকা তোলা হয়। (১৯) দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে নারী-আন্দোলন। (২০) নেপোলিয়ন। এলবা-য় নির্বাসনে থাকার সময় তিনি তাঁর অনুগামীদের বলেছিলেন, "বসন্তের ভায়োলেট যখন ফুটবে, তখন আমি ফিরে আসব।"

ছবির পরিচয় : (ক) হোয়াইট হাউস। (খ) ব্ল্যাক প্যাগোডা। (গ) নীল গাই।

জার্মানির মিউজিয়ামে প্রাচীন কম্পিউটার

সম্প্রতি মিউনিখের ডয়েশ মিউজিয়ামে 'কম্পিউটিং অ্যান্ড অটোমেশন' নামে নতুন একটি বিভাগ খোলা হয়েছে। এই বিভাগে প্রাচীন গণনা-যন্ত্র অ্যাবাকাস থেকে শুরু করে আধুনিক মাইক্রোইলেকট্রনিক্স পর্যন্ত সব-কিছুই স্থান পেয়েছে। প্রায় ১০০০ বর্গ মিটার জায়গা জুড়ে প্রদর্শিত হয়েছে কম-বেশি ৭০০টি আকর্ষক যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ। তারই মধ্যে বিশিষ্ট হল, ব্রাউন এবং ভেরিঞ্জ-এর তৈরি একটি গণনা-যন্ত্র। আনুমানিক ১৭৩৫-এ তৈরি পিতল-নির্মিত এই গণনা-যন্ত্রে শক্তি জোগানো হত চাবিতে দম দিয়ে। এই যন্ত্রের কর্মক্ষমতার চেয়েও আকর্ষক এর রূপ। এরকম সুদর্শন গণনা-যন্ত্র সত্যিই দুর্লভ। এর অঙ্গের কারুকাজ ও পাদানির গড়ন দেখলে মনে হয়, বিজ্ঞান ও চারুকলার আদর্শ মিলন ঘটেছে ব্রাউন ও ভেরিঞ্জ-এর এই গণনা-যন্ত্রে।

ব্যস্তবাগীশ মানুষের জন্য ইলেকট্রনিক ম্যানেজার

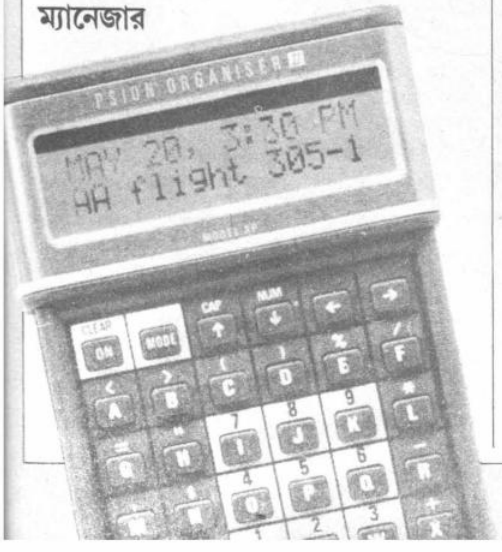

ধরা যাক, সাঙ্ঘাতিক ব্যস্তবাগীশ কোনও অফিসার বা সিনিয়ার এগ্‌জিকিউটিভ কিংবা কোনও নামী কম্পানির এক ডিরেক্টরের আগামী এক সপ্তাহের রোজনামচা আমরা দেখতে চাই। কীরকম হবে সেই তালিকা ? ছ'দিনে ১৩টা মিটিং, ১০৮টা জরুরি খবর পাঠানোর দায়িত্ব, ২৯৭টা হিসেব-নিকেশ, ৬টা লাঞ্চের অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কম্পানির কাজে তিনবার বিমান-ভ্রমণ, ১৭তম নাকি ১৮তম বিবাহবার্ষিকী, ছেলেমেয়ের স্কুলে পেরেন্ট্‌স্ ডে, তারপর···

এতগুলো কাজের তাল রাখাই মুশকিল।

সুতরাং পরিকল্পনামাফিক গুছিয়ে কাজ করার জন্য সেই ব্যস্তবাগীশ মানুষের দরকার ইলেকট্রনিক ম্যানেজার 'অর্গানাইজার-টু'। হাতের মুঠোয় ধরা যায় এমন মাপের এই কম্পিউটার ম্যানেজার হয়ে উঠবে তাঁর সব সময়ের সঙ্গী। এই 'ম্যানেজার' মনে রাখবে কে, কী, কবে, কেন, আর কোথায়। এর মধ্যে রয়েছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট-বই, ফোন-বই, ঠিকানা-তালিকা রাখার জায়গা, ক্যালেন্ডার, ক্যালকুলেটর, খরচের হিসেব রাখার ব্যবস্থা, বিক্রির হিসেব, মেসেজ প্যাড এবং সর্বোপরি নোটবই। সুতরাং জটিল জীবনযাত্রাকে সরল করে তুলতে অর্গানাইজারের তুলনা নেই।

অনুসন্ধানী

মেরি কুরি

চঞ্চল পাল

মেরি আর ব্রোনিয়া দুই বোন। দু'জনের মধ্যেই আশ্চর্য মিল। চেহারায় নয়, মানসিকতায়। কিশোর বয়স থেকেই দু'জনেই বই-পাগল। পড়ার মতো কিছু হাতে পেলেই হল, তা শেষ না করে ছাড়বে না। কিন্তু যখন-তখন বই কিনে পড়ার সামর্থ্য তাদের ছিল না। বাবা একটি স্কুলে বিজ্ঞান পড়াতেন। মাঝে-মাঝে বিজ্ঞানের কিছু বই স্কুল থেকে নিয়ে আসতেন। কিন্তু মেরি আর ব্রোনিয়া দু'জনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ত বইগুলোর ওপর। বেশিরভাগ বইই বুঝতে পারত না তারা। তবু বইগুলো খুঁটিয়ে দেখার লোভ সামলাতে পারত না। বুঝতে পারুক আর না-পারুক, বিজ্ঞানের বইগুলোর ভেতর তারা অনেক রহস্যের সন্ধান পেত।

বাবা কোনওদিন বিজ্ঞানী হতে চেয়েছিলেন কি না জানা যায়নি, তবে বিজ্ঞান পড়াতে গিয়ে ছাত্রদের কাছে তাঁকে অনেক কিছুই হাতে-কলমে করে দেখাতে হত। তাই স্কুল থেকে কিছু যন্ত্রপাতি ধার করে এনে বাড়িতে নাড়াচাড়া করতেন। মেরি আর ব্রোনিয়া বাবার ঘরে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত আর অবাক হয়ে দেখত একটা ছোট্ট বালব ব্যাটারির সঙ্গে যোগ করতেই টুক করে জ্বলে উঠছে অথবা একটা খুব সরু নল জলে ডোবাতেই নলের ভেতর দিয়ে জল আপনাআপনি ওপরে উঠে যাচ্ছে অথবা একটা সাদা রঙের তরল আর একটা লাল রঙের তরলের সঙ্গে মিশে ঘন নীল হয়ে উঠছে। কেন এরকম হচ্ছে জিজ্ঞেস করলে বাবা ছোটদের মতো করে বোঝাবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু এর ফলে তাদের জানবার কৌতূহল আরও বেড়ে যেত।

তখনকার দিনে মেয়েদের বেশি লেখাপড়া করার ইচ্ছে থাকলেও উপায় ছিল না। মেরির জন্ম পোল্যান্ডের ওয়ারশ শহরে, ১৮৬৭ সালের ৭ নভেম্বর। ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও ছাত্রীকে ভর্তি করা হত না। তখন সবচেয়ে কাছের বিশ্ববিদ্যালয় বলতে প্যারিসের 'সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়'। কিন্তু দুই মেয়েকে ফ্রান্সে পাঠিয়ে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা বাবার ছিল না।

তাই মেরি আর ব্রোনিয়া ঠিক করলেন যে, একজন ওয়ারশতে চাকরি করবেন আর অন্যজন সোরবন-এ পড়তে যাবেন। মেরিই প্রস্তাব দিলেন যে, ব্রোনিয়া পড়তে যাক আর তিনি একটি বাড়িতে একটি বাচ্চাকে দেখাশোনা করার চাকরি নিয়ে নিলেন। যা মাইনে পেতেন তার অর্ধেক পাঠিয়ে দিতেন ব্রোনিয়াকে। ছ' বছর বাদে ব্রোনিয়া ডাক্তারি পাশ করলেন, কিন্তু আর দেশে ফিরলেন না। একজন স্থানীয় ডাক্তারকে বিয়ে করে সেখানেই রয়ে গেলেন। অবশ্য মেরির কথা তিনি ভুলে যাননি। তাই তিনি মেরিকে তাঁর বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করার জন্য ডেকে পাঠালেন। মেরির বয়স তখন ২৪।

কিন্তু মেরি প্যারিসে এসে ব্রোনিয়ার পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে গেলেন। লেখাপড়ার ব্যাপারে ব্রোনিয়ার উৎসাহ অনেক কমে গেছে। তার ওপর বন্ধু ও প্রতিবেশীদের নিয়ে হইচই করতেই তাঁর সময় কেটে যায়। এরকম পরিবেশে পড়াশোনা চালাতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল বলে মেরি একটি পোড়ো বাড়িতে খুব কম ভাড়ায় একটি চিলেকুঠরিতে গিয়ে উঠলেন। ঘরটিতে শীতকালে যেমন হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা, গরমকালে তেমনই অসহ্য গরম। আসবাবপত্র বলতে একটি টেবিল ও একটি চেয়ার আর দৈনিক খাবার বলতে পাউরুটি আর মাখন। রোজ কিছু ফল আর একটি করে ডিম খাবার জন্যও খরচ করতে তাঁর ভয় হত। কারণ দেশ থেকে আসার সময় যেটুকু অর্থ তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তা শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। এত দারিদ্র্য সত্ত্বেও ব্রোনিয়ার কাছে হাত পাততে তাঁর লজ্জা হত।

অপুষ্টিকর খাদ্য, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান আর আর্থিক দুরবস্থা মেরিকে তাঁর সঙ্কল্প থেকে টলাতে পারেনি। ১৮৯৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম স্থান দখল করলেন। উচ্চশিক্ষার জন্য জেদ চেপে গেল তাঁর। পরের বছরেই গণিতে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। দু'টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাওয়ার পর তিনি মনস্থ করলেন গবেষণা করবেন।

প্রথমে তিনি চুম্বক ও তড়িৎ শক্তি নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন। এ-বিষয়ে গবেষণা করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন এমন একজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে মেরির পরিচয় হল। তাঁর নাম পিয়ের কুরি। ক্রমশ পিয়ের হয়ে উঠলেন মেরির স্বামী, শিক্ষক, বন্ধু ও গবেষণার সহকর্মী। বিয়ের আগে মেরির পদবি ছিল স্ক্লোদভস্কা ; এখন থেকে তিনি হলেন মেরি কুরি।

ফরাসি বিজ্ঞানী হেনরি বেক্‌রেল লক্ষ করেছিলেন ইউরেনিয়াম লবণ থেকে বিচ্ছুরিত বিকিরণ কাগজ ও রুপোর পাত ভেদ করে চলে যায়। ঘটনাটি মেরিকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করল। স্বামী-স্ত্রী মিলে ঠিক করলেন যে, এর প্রকৃত কারণটি খুঁজে দেখাই হবে তাঁদের গবেষণার বিষয়।

শুরু হল ইউরেনিয়ামের বিভিন্ন যৌগ নিয়ে মেরির পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কয়েক বছর বাদে বুঝতে পারলেন যে, বিকিরণের পরিমাণ নির্ভর করে ইউরেনিয়ামের পরিমাণের ওপর। এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে—ইউরেনিয়াম পরমাণু ভেঙে বিকিরিত রশ্মি বের হয়। ফলে এটিও প্রমাণিত হল যে, পরমাণুই পদার্থের মূল উপাদান নয়, পরমাণুকেও ভেঙে ফেলা যায়। তত্ত্বটি বিজ্ঞানে এনে দিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

এবার মেরি খুঁজে দেখতে শুরু করলেন কোন খনিজের ভেতর কতটা ইউরেনিয়াম আছে। একদিন হাতে এল 'পিচব্লেন্ড' নামক খনিজ পাথর। এটি যে ইউরেনিয়ামের একটি উৎস, তা আগেই জানা ছিল। কিন্তু মেরি এটিকে পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন অন্য কারণে। তিনি লক্ষ করলেন, পিচব্লেন্ডে যতটুকু ইউরেনিয়াম আছে তার বিকিরণক্ষমতা চতুর্গুণ বেশি। কিন্তু পরমাণুই যদি বিকিরণের মূল উৎস হয়, তা হলে একই মৌলিক পদার্থের বিকিরণক্ষমতা বিভিন্নরকম হতে পারে না। তাই মেরির সন্দেহ হল, পিচব্লেন্ডের ভেতর অন্য কোনও মৌলিক পদার্থ নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে যার বিকিরণক্ষমতা ইউরেনিয়ামের চেয়ে অনেক বেশি। অর্থাৎ, বিকিরণক্ষমতা কোনও একটি পদার্থের বিশেষ ক্ষমতা নয়, বরং একটি

পিয়ের কুরির বাঁ হাতে রেডিয়াম-সৃষ্ট ক্ষত

পিচব্লেন্ড খনিজ

বিশেষ ধরনের পরমাণুর সাধারণ ধর্ম। এই ধর্মের নাম দিলেন তিনি 'রেডিও অ্যাকটিভিটি' বা 'তেজস্ক্রিয়তা'।

এর পর শুরু হল মেরি আর পিয়েরের গবেষণার আর-এক অধ্যায়—পিচব্লেন্ডের সমস্ত উপাদানকে আলাদা করা। বিশেষত এই তেজস্ক্রিয় উপাদানগুলি এতই সামান্য যে, ছ' টন পিচব্লেন্ড থেকে মাত্র এক গ্রাম তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এত বেশি পিচব্লেন্ড তাঁরা পাবেন কোথায়? খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, অস্ট্রিয়ার বোহেমিয়াতে পিচব্লেন্ডের একটি বিরাট খনি আছে। তাঁরা আবেদন করলেন, অস্ট্রিয়া সরকারের কাছে। ইতিমধ্যে তাঁদের আবিষ্কারের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। তাই অস্ট্রিয়া সরকার তাঁদের সাহায্য করতে রাজি হয়ে গেলেন এক কথায়। টন টন পিচব্লেন্ড এসে পৌঁছতে লাগল তাঁদের বাড়ির দরজায়। তাঁদের বসার ঘর, খাবার ঘর, শোবার ঘর ভর্তি হয়ে উঠল পিচব্লেন্ডের বস্তায়। দিন-রাত তাঁরা সন্ধান করতে লাগলেন পিচব্লেন্ডের ভেতরের সেই অচেনা রহস্যময় ধাতুটিকে।

১৮৯৮ সালের ১২ এপ্রিল আবিষ্কৃত হল একটি নতুন তেজস্ক্রিয় ধাতু। মেরির মাতৃভূমি পোল্যান্ডের নামে ধাতুটির নামকরণ করা হল 'পোলোনিয়াম'। আর-একটি অচেনা ধাতু তখনও পিচব্লেন্ডে রয়ে গিয়েছিল, যার নাম আগেভাগেই দিয়ে রাখলেন 'রেডিয়াম'। ১৯০২ সালে এক আউন্সের তিনশো ভাগের এক ভাগ রেডিয়াম ক্লোরাইড বিশুদ্ধ অবস্থায় শনাক্ত করা গেল। এর তেজস্ক্রিয়তা ইউরেনিয়ামের চেয়ে দশ লক্ষ গুণ বেশি।

এই আবিষ্কারের তত্ত্বগত ও প্রযুক্তিগত বিপুল সম্ভাবনা সারা পৃথিবীকে আলোড়িত করে তুলল। পরের বছরেই (১৯০৩) মেরি, পিয়ের আর বেক্‌রেল-কে একসঙ্গে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল।

কিন্তু উদয়াস্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে করতে আর বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় রশ্মির মধ্যে থাকতে থাকতে মেরি আর পিয়েরের শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়তে লাগল। মেরির ফুসফুসে সৃষ্টি হল একটি ক্ষত, আর পিয়েরের পায়ে শুরু হল অসহ্য যন্ত্রণা। তাই একদিন রাস্তায় বেরিয়ে পিয়ের নিজেকে সামলাতে পারলেন না, পিছন থেকে একটি ট্রাক এসে তাঁকে পিষ্ট করে দিয়ে চলে গেল (১৯০৬)।

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীর সঙ্গে আচমকা এই মর্মান্তিক বিচ্ছেদে মেরি শুধু ভেঙেই পড়লেন না, একটু অপ্রকৃতিস্থও হয়ে পড়লেন। সন্ধের পর কারও সঙ্গে কথা বলতেন না, ঘুমোবার আগে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখতেন আর ঘুমন্ত অবস্থায় হেঁটে বেড়াতেন। কিন্তু দিনের বেলায় তাঁর গবেষণায় ঘাটতি পড়েনি। এমনভাবে কাজ করতেন যেন পিয়ের তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। চার বছর যেতে-না-যেতেই (১৯১০) মেরি বিশুদ্ধ রেডিয়াম তৈরি করে ফেললেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয়বার তাঁকে নোবেল পুরস্কার (১৯১১) দেওয়া হল, রাসায়নিক বিশ্লেষণে অভাবনীয় কৃতিত্বের জন্য।

কিন্তু প্রতিকূলতা তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি কোনওদিন। যে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করে তিনি পারমাণবিক যুগের সূত্রপাত করলেন, সেই তেজস্ক্রিয়তাই তাঁর রক্তে লিউকোমিয়া সৃষ্টি করে কেড়ে নিল তাঁর প্রাণ (৪ জুলাই ১৯৩৪)।

মহাকাশ-দূষণ

সলিল লাহিড়ী

আবর্জনা শুধু শহরকেই নয়, গ্রামাঞ্চলের মাটিকেও দারুণ বিষিয়ে দিচ্ছে, এবং এর ফলে নিত্য নানা সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে—তা আমাদের কারও অজানা নয়। কিন্তু মাটি ছেড়ে যে আকাশেও আবর্জনা জমতে পারে সে-কথা আমরা অনেকেই জানি না। আকাশে-জমা আবর্জনা যে-কোনও সময় বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে। ধূলি, ভাসমান পদার্থ, নানা ধরনের নির্গত গ্যাস এসবই আকাশকে

দূষিত করে। আমাদের ধারণা ছিল নিম্নাকাশ, অর্থাৎ ট্রপোস্ফিয়ার, সোজা কথায় মাটি থেকে ১২ কিলোমিটার পর্যন্ত যে আকাশ তা নানা কারণে দূষিত হয়। কিন্তু নিম্নাকাশের উপরে যে মহাকাশ বা স্ট্রেটোস্ফিয়ার, কিংবা তারও উপরে যে ঊর্ধ্বাকাশ বা মেসোস্ফিয়ার, অর্থাৎ মাটির ১২ কিলোমিটার উপর থেকে ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত যে আকাশস্তর তা একেবারে দূষণহীন, আর এর উপরে যে মহাশূন্য বা মহাকাশ তা অত্যন্ত নির্মল এবং নিখাদ। সত্যি বলতে কী, মহাকাশ নিয়ে আমাদের কোনও দুর্ভাবনাই ছিল না এতদিন, ছিল শুধু উত্তেজনা।

কারণ, নির্মল মহাকাশ তখন শুধু আমাদের মহাকাশযানের পরীক্ষাক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। একে-একে অভিযান চলছে চাঁদে, মঙ্গলগ্রহে, শুক্রে। পাল্লা দিয়ে পৃথিবীর দুই বৃহৎ শক্তি আমেরিকা আর রাশিয়া মহাকাশে একের পর এক পাঠাচ্ছে তাদের নানা মহাকাশযান।

ঠিক এই সময় ১৯৮৩ সালে প্রথম চমকে উঠলেন মহাকাশবিজ্ঞানীরা। স্পেস-শাটল চ্যালেঞ্জার মহাকাশ থেকে খবর পাঠাল একটুকরো পাথরের মতো কী এসে ঠোক্কর মেরে তাঁদের উইন্ডশিল্ডে গর্ত করে দিয়েছে। শাটল চ্যালেঞ্জারের কমান্ডার বব-ক্রিপেন উত্তেজিত গলায় জানালেন, চকিতে ছোট পাথরের মতো কী যেন সামনের গ্লাসে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গেল।

অবাক কাণ্ড! মহাকাশে পাথরের টুকরো আসবে কোথা থেকে! মহাকাশ অভিযাত্রীদের তোলা ছবি, নানা তথ্য থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চিন্তা-ভাবনা শুরু হল। শাটলশিপের ক্ষতিগ্রস্ত জায়গা পরীক্ষা করে দেখা গেল ৬৪০ মাইক্রোমিটার গভীর আর ৬৩০ মাইক্রোমিটার গোলাকার গর্ত হয়ে গেছে মহাকাশযানে। তা ছাড়া ওই গর্তের চারপাশে ১·৪ মিলিমিটার ব্যাস জুড়ে জায়গাটাও অনেকটা তুবড়ে গেছে। পরীক্ষায় দেখা গেল জমাট বাঁধা একটুকরো রং ছিটকে এসেই এই গর্ত করেছে।

বিজ্ঞানীরা আবার অবাক হলেন। আকাশে এমন ভাসমান রঙের টুকরোই বা এল কোথা থেকে? রঙের টুকরো নিয়ে চলল পরীক্ষা। দেখা গেল, ওই রঙের টুকরোয় রয়েছে টিটেনিয়াম অক্সাইড, কার্বন, অ্যালুমিনিয়ম, পটাশিয়াম, দস্তা। অর্থাৎ, সাদা রং তৈরি করতে যেসব উপাদান লাগে এগুলো হচ্ছে তাই। বিজ্ঞানীরা বুঝলেন, মহাকাশযানে যে সাদা রং লাগানো হয় এ হচ্ছে সেই রং যা কোনওভাবে মহাকাশযানের গা থেকে ছিটকে এসে চ্যালেঞ্জারের গায়ে লেগেছে। দেখা গেল ০·২ মিলিমিটারের এই রঙের ক্ষুদ্রকণা ৩ থেকে ৫ কিপ্‌স গতিতে ছিটকে এসে চ্যালেঞ্জারের ক্ষত তৈরি করেছে। বিজ্ঞানীরা এই প্রথম বুঝলেন, মহাকাশযান থেকে ক্ষুদ্রকণা মহাকাশে ছিটকে এসে তা কোনও সময় বিপর্যয় তৈরি করতে পারে। তবে তখনও মহাকাশবিজ্ঞানীরা ভাবছেন, এটা আসলে দুর্ঘটনাই।

কিন্তু ১৯৮৩ সালের শেষাশেষি স্যালুট ৭-এর কমান্ডার ভ্লাদিমির লেকভ এবং আলেকজান্ডার আলেকজেন্দ্রভ মহাকাশযান থেকে জানালেন, একটুকরো পাথরকণা জানালায় ছিটকে এসে জানালার কাচে ক্ষত সৃষ্টি করেছে।

এবার সত্যিই চিন্তিত হলেন মহাকাশবিজ্ঞানীরা। খবর গেল সব মহাকাশকেন্দ্রে, মহাকাশে এই ধরনের বিক্ষিপ্ত পদার্থকণার মুখোমুখি হলেই যেন মহাকাশযান বিভিন্ন মহাকাশকেন্দ্রেই খবর পাঠায়।

১৯৮৪ সালের চ্যালেঞ্জার মহাকাশচারী মহাকাশেই সোলার-ম্যাক্স স্যাটেলাইট সারানোর কাজ করলেন। মহাকাশে থেকে স্পেশশিপ সারানোর এই ধরনের প্রচেষ্টা সেই প্রথম। এর পর সেই মহাকাশচারী পৃথিবীতে ফিরে এলেন ১০ বর্গফুট অ্যালুমিনিয়ম লুভারের খোলের মধ্যে বসে যার ভিতরে ইনসুলেশন ব্ল্যাঙ্কেটের আচ্ছাদন ছিল। সেই খোল ৫০ মাস ধরে মহাশূন্য থেকে ভেসে ভেসে নেমে এল পৃথিবীতে। কিন্তু যখন মাটিতে সেই ধাতব খোল নামল, দেখা গেল তার গায়ে অজস্র গর্ত, আর সেই গর্তে ক্ষুদ্রাকার রঙের দানা আটকে রয়েছে।

মহাকাশবিজ্ঞানীরা এবার বুঝলেন, এই যে রঙের টুকরো নানা মহাকাশযান থেকে ছিটকে মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অন্য মহাকাশযানে আঘাত করছে, তা নেহাতই আকস্মিক ঘটনা নয়। এটা হচ্ছে, হবে। মহাকাশযানের রঙের ক্ষুদ্রাকার টুকরো মহাকাশে ঘুরছে—এ-বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ হলেন।

এবার শুরু হল মহাকাশে আর্বজনা জমছে কি না তা নিয়ে সত্যিকার ভাবনা-চিন্তা। অথচ একসময়ে মহাকাশে ভাসমান এই ধরনের আবর্জনা বলতে কিছুই ছিল না। ১৯৭২ সালে অ্যাপোলো ১৬EVA যখন মহাকাশে ঘুরছে তখন কাজ করতে-করতে মহাকাশচারী কেন ম্যাটিংলিসের হাত থেকে খুলে গেল বিয়ের আংটি। মহাকাশযানে ভেসে বেড়াতে লাগল সেই আংটি। ম্যাটিংলিসের সহযোগী মহাকাশচারী-বন্ধু ধরেও ফেললেন সেই আংটি। যদি ধরতে না পারতেন, তা হলে সেই আংটিই হত মহাকাশের প্রথম আবর্জক বস্তু আর সেটা শুরু হত ১৯৭২ সালে। কিন্তু তা হয়নি। মহাকাশে তখনও আর্বজনা দেখা যায়নি। মহাকাশ নির্মলই ছিল।

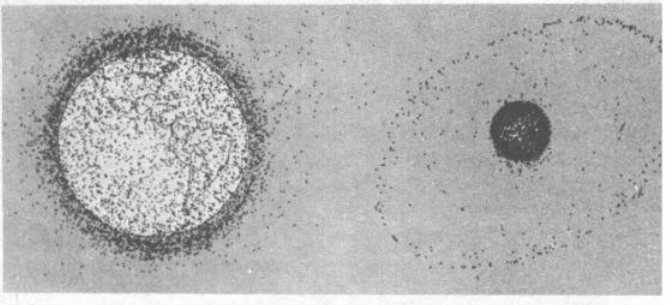

পৃথিবীর মধ্যাকাশের চারপাশে এবং মহাকাশের স্থির পরীক্ষাকেন্দ্রের চারধারে ক্ষুদ্রাকার আবর্জনাপুঞ্জের চেহারা। আমেরিকার পরীক্ষামন্দিরের ছবি

কিন্তু ৩১ মার্চ ১৯৮৮ সালে সমীক্ষায় মহাকাশবিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মহাকাশে ৫৩৮৮টি বড় ধরনের আবর্জনা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারই সঙ্গে ১৭৬২টি টুকরো স্পেস-ক্রাফটও ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ ছাড়াও ৩০,০০০ অজানা, অচেনা পদার্থ যার মাপ মার্বেল থেকে ফুটবলের মতো হবে তা মহাকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। এরা একের পর এক নানা মহাকাশযানের গায়ে ধাক্কা মারছে, ক্ষত সৃষ্টি করছে। এই ভাসমান আবর্জনা থেকে আগামীকালের মহাকাশযান দারুণভাবে দুর্ঘটনায় পড়বে কি না, এখন এরকম ভাবনাও শুরু হয়েছে।

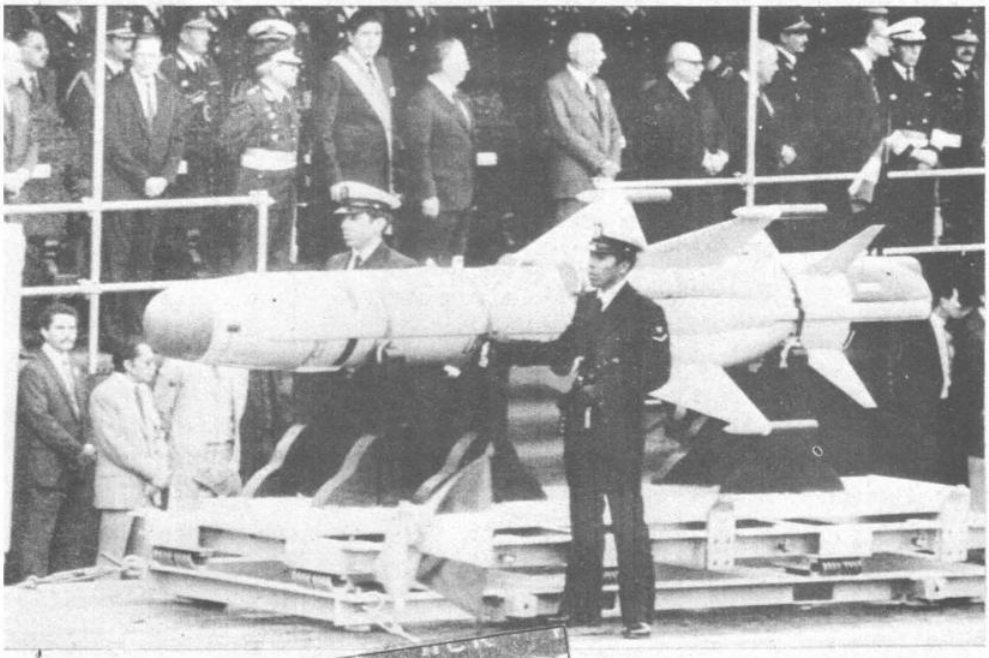

ক্রমাগত রকেট ক্ষেপণই মহাকাশে সবচেয়ে বেশি আবর্জনা সৃষ্টি করছে

কোন দেশের ক'টা মহাকাশযান থেকে কতটা আবর্জনা সৃষ্টি হয়েছে তার সমীক্ষা করেছেন টিম ফুরনিস এবং সেই সমীক্ষা বেরিয়েছে ৩১ মার্চ ১৯৮৮-তে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন রিপোর্টে। রিপোর্টে দেখা গেছে, কক্ষে ঘূর্ণায়মান মোট ৭১৫০টি বর্জ্যের মধ্যে শুধুমাত্র আমেরিকা ও রাশিয়ার মহাকাশযান-বর্জ্যই হচ্ছে ৬৪৪০টি, অর্থাৎ ৯০ শতাংশ। তেমনই মহাকাশে ভাসমান ১১,৯০১টি বর্জ্যের মধ্যে আমেরিকা-রাশিয়ার মহাকাশযান-সৃষ্ট ভাসমান আবর্জক হচ্ছে ১১,৬৬১টি, অর্থাৎ প্রায় ৯৮ শতাংশ। যদিও মহাকাশ-পরীক্ষায় চিন, জাপান, পশ্চিম জার্মানি, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ভারত সহ অন্যান্য ২১টি দেশও অল্পবিস্তর মহাকাশে বর্জ্যপদার্থ ছড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু মূল সমস্যা সৃষ্টি করছে আমেরিকা ও রাশিয়া। মহাকাশে এই যে বর্জ্য ছড়িয়ে পড়ছে, তারও রকমফের আছে।

মহাকাশবিজ্ঞানীরা পরীক্ষায় দেখেছেন, মহাকাশে তিন ধরনের বর্জ্য পদার্থের আবর্জনা জমছে। প্রথম হচ্ছে চলতি মহাকাশযান থেকে যে আবর্জনা তৈরি হচ্ছে, যেমন

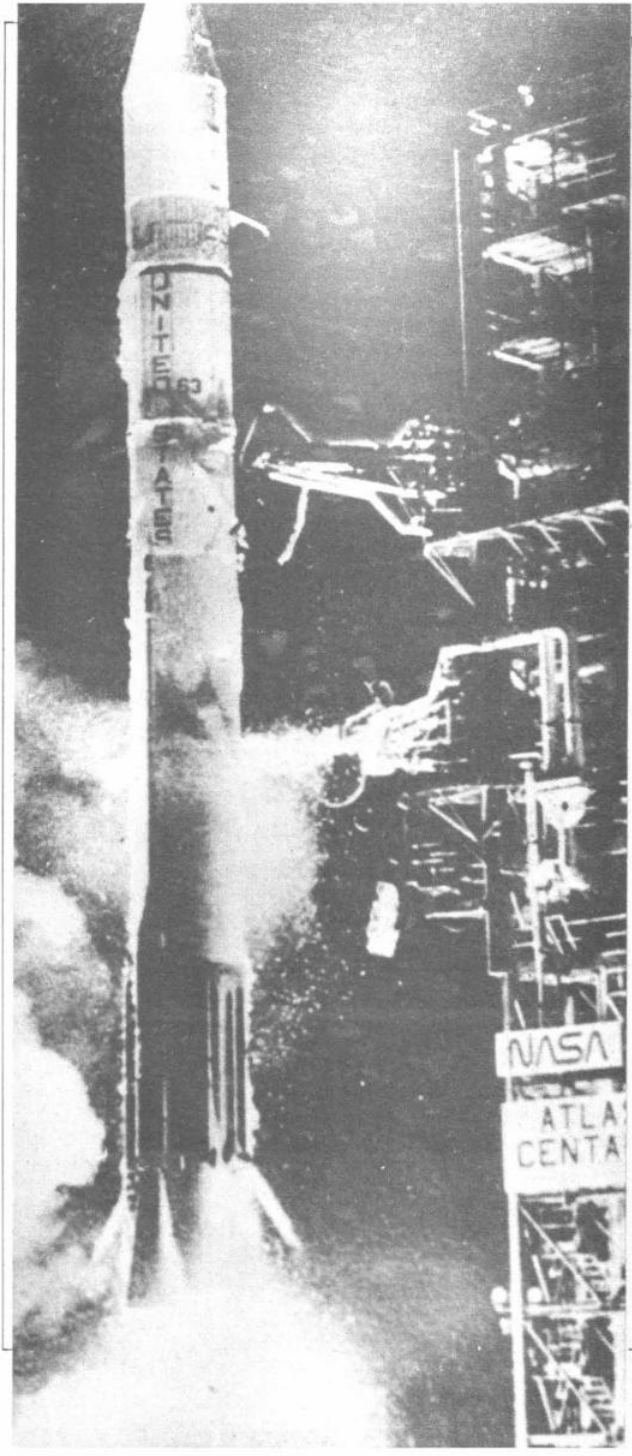

মহাকাশযানের রং ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোনও ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ বেরিয়ে যাচ্ছে এইসব। দ্বিতীয়ত, যেসব মহাকাশযান কর্মক্ষমতা হারিয়েছে তারা বর্জ-বস্তুরূপে আবর্জনা হয়ে মহাকাশে ঘুরছে। তৃতীয় ধরনের আবর্জনা হচ্ছে শাট্‌ল-খোলস বা পেলোড গ্রাডার, ক্ল্যাম্প ও মহাকাশযানের বিভিন্ন চলমান স্তরের ক্ষেপণকারী যন্ত্রাংশ এবং মহাকাশযানী ক্ষেপণ-মঞ্চ (স্টেজ)। উত্তর আমেরিকার এয়ার ডিফেন্স কম্যান্ড তাঁদের রাডারে ১০ সেন্টিমিটার মাপের এই ধরনের আবর্জনার হদিস পেয়েছে। নাসার গডার্ড স্পেসফ্লাইট সেন্টারের 'স্যাটেলাইট সিচুয়েশন রিপোর্ট'-এ এর বিস্তারিত মাপজোক, খবরাখবর আছে।

৩১ মার্চ ১৯৮৮-র রিপোর্টে দেখা গেছে ৭১৫০টি ঘূর্ণায়মান বর্জ্য পদার্থ মূলত আমাদের পৃথিবীর কক্ষপথেই ঘুরছে। এই ৭১৫০টি কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান বর্জ্য পদার্থের মোট ওজন ২০০০ টনের মতো। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে গেলে ভাবতে হবে আকাশ থেকে উলকা-পিণ্ড মাটিতে যখন ছিটকে আসে তখন কী বিরাট গর্ত হয়, কতখানি জায়গা পুড়ে জ্বলে যায়। সাধারণত এই উলকার ওজন ২৫০ কেজির মতো হয়, আর আসে ২০০ কিলোমিটার উঁচু থেকে। এর তুলনায় মহাকাশে বর্জ্য পদার্থের ওজন দু' হাজার টনের মতো, অর্থাৎ, উলকার চেয়ে আট হাজারগুণ বেশি, আর তা ঘুরছে হাজার-হাজার কিলোমিটার উঁচু পাঁচ কিপ্‌সের দুরন্ত গতিতে। এই ভারী ঘূর্ণায়মান বর্জ্য পদার্থ এত প্রচণ্ডবেগে মহাকাশে ঘোরে যার ফলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণক্ষেত্রের আকাশে নেমেও আসে না, মাধ্যাকর্ষণশক্তি টেনে নামাতেও পারে না।

মহাকাশে ঘূর্ণায়মান ৭১৫০টি বর্জ্য পদার্থ যেমন দেখা গেছে, তেমনই ভাসমান ১১,৯০১টি অন্য বর্জ্য পদার্থও আছে। এ ছাড়া আগেই বলা হয়েছে ৩০,০০০ মার্বেলাকৃতি পদার্থও ভেসে বেড়াচ্ছে। এরই সঙ্গে ক্ষুদ্রাকার রঙের চিলতে জাতীয় বর্জ্য পদার্থ দশ হাজার কোটি-কোটি অর্থাৎ ট্রিলিয়ন সংখ্যায় আছে, যেগুলো মহাকাশযানে দারুণ ক্ষতি করতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মহাকাশযান স্যালুট-৭ থেকে অব্যবহৃত যন্ত্রাংশ মহাকাশে ছিটকে আবর্জনা হয়ে ঘুরতে থাকে। মহাকাশবিজ্ঞানকেন্দ্রে সেই যন্ত্রাংশের চেহারা ধরা পড়েছে।

মহাকাশ-গবেষণার সময় কতভাবে যন্ত্রাংশ ভেঙে পরীক্ষা বিফল হচ্ছে সে-খবর আমরা জানি। কিন্তু সেই যন্ত্রাংশ যে আকাশে

আবর্জনা সৃষ্টি করছে সে-খবর আমাদের জানা নেই।

১৯৬১ সালে মহাকাশমঞ্চ (স্টেজ) ভাঙার খবর প্রথম আসে। মহাকাশযানকে ট্রানজিট-৪এ, অর্থাৎ চতুর্থস্তরী মহাকাশমঞ্চ থেকে যখন ছোঁড়া হয় তখন তা হঠাৎ ভেঙে ২৬৯টা টুকরো হয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। আজ ২৮ বছর পরেও মহাকাশে তারা মহাকাশ-আবর্জনা হয়ে ঘুরছে।

১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে এবিয়ানি তার তৃতীয়স্তর ক্ষেপণের সময় ভেঙে ৪৬০ টুকরো হয়ে যায়।

দেখা গেছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটেছে আমেরিকার মহাকাশযান ক্ষেপণের সময় এজিনা, ডেলটা এবং টাইটন ক্ষেপণস্তরে। নিকোলাস জনসন সমীক্ষায় দেখিয়েছেন, ১৯৭৩ সাল থেকে যতগুলো ক্ষেপণ-বিপর্যয় হয়েছে আমেরিকায় তার মধ্যে ৭টি ঘটেছে ডেলটা ক্ষেপণস্তরে এবং ১২৩০টি আবর্জনা ছড়িয়ে গিয়েছে মহাকাশে।

মহাকাশযানের প্রপেলার বা এঞ্জিনে গোলমালেও মহাকাশযানে এক্সপ্লোশন ঘটতে পারে। ডিসেম্বর ১৯৮২-তে কস্‌মস-১৪২৩-এ এমনটিই ঘটেছিল। এ ছাড়া মহাকাশে ভাসমান আবর্জনার সঙ্গে

> মহাকাশে ঘূর্ণায়মান ৭১৫০টি বর্জ্য পদার্থ যেমন দেখা গেছে, তেমনই ভাসমান ১১,৯০১টি অন্য বর্জ্য পদার্থও আছে। এ ছাড়া ৩০,০০০ মার্বেলাকৃতি পদার্থও ভেসে বেড়াচ্ছে। এরই সঙ্গে ক্ষুদ্রাকার রঙের চিলতে জাতীয় বর্জ্য পদার্থ দশ হাজার কোটি-কোটি অর্থাৎ ট্রিলিয়ন সংখ্যায় আছে, যেগুলো মহাকাশযানে দারুণ ক্ষতি করতে পারে।

ধাক্কা লেগেও মহাকাশযান ভেঙে যেতে পারে।

অ্যান্টি সাটেলাইট সিস্টেম দিয়ে এইসব অকেজো বা আবর্জক মহাকাশযানকে নষ্ট করা যায় কি না পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে সুফল তো পাওয়া যায়ইনি বরং এই পদ্ধতি নতুনতর আবর্জনা সৃষ্টি করেছে।

দেখা গেছে মহাকাশযানের সঙ্গে অন্য বস্তুর ধাক্কায় সবচেয়ে বেশি মহাকাশ-আবর্জনা তৈরি হয়েছে। ৩০০০ কেজি ওজনের স্যাটেলাইট যখন দুরন্ত গতিতে চলতে-চলতে একটুকরো আবর্জক-বস্তুর সঙ্গে ধাক্কা লাগায়, তখন ১০ গুণ আবর্জক তৈরি হয়।

পরীক্ষায় এটুকুই ধরা পড়েছে, সাধারণত মহাকাশ-আবর্জক পৃথিবীর কক্ষপথেই ঘুরছে। আর পৃথিবী থেকে, ২০০ কিলোমিটার থেকে ১০০০ কিলোমিটার মহাকাশস্তরেই তাদের দেখা যাচ্ছে। তবে কোনও আবর্জক যদি ২০০ কিলোমিটারের নীচে নেমে যায় তা হলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ফলে পৃথিবীর চলতি আকাশস্তরে দ্রুত নেমে আসে।

মহাকাশে এইসব আবর্জনা মহাকাশচারীদেরই প্রথম বিপদে ফেলছে। মহাশূন্যে যখন তাঁরা কাজ করছেন, তখন ভাসমান আবর্জকপিণ্ড তাঁদের গায়ে ধাক্কা মারছে।

পৃথিবী ছাড়িয়ে দূষণ আজ মহাকাশেও আঘাত হেনেছে। এ নিয়ে দ্রুত আইন-কানুন না হলে আগামী প্রজন্ম এ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে না। চাঁদের দেশে ভ্রমণের সুখস্বপ্ন তখন দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠবে।

আকাশে ওড়ার কথা □ নয়

ক্লেমঁ এডার

অনেকেই মনে করেন বাতাসের চেয়ে ভারী যন্ত্রকে আকাশে ওড়ানোর প্রথম কৃতিত্ব ফ্রান্সের টুলো শহরের এঞ্জিনিয়ার ক্লেমঁ এডারের। তাঁর মতে, ১৮৯০ সালে তাঁর বিমান 'ইয়োল' সফলতার সঙ্গে আকাশে ওড়ে। সম্ভবত ইয়োল মাটি থেকে সামান্য লাফিয়ে উঠেছিল। এই পরীক্ষায় উৎসাহিত হয়ে এডার তাঁর যথাসর্বস্ব দিয়ে ও ফরাসি সরকারের অর্থসাহায্যে এভিয়োঁ-৩ নামে এক বিমান তৈরি করলেন। ১৮৯৭ সালের ১৪ অক্টোবর সকালে সামরিক দফতরের কর্তাব্যক্তিরা জমা হয়েছেন এভিয়োঁ ৩-এর আকাশে ওড়া দেখতে। দুঃখের বিষয়, বিমানটি মাটি কামড়ে পড়ে রইল, তাকে এক গজও নড়ানো গেল না।

আসলে তার এঞ্জিনগুলি ছিল এত ভারী যে, বিমানটি সেই ওজন আকাশে তুলতে পারল না।

ক্লেমঁ এডারের পরীক্ষা ও পরিকল্পনা এখানেই শেষ। সামরিক বিভাগ আর তাঁকে কোনও সাহায্য করলেন না।

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

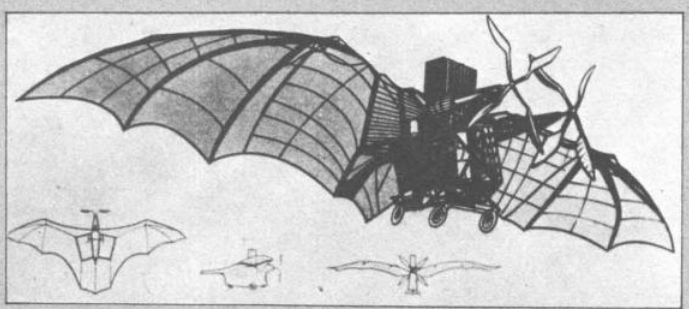

ক্লেমঁ এডারের বিমান

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

মাইকেল জ্যাকসন

জায়গাটার নাম গ্যারি, ইন্ডিয়ানা। শিকাগোর দক্ষিণে মধ্য আমেরিকার এক ধূসর শিল্পাঞ্চল। সময়টা আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে। সংসারটা জ্যাকসনদের। পিতা জো ক্রেন-ড্রাইভার। অবসর সময়ে গিটার বাজান। মা ক্যাথারিন কাজ করেন এক দোকানে। ভাল গানও করেন। জো এবং ক্যাথারিন তাঁদের ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করেন ও সংসার সামলান। ছয় ছেলে, তিন মেয়ে। ছেলেরা হল জ্যাকি, টিটো, জারমেইন, মারলন, র‍্যান্ডি ও মাইকেল। তিন বোন লাটায়া, জেনেট ও মরিন। জ্যাকসন-পরিবারের পঞ্চম ছেলে মাইকেলের জন্ম ১৯৫৮ সালের ২৯ অগস্ট।

জ্যাকসন-পরিবারের ছেলেমেয়েরা যে অন্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে আলাদা তা জো ও ক্যাথারিন জ্যাকসন জানতেন। এবং জানতেন যে, তাদেরও মধ্যে আলাদা মাইকেল। মাইকেলের মায়ের কথায়, "যখন ও খুব ছোট ছিল, তখনই ওর চলাফেরা, গান, নাচ ছিল বড়দের মতো। আমি পরজন্মে বিশ্বাস করি না, কিন্তু মাইকেলের হাবভাবে মনে হত ও বুঝি কোনও বয়স্ক ব্যক্তি।" এটা ১৯৬০ সালের ঘটনা।

একেবারে প্রথম দিকে পিতা জো'র গানবাজনার প্রতি ভালবাসার একমাত্র নিদর্শন সেই গিটার দিয়েই শুরু। প্রথমে দিদি মরিন, তারপর ভাই টিটো ও পরে দেখা গেল পরিবারের সবাই গানবাজনা করছে। অন্য ছেলেমেয়েরা যখন খেলাধুলো করত। জ্যাকসন-ভাইবোনেরা তখন মেতে থাকত বঙ্গ, গিটার ও ড্রাম নিয়ে। ক্রমে বাবা ও মায়ের সহযোগিতায় ও ছেলেমেয়েদের ইচ্ছার সঙ্গে তাল রেখে করা হল সেই গ্রুপ, যা আজও বিখ্যাত। মারলন, টিটো, মাইকেল, জ্যাকি ও জারমেইন জ্যাকসনকে নিয়ে তৈরি হল 'জ্যাকসন ফাইভ' গ্রুপ। সেটা ১৯৬৮ সাল। মাইকেল তখন গ্রুপের কোরিওগ্রাফার। গ্যারি, ইন্ডিয়ানায় গান গাওয়ার সুযোগ পেলেন জ্যাকসন ফাইভ। দারুণ গাইলেন পাঁচ খুদে গায়ক। হইচই পড়ে গেল চারদিকে। গায়িকা ডায়না রস প্রথমেই চিনে ফেললেন আসল প্রতিভাটিকে। বললেন, "অসাধারণ গ্রুপ। মাইকেলকে দেখে মনে হয় আমি বুঝি আমার ছেলেবেলার দিনগুলোকে স্বচক্ষে দেখছি। ভাবছিলাম, ও আমার ছেলে হলে কী ভালই না হত! তাই আমি ওদের গ্রুপটাকে আমার রেকর্ড কম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলাম।"

শুরু হল এক অধ্যায়। ১৯৬৯ সালে মোটাউন রেকর্ডের সঙ্গে চুক্তি হল জ্যাকসন ফাইভের। বেরোল রেকর্ড 'আই ওয়ান্ট ইউ ব্যাক'। গ্যারি শহর ছেড়ে লস অ্যাঞ্জেলিসের এনসিনোতে কুড়ি কামরার এক বাড়িতে উঠে গেলেন জ্যাকসনরা। সুইমিং পুল, বাস্কেটবল কোর্ট, আচারি রেঞ্জ, পুলরুম, রেকর্ডিং রুম—কী নেই তাতে। গ্যারি শহরের ছোট্ট দুই কামরার ফ্ল্যাটের থেকে কুড়ি কামরার অট্টালিকা। অনেকটা পথ। জ্যাকসনরা বলেন, "অনেকে মনে করেন, আমরা খুব তাড়াতাড়ি সাফল্য পেয়েছি। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। আমরাও দু' কামরার ফ্ল্যাটে থেকেছি, কোনওমতে একটা ভক্সওয়াগনে করে শো করতে গেছি, মাঝরাতে ফিরে, সকালে গেছি স্কুলে।"

১৯৭১ সালে পাকাপাকিভাবে মোটাউন রেকর্ডের সঙ্গে চুক্তি এবং 'আই ওয়ান্ট ইউ ব্যাক'-এর সাফল্যের পর 'এ বি সি', 'দা লাভ ইউ সেভ' ও 'আইল বি দেয়ার' রেকর্ডগুলি জ্যাকসন ফাইভকে এক অন্য জগতে নিয়ে যায়। সব মিলিয়ে দশ কোটি রেকর্ড বিক্রি হয় সেই সময়। সাফল্য আসে দুরন্ত গতিতে। নিজেদের নেট ওয়ার্কে টেলিভিশন স্পেশাল তৈরি করেন তাঁরা, কনসার্ট টুর করেন, তৈরি হয় তাঁদের নিয়ে অ্যানিমেটেড কার্টুন সিরিজ, বিশ্ববিখ্যাত 'লাইফ' ম্যাগাজিনে কভার স্টোরি হন তাঁরা। এসবের চেয়েও বড় কথা, এ বি সি সে-বছরে 'বেস্ট পপ সং অব দা ইয়ার' বিভাগে গ্র্যামি পুরস্কার পায়। অন্য ভাইদের চেয়ে মাইকেল যে অনেক বেশি প্রতিভাবান এই সত্যটা সকলেই মেনে নিয়েছেন তখন।

মোটাউনের সঙ্গে মাইকেলের সবচেয়ে বিখ্যাত সিঙ্গল হল, 'গট টু বি দেয়ার', 'রকিন্ রবিন্', 'আইওয়ানা বি হোয়্যার ইউ আর' এবং 'বেন'। মাইকেলের সফলতম সোলো অ্যালবামের মধ্যে, ১৯৭১ থেকে ১৯৭৬-এর ভেতরে মোটাউন রেকর্ড প্রকাশ করে যথাক্রমে 'গট টু বি দেয়ার', 'বেন', 'মিউজিক অ্যান্ড মি', 'ফর এভার মাইকেল' এবং 'দা বেস্ট অব মাইকেল জ্যাকসন'। মাইকেলের সর্বপ্রথম সোলো অ্যালবাম গট টু বি দেয়ার বের হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সারা বিশ্ব জেনে যায়, এক অসাধারণ গায়কের আবির্ভাবের কথা। রেকর্ডটি বিক্রি হয় প্রায় আশি লক্ষ কপি। জো ও ক্যাথারিন জ্যাকসনের পঞ্চম ছেলে যে জগদ্বিখ্যাত গায়ক হবেন, তখনই তা অনেকে বলেছিলেন। অভিনেত্রী জেন ফন্ডা বলেছেন, "মাইকেলের গান টাটকা, সতেজ, উদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক, যার সঙ্গে

মাইকেল জ্যাকসনের জীবন যেন আধুনিক রূপকথা। আমেরিকার অত্যন্ত সাধারণ বাড়ির ছেলে তিনি। মা-বাবার নয় সন্তানের মধ্যে তিনি সপ্তম। এখন তাঁর বয়স মাত্র ৩১। সঙ্গীতের জগতে এর অনেক আগে থেকেই তিনি কিংবদন্তি। আফ্রিকার খরাপীড়িত মানুষ কিংবা রোগক্লিষ্ট শিশুদের জন্য তিনি ব্যয় করেন স্বোপার্জিত অর্থের অনেকটাই। এই জন্যই তিনি সাধারণ মানুষের শিল্পী। তিনি বলেন, তাঁর সঙ্গীত ঈশ্বরের দান। আর বলেন তাঁর মায়ের কথা। মা ছেলেবেলায় পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তিনি ছেলেমেয়েদের যত্নের সঙ্গে মানুষ করেছিলেন। মায়ের মুখের গান অনুপ্রাণিত করেছিল জ্যাকসনকে। কিংবদন্তির এই নায়ককে নিয়ে এই প্রচ্ছদকাহিনী লিখেছেন **স্বপ্নাতীত সরকার**। এখন শোনা যাচ্ছে, জ্যাকসন নাকি বধির হয়ে যাচ্ছেন। যে জনগণের জন্য তিনি গান করেন, তাঁদের আশা জ্যাকসন সুস্থ হয়ে আবার তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবেন।

নাচা যায়, কাজ করা যায়, যা ভালবাসা যায় ও গাওয়া যায়। কিন্তু চুপচাপ বসে থাকা যায় না কিছুতেই।"

১৯৭২ সালে মাইকেলের সর্বপ্রথম সোলো অ্যালবাম থেকে তিনটি গান সে-বছরে 'টপ টেন চার্ট'-এ স্থান পায়। গানগুলি যথাক্রমে গট টু বি দেয়ার, রকিন্ রবিন্ ও আইওয়ানা বি হোয়্যার ইউ আর। তিনটি গানই দশ লক্ষ কপি বিক্রি হয়। মাইকেলের চতুর্থ সোলো গান বেন বিক্রি হয় কুড়ি লক্ষ কপি এবং সে-বছরের অকাদেমি পুরস্কারের বর্ষসেরা গান নির্বাচিত হয়। ১৯৭৪ ও ১৯৭৫-এ মোটাউন প্রকাশ করে যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম সোলো অ্যালবাম ফর এভার মাইকেল ও দা বেস্ট অব মাইকেল জ্যাকসন।

১৯৭৬ সালে মোটাউন রেকর্ডের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে যায় জ্যাকসনদের। অনেক চিন্তাভাবনার পর তাঁরা চুক্তি করেন 'সি বি এস' কম্পানির সঙ্গে। ততদিনে জ্যাকসনরা আর সেই ছোট্ট গ্যারি শহরের জ্যাকসন নেই, হয়ে গেছেন এক ধনী প্রভাবশালী পরিবার। অর্থ আসছে চতুর্দিক থেকে, সম্মানও আসছে একইভাবে। ইতিমধ্যে জ্যাকসন ফাইভ নামটা ছেড়ে দিয়ে জ্যাকসনরা শুধু দা জ্যাকসনস নাম নিয়েছেন, আর মাইকেল জ্যাকসন হয়েছেন ভাইদের মধ্যে সেরা। জ্যাকসনরা কখনও গাইছেন রানি এলিজাবেথের সামনে গ্লাসগোর কিংস হলে, কখনও বা নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত অ্যাপোলো থিয়েটারে।

১৯৭৬ সালে সি বি এসের সঙ্গে চুক্তি হওয়ার পর ওঁদের প্রথম অ্যালবাম 'দা জ্যাকসনস', এবং পরে ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে বেরোয় অ্যালবাম 'গোয়িন্ প্লেসেস্' ও 'ডেস্টিনি'।

এই সময় মাইকেল এল ফ্র্যাঙ্ক বম-এর ১৯০২ সালে লেখা ক্লাসিক 'দা ওয়ান্ডারফুল উইজার্ড অব ওজ'-এর ভাবালম্বনে চলচ্চিত্র 'দা উইজ'-এ অভিনয় করেন। হলিউডের ইতিহাসে অন্যতম ব্যয়বহুল ছবি দা উইজের বাজেট ছিল প্রায় তিন কোটি ডলার। ছবিটিতে অংশ নিয়েছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পেশাদারি অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কলাকুশলীরা যেমন লিনা হর্ন, ডায়না রস, রিচার্ড প্রায়র, সিডনি লুমেট, কুইন্সি জোন্স, নিপ্‌সি রাসেল এবং মাইকেল জ্যাকসন। সঙ্গীতজগৎ থেকে ছবিটিকে সাহায্য করেন বব্ জেমস, গ্র্যাডি টেট, র‍্যালফ ম্যাকডোনাল্ড, এরিক গেল, রিচার্ড টি, স্টিভ গ্যাড, রবার্ট ফ্ল্যাক, সিসি হাউস্টেন, লুথার ভ্যানড্রস, রে সিম্‌সন, উলান্দা ম্যাকোলগ, নিক অ্যাশফোর্ড ও ভ্যালারি সিম্‌সন। ছবিটি জনপ্রিয় হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হল না। তিন কোটি ডলারের দা উইজ বক্স অফিস সাফল্য পেল না। যদিও মাইকেল ছবিটিতে কাকতাড়ুয়ার ভূমিকায় অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন ও হলিউডে প্রচুর বন্ধু পান, তবুও দা উইজ মাইকেলের কাছে অন্য কারণে গুরুত্বপূর্ণ এক ঘটনা। ঘটনা, কারণ সেই প্রথমবার কুইন্সি জোন্সের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। লেখক, প্রযোজক, সঙ্গীতকার কুইন্সি জোন্সের সঙ্গেই মাইকেল পরবর্তীকালে অ্যালবাম 'অব দা ওয়াল'করে বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পপ গায়ক হন। পরে 'থ্রিলার' ও 'ব্যাড' তাঁকে যুগের শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে চিহ্নিত করে। ১৯৭৮ সালে মাইকেল ক্যালিফোর্নিয়া ছাড়েন ও নিউ ইয়র্কে চলে আসেন।

১৯৭৯ সালে মাইকেল জ্যাকসন তাঁর ভাইদের সঙ্গে বিশ্বভ্রমণে বেরোন এবং যথাক্রমে ব্রেমেন, মাদ্রিদ, আমস্টারডাম, জেনিভা, লন্ডন, ব্রাইটন, প্রেস্টন, শেফিল্ড, গ্লাসগো, ম্যাঞ্চেস্টার, বার্মিংহাম, হ্যালিফ্যাক্স, লিস্টা, কার্ডিফ, বর্নমাউথ, প্যারিস ও নাইরোবি শহরে প্রোগ্রাম করেন। সেই সময়, প্রায় চার বছর মাইকেলের কোনও সোলো অ্যালবাম বেরোয়নি। মাইকেল তাই এ-ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন। এই সম্বন্ধে মাইকেল বলেন, "আমি দেখাতে চাই যে আমি একা কিছু করতে পারি, কারও সাহায্য ছাড়া আমি একাই দায়িত্ব নিতে পারি কোনও কিছুর। আমার মনে হয়, সব কিশোর-কিশোরীই তাই চায়।" এই ধারণার ভিত্তিতেই মাইকেল জ্যাকসন ও কুইন্সি জোন্সের যুগ্ম প্রযোজনায় বেরোয় অ্যালবাম অব দা ওয়াল। এটা ১৯৭৯ সালের কথা। অব দা ওয়াল অ্যালবামটি আমেরিকায় বিক্রি হয় পঞ্চাশ লক্ষ কপি, এবং সারা বিশ্বে প্রায় আশি লক্ষ কপি। ১৯৮০-র জানুয়ারি মাসে দা আমেরিকান মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসের মধ্যে মাইকেল পান সোল ক্যাটিগরি, ফেভারিট মেল ভোকালিস্ট, ফেভারিট অ্যালবাম এবং ফেভারিট সিঙ্গল বিভাগে পুরস্কার।

'ডোন্ট স্টপ টিল ইউ গেট এনাফ' গানটির জন্য মাইকেল পান 'বেস্ট মেল আর এন্ড বি ভোকাল পারফরমেন্স' বিভাগে গ্র্যামি। রেকর্ডটি থেকে চার চারটি গান সে-বছর সেরা দশটি গানের তালিকায় স্থান পায়। ইংল্যান্ডে ট্রিপ্‌ল প্লাটিনাম, অস্ট্রেলিয়ায় সেভেন টাইমস প্লাটিনাম, কানাডায় ট্রিপ্‌ল প্লাটিনাম ও হল্যান্ডে গোল্ড সার্টিফিকেট অর্জন করেন মাইকেল। এরই মধ্যে জ্যাকসনদের দু'টি অ্যালবাম—ডেস্টিনি ও ট্রায়াম্প প্লাটিনাম ডিস্ক পায়।

১৯৮১ সালের গ্রীষ্মে মাইকেল ও তাঁর ভাইদের নিয়ে সারা আমেরিকায় ৩৯টি শহরে কনসার্ট টুর করেন। প্রায় ছ' লক্ষ লোক তাঁদের এই কনসার্ট দেখেন এবং সারা টুরে তাঁরা উপার্জন করেন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ ডলার। এই টুরের শেষে বেরোয় ডাবল অ্যালবাম 'দা জ্যাকসনস লাইভ'। নিউ ইয়র্কে ম্যাডিসন স্কোয়্যার গার্ডেনে জ্যাকসনদের গানবাজনার আসরে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্রজগতের নামী-দামি শিল্পী ক্যাথারিন হেপবার্ন, ক্যাথারিন হাওটেন, জেন ফন্ডা, স্টিভেন স্পিলবার্গ, ভিক্টোরিয়া প্রিন্সিপাল, কুইন্সি জোন্স, শের, টাটুম ও'নিল এবং আরও অনেকে। মাইকেলের জনপ্রিয়তা তখন আকাশছোঁয়া। এবং এই জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে সি বি এস কম্পানি এপিক রেকর্ডস নামে বারো বছরে জ্যাকসনদের শ্রেষ্ঠ গান দ্বারা সমৃদ্ধ দা জ্যাকসনস লাইভ ডাবল অ্যালবামটি বের করে। এর পরের যুগটা ছিল শুধুই মাইকেল জ্যাকসনের।

১৯৮২ সালে মাইকেল ডায়না রসের জন্য গান লিখলেন ও প্রযোজনা করলেন,'ই.টি.দা এক্সট্রা টেরিস্ট্রিয়াল'ছবিটির জন্য গাইলেন ও ছবিটির ভাষ্য দিলেন। 'থ্রিলার' অ্যালবামটিও সেবার বের হল। থ্রিলার এবং ই.টি.এই দু'টি অ্যালবামের ক্ষেত্রে মাইকেল সাহায্য পান কুইন্সি জোন্সের কাছ থেকে। কুইন্সি বলেন, মাইকেলকে তাঁর ভাল লাগার কারণ "মাইকেল এক সত্যান্বেষী যুবক, যার মধ্যে এক ষাট বছরের ব্যক্তির জ্ঞান ও একটি শিশুর চপলতা সমানভাবে আছে।" ই. টি. দা এক্সট্রা টেরিস্ট্রিয়াল ছবিটির পরিচালক স্টিভেন স্পিলবার্গের মতে, "ই.টি চরিত্রটি যদি কারও বাড়িতে আসে তবে সেটা হবে মাইকেলের।" ই. টি. ছবিটির গান রেকর্ড করার সময়ই মাইকেল ভালবেসে ফেলেন সেই বিখ্যাত মডেল ই. টি-কে।

ই.টি. ও স্টিভেনের মধ্যে মাইকেল খুঁজে পান দুই বন্ধুকে। থ্রিলার অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট দু'টিই মাইকেলকে আশির দশকের শ্রেষ্ঠ পপ গায়ক হিসেবে চিহ্নিত করে। সারা বিশ্বে ৩৭টি পুরস্কার পায় থ্রিলার। আমেরিকা ছাড়া আট-আটটি দেশে এক নম্বর অ্যালবাম হিসেবে স্থান পায়। সারা বিশ্বে প্রায় তিন কোটি অ্যালবাম বিক্রি হয়। কানাডায় ফোর টাইমস প্লাটিনাম, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড,

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে ট্রিপল প্লাটিনাম, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, সুইডেন, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, স্পেন ও গ্রিসে প্লাটিনাম, ডেনমার্ক, ইতালি ও ইজরায়েলে গোল্ড এবং নরওয়েতে সিলভার সার্টিফিকেট পায় থ্রিলার। অ্যালবামটিতে মাইকেলের গাওয়া গানগুলির মধ্যে ছিল 'বিট ইট', 'বিলি জিন', 'ওয়ানা বি স্টার্টিন্ সাম্থিন', 'দা গার্ল ইজ মাইন', 'হিউম্যান নেচার', 'বেবি কাম টু মি', 'পি ওয়াই টি', 'দা লেডি ইন মাই লাইফ', 'বেবি বি মাইন' এবং 'থ্রিলার'। এর মধ্যে পাঁচ-পাঁচটি গান, যথাক্রমে বিট ইট', বিলি জিন, ওয়ানা বি স্টার্টিন্ সাম্থিন, দা গার্ল ইজ মাইন ও হিউম্যান নেচার সে-বছরের সেরা দশটি গানের তালিকায় স্থান পায়।

এর পরেই মাইকেল তিন-তিনটি ভিডিও ক্যাসেট বের করেন। স্টিভ ব্যারন-এর নির্দেশনায় বিলি জিন, বব জিরাল্ডির নির্দেশনায় বিট ইট এবং জন ল্যান্ডিস-এর নির্দেশনায় থ্রিলার। পরে ১৯৮৪ সালে আটটি গ্র্যামি পুরস্কার পায় মাইকেল ও থ্রিলার অ্যালবামটি। এবং ই·টি· দা এক্সট্রা টেরিস্ট্রিয়াল ছবিটির গানের জন্য পান বেস্ট চিলড্রেন্স রেকর্ডিং বিভাগে গ্র্যামি।

১৯৮৩ সালে মাইকেল তাঁর বন্ধু পল্ ম্যাককার্টনির সঙ্গে 'সে, সে, সে' গানটি রেকর্ড করেন। বব জিরাল্ডির নির্দেশনায় ভিডিওতেও রেকর্ড করা হয় ওই গান। ততদিনে মাইকেল জ্যাকসনের নাম নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে সারা বিশ্বে। এই সময়ই মাইকেলের জনপ্রিয়তাকে আর-এক ধাপ এগনোর জন্য ডাক পড়ল বিখ্যাত বক্সিং প্রোমোটার ডন কিং-এর। ডন কিংয়ের ব্যবস্থাপনায় প্রায় পাঁচ বছর পর জ্যাকসন ভাইরা আবার একসঙ্গে গান গাইবার সুযোগ পেলেন। ৩০টি কনসার্টের চুক্তি হল। ঠিক হল কনসার্টগুলি হবে প্রথমে আমেরিকায়, পরে সারা বিশ্বের বিভিন্ন শহরে। চুক্তিতে ঠিক হল, সমস্ত আয়ের পনেরো শতাংশ পাবেন কিং, এবং ৮৫ শতাংশ পাবেন জ্যাকসনরা। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বৃহৎ কনসার্ট সফরের নাম দেওয়া হল 'ভিকট্রি টুর'। কিন্তু সেই সফর শুধু আমেরিকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং ডন কিংকেও মাঝপথে চুক্তি থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। এ সম্পর্কে ডন কিং বলেন, "মাইকেলের সঙ্গে থাকা মানেই সবসময় পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া। সে যে রাজ্যের রাজা সেখানে কোনও ভুল করা চলে না।"

১৯৮৪ সালটা মাইকেলের জীবনে ঘটনাবহুল। ওই বছরে জানুয়ারি মাসে পাঁচ কোটি ডলার ব্যয়ে তৈরি বিখ্যাত পেপসি কোলা অ্যাড কমার্শিয়ালের শুটিং-এর সময় ঘটে সেই দুর্ঘটনা। বব জিরাল্ডির নির্দেশনায় হলিউডের বারব্যাঙ্ক স্টুডিওয় শুটিংয়ের সময় হঠাৎ এক বাজির আগুনে মাইকেল পুড়ে যান। যদিও মাইকেলের দেহে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডিগ্রির পোড়া ক্ষত ছিল, তবুও মাইকেল সুস্থ হতে সময় নিয়েছিলেন খুবই কম। সারা আমেরিকায় হইচই পড়ে যায় এই দুর্ঘটনায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন মাইকেলকে চিঠি লিখে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। এই চিঠিতেই প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন লেখেন, কোটি – কোটি বিশ্ববাসীর মতোই তিনি ও তাঁর স্ত্রী ন্যান্সি মাইকেলের গুণমুগ্ধ ভক্ত।

শিপলবার্গ-এর ই.টি-র সঙ্গে

মাইকেলের সর্বপ্রথম সোলো অ্যালবাম 'গট টু বি দেয়ার' বের হওয়ার পর বিশ্ব জেনে যায় এক অসাধারণ গায়কের আবির্ভাবের কথা। রেকর্ডটি বিক্রি হয় প্রায় আশি লক্ষ কপি। জো ও ক্যাথারিন জ্যাকসনের পঞ্চম ছেলে যে জগদ্বিখ্যাত গায়ক হবেন, তখনই তা অনেকে বলেছিলেন। অভিনেত্রী জেন ফন্ডা বলেছেন, "মাইকেলের গান টাটকা, সতেজ, উদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক, যার সঙ্গে নাচা যায়, কাজ করা যায়, যা ভালবাসা যায় ও গাওয়া যায়। কিন্তু চুপচাপ বসে থাকা যায় না কিছুতেই।

জ্যাকসন ফাইভ

১৯৮৪-র ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ নাম ওঠে মাইকেলের, তাঁর সবচেয়ে বেশি অ্যালবাম বিক্রি হওয়ার জন্য। তখন পর্যন্ত থ্রিলার অ্যালবামটি বিক্রি হয় প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ কপি। পরে অবশ্য এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪ কোটির কাছাকাছি।

ওই বছরেই মাইকেল ডিজনিল্যান্ড ভ্রমণে যান এবং মুগ্ধ হন ওখানকার পরিবেশ দেখে। পরে ডিজনিল্যান্ডের মতো সাজান তাঁর বাড়িটিকে, 'পাইরেটস অব দা ক্যারাবিয়ান' পুতুলগুলি দিয়ে। এর পরে একে একে মাথায় অস্ত্রোপচার, প্রেসিডেন্ট রেগনের পুরস্কার, ভিকট্রি টুর ও গ্র্যামি পুরস্কার ১৯৮৪ সালে মাইকেলের জীবনে বড় ঘটনা।

এর পরে ডিজনি স্টুডিওর অনুরোধে মাইকেল জর্জ লুকাস ও ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা'র সাহায্যে তৈরি করেন ত্রিমাত্রিক চলচ্চিত্র 'ক্যাপ্টেন ইও'। গল্পটির বিষয়বস্তু একটি ভিন্ন গ্রহ ও তার দুষ্ট রানিকে নিয়ে। এই ছবিটি সম্পর্কে মাইকেল বলেন, "আমি চেয়েছিলাম এই ছবির মধ্য দিয়ে দর্শকদের এক সুন্দর জায়গায় নিয়ে যেতে, যেখানে সত্যের জয় এবং মিথ্যার মৃত্যু হয়, যেখানে গিয়ে মানুষ ভুলতে পারে তাদের চাপ, তাপ ও দৈনন্দিন দুঃখের কথা।"

১৯৮৫ সালে আফ্রিকার অনাহারক্লিষ্ট ছেলেমেয়েদের জন্য মাইকেল লাওনেল রিচির সঙ্গে লেখেন 'উই আর দা ওয়ার্ল্ড' গানটি। পরে সারা বিশ্বের নামী-দামি গায়করা রেকর্ড করেন গানটি।

মাইকেলের মতে, "উই আর দা ওয়ার্ল্ড গানটি একটি আধ্যাত্মিক সঙ্গীত। আমি যখন গানটি শুনি তখন মনে হয় আফ্রিকার ক্ষুধার্ত শিশুদের কান্না ভেসে আসছে। এই সঙ্গীতটির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের সবারই গর্বিত হওয়া উচিত। কারণ গানটি আফ্রিকার ক্ষুধা ও হাহাকার, দুঃখ ও হতাশাকে ব্যক্ত করে।"

১৯৮৫ সালে উই আর দা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করার পর বেশ কিছুদিন মাইকেলকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি। প্রায় আড়াই বছর পর, ১৯৮৭ সাল নাগাদ বেরোয় কুইন্সি জোন্সের সঙ্গে মাইকেলের অ্যালবাম 'ব্যাড'। সেই সুবাদে আবার আকাশছোঁয়া হয়ে ওঠে তাঁর জনপ্রিয়তা। 'ব্যাড', 'ম্যান ইন দা মিরর', 'কান্ট স্টপ লাভিং ইউ', 'অ্যানাদার পার্ট অব মি', 'স্পিড ডেমন', 'দা ওয়ে ইউ মেক মি ফিল', 'স্মুথ ক্রিমিনাল', 'লিভ মি অ্যালোন', 'জাস্ট গুড ফ্রেন্ডস' গানগুলির মধ্যে ম্যান ইন দা মিরার ও জাস্ট গুড ফ্রেন্ডস গান ছাড়া সব কটিই মাইকেলের লেখা। ব্যাড অ্যালবামটি রেকর্ড করতে এত সময় লাগার কারণ হিসেবে মাইকেল বলেন, "কুইন্সি এবং আমি চেয়েছিলাম অ্যালবামটি যেন একশোভাগ নিখুঁত হয়। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো যেমন সিস্টিন চ্যাপেলের সিলিং রং করতে গিয়ে একবার তাঁর গোটা কাজটি মুছে নষ্ট করেন, তেমনই আমি এবং কুইন্সি বারবার চেষ্টা করি নিখুঁত হওয়ার জন্য। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো এইজন্য আমায় উদ্বুদ্ধ করেন।"

এ তো গেল মাইকেল জ্যাকসনের বর্ণময় জীবনকাহিনীর উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী। কিন্তু মাইকেল-ব্যক্তিত্বটি কেমন ? নয় ভাইবোনের মধ্যে সপ্তম, মধ্যবিত্ত পরিবারের এক কৃষ্ণাঙ্গ কিশোর কী করে সারা বিশ্ব জয় করলেন ? সবার ধারণা, মাইকেলের সাফল্যের পেছনে প্রধান চাবিকাঠি তাঁর সততা ও উদারতা। ডায়না রস, জ্যাকলিন কেনেডি ওনাসিস, স্টিফেন স্পিলবার্গ থেকে শুরু করে রোনাল্ড রেগন যাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত, তিনি কি শুধুই এক পপ-গায়ক ? আসলে মাইকেল জ্যাকসন এক বর্ণময় ব্যক্তিত্ব। তিনি যেমন ভালবাসেন নিষ্প্রাণ প্লাস্টিক মডেল 'ই.টি.'কে, তেমনই ভালবাসেন প্রাণচঞ্চল শিশুদের। তাঁর কাছে বয়সের গণ্ডি কোনও গণ্ডিই নয়। শিশুরা যেমন ভালবাসে তাঁকে, তেমনই তাঁকে ভালবাসেন বয়স্করাও। সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ কিশোর-কিশোরী যাঁর কণ্ঠস্বর শোনার জন্য ও নাচ দেখার জন্য ব্যাকুল, সাফল্যের প্রতি সেই মাইকেলের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই দার্শনিক।

মাইকেলকে যাঁরা অনেকদিন ধরে কাছ থেকে দেখছেন তাঁরা সবাই একমত যে, অর্থ ও প্রতিপত্তি তাঁর মনের চিরন্তন কৈশোরকে বদলাতে পারেনি। মাইকেল জ্যাকসনের যেমন ভাল লাগে তাঁর ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়ির জন্তু-জানোয়ারদের নিয়ে খেলতে, তেমনই ভাল লাগে কোনও কঠিন গান রেকর্ড করতে। সাফল্যের সঙ্গে বিতর্ক আসতে বাধ্য। এসেছে মাইকেলের জীবনেও। তাঁর নারীসুলভ কণ্ঠ ও প্লাস্টিক সার্জারি করে মুখ পালটানোর অভিযোগগুলির তিনি স্থিরভাবে মোকাবিলা করেছেন। মাইকেলের বিদ্বেষ নেই। তবে মিথ্যাকে তিনি ঘৃণা করেন। তাঁর এখনও মনে আছে হাসপাতালে থাকার দিনগুলির কথা। কত কষ্ট তিনি পেয়েছিলেন। মাইকেলের মনে পড়ে যায় আফ্রিকার অভুক্ত শিশুদের কথা। কত কষ্ট তারা পাচ্ছে। তাই মাইকেল একাধারে যেমন হাসপাতালের শিশু রোগীদের জন্য সাহায্য করেন, তেমনই লেখেন আফ্রিকার সাধারণ মানুষদের জন্য গান। হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা তাঁকে সমানভাবে ছুঁয়ে যায়। মাইকেল কখনও মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার, কখনও আবার সামাজিক ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে। টাইট জিন্স, চোখে কালো চশমা, সাদা মোজা, একহাতে সাদা দস্তানা ও চুলে স্প্রে করা ছিপছিপে এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের জন্য কেন সবাই পাগল ? এর কারণ একটাই। পাশ্চাত্য গানের জগতে, এমনকী নাচের জগতেও হয়তো আর কোনওদিন আসবেন না তাঁর মতো এক ব্যক্তিত্ব। এক চিরন্তন শিশু। মাইকেলের প্রিয় বই জে. এম. ব্যারির ক্ল্যাসিক 'পিটারপ্যান'। সেই বইয়ের প্রথম লাইনটি এইরকম, "সব শিশুই বেড়ে ওঠে, একজন ছাড়া।" সবাই জানে, সেই শিশুটি মাইকেল জ্যাকসন।

বাবা জো জ্যাকসন

মা ক্যাথারিন

সারা পৃথিবী জুড়ে কেন মাইকেলের জয়গান

গৌতম চক্রবর্তী

আলো নিভতে - না - নিভতেই স্টেডিয়ামের স্পিকার থেকে আচমকা উচ্চকিত শব্দ : মা-কে-রু ! মা-কে-রু !

প্রথমটায় বিস্মিত ও হতবাক হয়ে গেলেও পরক্ষণেই টোকিও'র গোটা কারাকুয়েন বেসবল স্টেডিয়াম ভেঙে পড়ল তুমুল হর্ষধ্বনি ও হাততালিতে। আসছেন মাইকেল। মাইকেল জ্যাকসন ! মঞ্চে ওঠার আগেই তিনি সুকৌশলে বুঝিয়ে দিলেন সঙ্গীতের কোনও দেশ নেই, ধর্ম নেই, জাতিভেদ নেই। তাই সারা স্টেডিয়ামে এখন একটাই জাপানি শব্দ : মা-কে-রু ! মা-কে-রু ! মাইকেলের জাপানি নাম।

স্টেডিয়ামের মঞ্চে এখন সুচ পড়লেও তার শব্দ শোনা যাবে। গোটা মঞ্চ জুড়ে লুকিয়ে আছে ১০০টা স্পিকার, ৭০০টা

স্টিভি ওয়ান্ডার, প্রিন্স, মিক জ্যাগার কিংবা রড স্টুয়ার্ট অনেক বিখ্যাত গায়ক। তাঁরা পপ সঙ্গীতের পৃথিবীতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিরাজমান। কিন্তু মাইকেল জ্যাকসনের মতো পৃথিবীব্যাপী আত্মীয়তা তাঁদের কারও নেই।

লাইট, দুটো ২৪/১৮ ফুট পরদা। রয়েছে তিনটে লেসার-বিম, সেগুলি বিভিন্ন দিকে প্রতিফলিত করার জন্য মোট ৪০খানি আয়না। আলোর যান্ত্রিক 'স্পেশাল এফেক্টকে যথাযথ রূপ দেওয়ার জন্য উইংস-এর কোণে দু'জন ইল্যুশনিস্ট বসে আছেন। একটু বাদেই জ্যাকসন মঞ্চে এসে বিদ্যুৎগতিতে দু' পা পিছিয়ে যাবেন, তারপর কোমরটাকে আলতো করে বাতাসে ছেড়ে এগিয়ে আসবেন। শুরু হবে তাঁর বিখ্যাত 'মুনওয়াকিং ডান্স'। আর, 'থ্রিলার', 'ব্যাড'-এর সেই গানগুলি তো আছেই !

মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছেন মাইকেল। পরনে টক্সেডো ধরনের আঁটো ট্রাউজার্স, পায়ে সেই বিখ্যাত সাদা মোজা ও হাতে সেই বিখ্যাত উজ্জ্বল সাদা দস্তানা। বিদ্যুৎগতি নাচের ছন্দে তাল রাখার জন্য পায়ে প্ল্যাটফর্ম শু। সমস্ত পোশাকে চুমকির মতো বসানো রয়েছে ফাইবার-অপটিক আলো। বাস গিটার আর কঙ্গোর তালে তাল মিলিয়ে মাইকেল নিশ্চয় এখন মাতিয়ে তুলবেন গোটা স্টেডিয়াম।

দর্শকদের উদ্দেশ্য করে, মুনওয়াকিং-এর তালে তিনি নিশ্চয় গাইবেন 'শেক ইওর বডি ডাউন টু দা গ্রাউন্ড !'

না, মুনওয়াকিং ডান্স বা গান কোনওটাই মাইকেল শুরু করলেন না। আস্তে-আস্তে তিনি মাইক্রোফোনটা হাতে তুলে নিলেন, তারপর বিষাদমথিত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "দা প্রোগ্রাম অব টু-নাইট ইজ ডেডিকেটেড টু দা মেমারি অব ইয়োশিয়োকি ওগিয়ারা !"

একটা স্বপ্নের জগৎ থেকে গোটা কারাকুয়েন স্টেডিয়াম হঠাৎ ফিরে এল রূঢ় বাস্তবে। মাইকেল চিনতেন ইয়োশিয়োকিকে ? কোন সূত্রে ওঁদের পরিচয় ?

না, ইয়োশিয়োকি ওগিয়ারাকে মাইকেল কোনওদিন দেখেননি। কিন্তু খবরটা তাঁর চোখে পড়েছিল। সারা জাপান তখন উত্তাল সেই খবর নিয়ে। টোকিও'র তাকাসাকি শহরতলিতে বাড়ি থেকে অপহৃত হয়েছিল বালক ইয়োশিয়োকি। দু' দিন পরে এক সেতুর নীচে পাওয়া যায় তার বিকৃত, থ্যাঁতলানো মৃতদেহ। দুর্বৃত্তরা তখনও ধরা পড়েনি।

এটাই মাইকেলের বৈশিষ্ট্য। স্টিভি ওয়ান্ডার, প্রিন্স, মিক জ্যাগার কিংবা রড স্টুয়ার্ট অনেক বিখ্যাত গায়ক। তাঁরা পপ সঙ্গীতের পৃথিবীতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিরাজমান। কিন্তু মাইকেল জ্যাকসনের মতো পৃথিবীব্যাপী আত্মীয়তা তাঁদের কারও নেই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মাইকেল পৃথিবীর সব শিশু, বালক-বালিকার বন্ধু। ব্রুক শিল্ডস, ট্যাটুম ও'নিল, লিন্ডা ব্লেয়ার কিংবা জুডি ফস্টার-এর মতো তিনিও বালক বয়স থেকেই 'শো-বিজ-ওয়ার্ল্ড'-এর স্টার। কিন্তু, আজ একত্রিশ বছরেও শৈশব তাঁকে ছেড়ে যায়নি। নিজের বাড়ির প্রেক্ষাগৃহে বসে তিনি 'ই.টি.' দেখেছেন সবসুদ্ধ পঁয়ত্রিশবার, অদ্ভুতদর্শন ই.টি. আর বালক এলিয়ট নাকি তাঁর প্রিয় বন্ধু ! না, স্টিভেন স্পিলবার্গ তাঁর সম্বন্ধে ঠিক কথাই বলেছেন, 'মাইকেল ইজ ওয়ান অব দা লাস্ট লিভিং ইনোসেন্টস।' পৃথিবীর শেষতম, জীবিত, নিষ্পাপ মানুষদের একজন হলেন মাইকেল জ্যাকসন।

নিউ হ্যাম্পশায়ারের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাতে-চালাতে প্রায় একই কথা বলেছিলেন জেন ফন্ডা। 'অন গোল্ডেন পন্ড' ছবির শুটিং দেখতে জেন নিমন্ত্রণ করেছিলেন মাইকেলকে। হেনরি ফন্ডা ও ক্যাথরিন হেপবার্ন-এর সঙ্গে সেখানেই মাইকেলের প্রথম পরিচয় ও বন্ধুত্ব।

নিউ হ্যাম্পশায়ারের রাস্তার ধারে সার-সার মেপ্‌ল, লামবাইন আর কারনেশন-এর সম্ভার। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সারি-সারি পাইন আর স্প্রুস গাছ। হাসতে হাসতে জেন বলেছিলেন, মাইকেলকে নিয়ে তিনি ছবি প্রযোজনা করবেন। পিটার প্যানকে নিয়ে ছবি। যে বালক কোনওদিন বড় হয়নি, সেই পিটার প্যান !

হতচকিত মাইকেল আচমকা কেঁদে উঠেছিলেন। তারপর জেনকে বিস্মিত করে জানিয়েছিলেন, পিটার প্যান-ই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় চরিত্র। তাঁর ঘরের দেওয়ালে পিটার প্যানের প্রচুর ছবি।

জে.এম.ব্যারি-র পিটার প্যান গল্পের প্রথম লাইনটাই ছিল 'অল চিলড্রেন, এক্সেপ্ট ওয়ান, গ্রো আপ !' একজন ছাড়া অন্য সব শিশুই বড় হয়। মাইকেলের চোখের সামনে এখন রক্তিম কারনেশন আর বেগুনি লামবাইন আস্তে-আস্তে ঝাপসা হতে শুরু করেছে। বাতাসে হিম-হিম ভাব। ক্যালমুট নদী থেকে এরকমই ভিজে বাতাস ভেসে আসত, শহরের আকাশ লাল হয়ে থাকত গলানো ইস্পাত আর ক্রোমিয়ামের গন্ধে। সার-সার ইস্পাত আর লোহা গলানোর কারখানা। ভারী ট্রাকগুলি রাস্তা দিয়ে একের পর এক ছুটে যেত তাদের গন্তব্যে··· শিকাগো, মিলওয়াকি, ডেইটন, সিনসিনাটি ! ইন্ডিয়ানা আর ইলিয়নিয়স রাজ্যের সীমান্তে ছোট্ট শহর গ্যারি। ওখানেই কেটেছিল মাইকেলের শৈশব। কৈশোরে পা দিতে-না-দিতেই তিনি স্টার।

···অল চিলড্রেন এক্সেপ্ট ওয়ান গ্রো আপ !

॥ ২ ॥

ঘর্মাক্ত শরীরে, বাড়ি ফিরেই চমকে গিয়েছিলেন জো জ্যাকসন। টিটো গিটার বাজাচ্ছে, জ্যাকি, জারমেন আর মার্লোন গান গাইছে। রে চার্লস্-এর পুরনো দিনের গান। কিশোর বয়সে, জো জ্যাকসন নিজেও গিটার বাজাতেন, 'ফ্যালকন' নামে একটি গানের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখন ইস্পাত কারখানার ক্রেনচালক হয়ে সেই সঙ্গীতচর্চার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই, উদয়াস্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রমেই দিন ফুরিয়ে যায়।

তবু, এককালের গিটার ছাড়তে পারেননি। অদম্য ভালবাসায় আলতো করে তাকে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন দেওয়ালের গায়ে। ···টিটোর হাতে সেই গিটার ! বকুনি দিতে গিয়েও থমকে গেলেন জো ! গম্ভীর গলায় টিটোকে বললেন, "দেখি, কেমন বাজাও !"

কাঁপা কাঁপা হাতে টিটো আঙুল বাড়িয়ে দিল গিটারের তারের দিকে। এক, দুই, তিন··· ছোট্ট আঙুল আর তারে বেজে উঠল 'কটন ফিল্ডস ব্যাক হোম'··· টিটোর আজ নিস্তার নেই ! বাবার হাতে চড়চাপড় খেতেই হবে !

না, সামান্য ক্রেনচালক হয়েও জো প্রতিভা চিনতে ভুল করেননি ! কয়েক মাস বাদে স্ত্রী ক্যাথারিনকে ডেকে বললেন, "ক্যাথি, চাকরিটা ছেড়ে দিলাম।"

ক্যাথারিন হতবাক ! আস্তে-আস্তে জো জানালেন, টিটো, জারমেইন, মার্লোনদের মধ্যে তিনি দেখেছেন অদ্ভুত এক স্ফুলিঙ্গ ! চাকরি নয়, সেই স্ফুলিঙ্গকে দাবানলের মতো দাউদাউ করে জ্বালিয়ে তোলাই আজ থেকে তাঁর লক্ষ্য ! টিটো, কাম অন !

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে অন্য ছেলেরা কাচের শার্শিতে ঢিল ছুঁড়ত। তাদের মতে, জ্যাকসন-পরিবার পাগল হয়ে গেছে।

পরিবারের পাঁচ বছরের কনিষ্ঠতম সদস্য মাইকেল সিঁড়িতে বসে প্রথম-প্রথম কঙ্গো বাজাত, তারপর দাদাদের নকল করে গান গাইত। ক্যাথারিন আদরের সঙ্গে মাইকেলের গাল টিপে জোকে বলেছিলেন, "আর একজন নতুন লিড-সিঙ্গার পাওয়া গেল।"

জ্যাকি, জারমেইন দাদারা ভাইয়ের অঙ্গভঙ্গি দেখে মজা পেত। হাসতেই হাসতেই জ্যাকি বলেছিল, "হাই মাইকেল, ইউ বি দা লিড গাই !"

···জ্যাকি জানত না, পপ-সঙ্গীতের আকাশে সেদিন আচমকা একটি সুপারনোভা নক্ষত্র জন্ম নিল !

॥ ৩ ॥

সুপারনোভার মতোই জ্যোতি বিচ্ছুরণ শুরু করেছিল মাইকেল। ১৯৬৬-তে মাইকেলের বয়স মাত্র সাত। গ্যারি শহরের রুজভেল্ট হাই স্কুলের ট্যালেন্ট শো'তে জ্যাকসন-পরিবার গেয়েছিল টেম্পটেশন্স-রক গ্রুপের তদানীন্তন সুপার-হিট গান 'মাই গার্ল'। লিড-সিঙ্গার মাইকেল। সেখানেই তাঁর জীবনের প্রথম পুরস্কার।

একটা ভক্সওয়াগন ভ্যান নিয়ে সপ্তাহান্তে বেরিয়ে পড়ত জ্যাকসন-পরিবার। গান গাইত গ্যারি শহরেই, মিঃ লুকির ক্লাবে, হোটেলে। গান আর গান। ফিলাডেলফিয়ার আপটাউন থিয়েটার, ওয়াশিংটনের হাওয়ার্ড থিয়েটার, নিউ ইয়র্কের অ্যাপোলো থিয়েটার— সর্বত্র এই বিস্ময়-বালকদের দেখার জন্য ভিড়! নাচতে-নাচতে সামনের দিকে লিড-সিঙ্গার হিসেবে থাকত মাইকেল, পিছনে লিড দিত জারমেইন। নিজেদের অনুষ্ঠান

শেষ হয়ে গেলেও উইংসের ধারে বসে মাইকেল দেখত গ্ল্যাডিস নাইটের নাচ, শুনত জেম্‌স ব্রাউন-এর গান ! ভাবত, "এই তাল, লয়, ছন্দ কোনওটাই কি আমি নিতে পারব না ? কেন ? মঞ্চের ওপরেই তো আমি জীবনের সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ অনুভব করি।"

১৯৬৮-তে মাইকেলের বয়স মাত্র নয়। গ্যারি শহরে একটি স্থানীয় নিগ্রো-সংগঠন আছে, তার নাম 'মুইণ্ডইঘানিয়া'। সেই সংগঠনের প্রধান রিচার্ড হ্যাচার তাঁর বাড়ির এক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করেছিলেন জ্যাকসন ভাইদের। জ্যাকসন-ভাইরা ছাড়াও সেখানে ছিলেন মেরি উইলসন, সিন্ডি বারসং আর মোটাউন রেকর্ডস্-এর প্রধান গায়িকা ডায়না রস। মাইকেল ও জ্যাকসন-ভাইদের অনুষ্ঠানে তখন সবাই মন্ত্রমুগ্ধ।

ডেট্রয়েটে মোটাউন রেকর্ডস-এর প্রেসিডেন্ট ব্যারি গর্ডির বাড়ির ফোনটা সেই রাত্রেই বেজে উঠেছিল। গ্যারি থেকে ডায়না রসের টেলিফোন।

"হ্যালো ডায়না ! ব্যারি গর্ডি স্পিকিং !"

"সুপ্রিমস দলের সঙ্গে আমার চুক্তি বাতিল করুন। আমি এবার থেকে একা গাইব। সোলো ! আরও একটা কথা আছে।"

"বলুন।"

"ডেট্রয়েটে আপনার বাড়িতে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন। টেম্পটেশন্‌স, মারভেলেট্‌স সব রক-গ্রুপকে নিমন্ত্রণ করুন। আমি পাঁচটি ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছি। বিস্ময়কর প্রতিভা। মোটাউন এদের রেকর্ড বের করুক।"

"...ডায়না রস : শি ইজ মাই মাদার, লাভার অ্যান্ড ফ্রেন্ড।" কথাগুলি জ্যাকসন নিজেই লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনী 'মুনওয়াক' বইয়ে।

ডেট্রয়েটে মোটাউন রেকর্ডসের অফিসে এখনও সেই ছবিটা আছে। মোটরবাইকে মাইকেল বসে, পাশে দাঁড়িয়ে ডায়না।

॥ ৪ ॥

মোটাউন, সি-বি-এস, এপিক রেকর্ড কম্পানি, বিলি জেন ও বিট ইট ভিডিও-ফিল্ম, 'থ্রিলার','ব্যাড' অ্যালবাম...একটার পর একটা পালক ক্রমশ যুক্ত হয়েছে মাইকেলের টুপিতে। আর কোনওদিন তিনি পিছনে ফিরে তাকাননি। টুপি, পোস্টার, ঘড়ি কোথায় না নেই সেই অনবদ্য ঝাঁকড়াচুলওয়ালা কালো মুখ ? ষাটের দশকের প্রধান লক্ষণ যদি হয় 'বিটল্‌ম্যানিয়া', সত্তর ও আশির দশক তা হলে 'জ্যাকসন ম্যানিয়া'তে আক্রান্ত। মাইকেল যা করেন, সেটাই খবর, সেটাই রেকর্ড ! তাঁর চেহারার মধ্যেও পৃথিবীর সাংবাদিকরা স্কুপ নিউজ খুঁজতে ব্যস্ত। থ্রিলার অ্যালবামের ওপরে তাঁর সাম্প্রতিক ফোটোগ্রাফ দেখে নিউ ইয়র্ক ডেইলি নিউজ একদল কসমেটিক সার্জনকে সেই ছবি পরীক্ষা করতে দিয়েছিল। সেই ছবি খুঁটিয়ে দেখে বিশেষজ্ঞরা রায় দিলেন, মাইকেল প্লাস্টিক সার্জারি করে নিজের মুখটি ডায়না রসের মতো করে নিয়েছেন। এর জন্য তাঁর নাকে তিনটি, চিবুকে দু'টি, চোখের পাতায় একটি করে অপারেশন করতে হয়েছে। নীচের চোয়ালের হাড়টি বসাতে হয়েছে নতুন করে।

ডাহা মিথ্যে ! আত্মজীবনী মুনওয়াক-এ মাইকেল ঘোষণা করেছেন, একমাত্র নাকে দুটো অপারেশন হয়েছিল, আর চোয়ালের হাড়টা নতুন করে বসাতে হয়েছিল। খরচ হয়েছিল ৫৬,০০০ পাউন্ড।

শুধু চেহারা নয়, পারফরম্যান্সেও মাইকেল অনবদ্য। সাসেক্সে তাঁকে নিজে এসে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন রানি এলিজাবেথ, হোয়াইট হাউসের সাউথ-লনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট রেগন মজা করে বলেছিলেন "ইজনট ইট থ্রিলার ?" (প্রসঙ্গত, সে-বছরেই বেরিয়েছিল মাইকেলের থ্রিলার অ্যালবাম), পশ্চিম বার্লিনে তাঁর অনুষ্ঠান চলার সময় পূর্ব বার্লিনের লাখো-লাখো লোক জমা হয়েছিল বার্লিন প্রাচীরের ধারে। পেপসি-কোলাতে তিনি বিজ্ঞাপনের মডেল হওয়ার পর পেপসির শেয়ার-মূল্য বেড়েছে ৩৬%-এরও বেশি, বিক্রি বেড়েছে দ্বিগুণ, ১৯৮৩তে 'বিট ইট' ভিডিও বের হওয়ার পর দেখা গেল তিনিই প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ গায়ক, আমেরিকা ও ব্রিটেন দুই দেশেই যাঁর অ্যালবাম ও সিঙ্গল রেকর্ড আর-সব রেকর্ডের চেয়ে অনেক বেশি বিক্রি হয়েছে। সেই উন্মাদনা কাটতে-না-কাটতেই শুরু হয়েছিল থ্রিলার বিক্রির হিসেব-নিকেশ, এবং সেখানেও দেখা গেল, আমেরিকা ছাড়াও অন্য আটটি দেশে থ্রিলারের বিক্রি সবচেয়ে বেশি। 'ফোর্বস' ম্যাগাজিন হিসেব করে জানিয়েছিল, ১৯৮৭-৮৮তে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী শিল্পী ছিলেন মাইকেল। সে বছর নাকি তাঁর বার্ষিক আয় ছিল ৯৭০ লক্ষ ডলার !

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ধনী একত্রিশ বছরের এই যুবক সময় কাটান কীভাবে ? লস অ্যাঞ্জেলিসের কাছে কালভার সিটিতে ব্রটম্যান মেডিক্যাল কলেজের শিশু-রোগ

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মাইকেল সব শিশুর বন্ধু।...কিন্তু, আজ একত্রিশ বছরেও শৈশব তাঁকে ছেড়ে যায়নি। নিজের বাড়িতে বসে তিনি 'ই· টি·' দেখেছেন সবসুদ্ধু পঁয়ত্রিশবার, ই· টি· আর বালক এলিয়ট নাকি তাঁর প্রিয় বন্ধু ! স্টিভেন স্পিলবার্গ তাঁর সম্বন্ধে ঠিক কথাই বলেছেন, 'মাইকেল ইজ ওয়ান অব দা লাস্ট লিভিং ইনোসেন্টস।'

বিভাগের সামনে আচমকা এসে দাঁড়াল একটা নীল ভক্সওয়াগন। তা থেকে নামছে রাশি রাশি খেলনা, বড় বড় পেপসি-কোলার ক্যান! কালো সানগ্লাস পরে একটু বাদেই একটা বি-এম-ডব্লু গাড়িতে পৌঁছলেন জারমেইন জ্যাকসন। কী ব্যাপার? এবার লস্ অ্যাঞ্জেলিস সফরের সব টাকাটাই মাইকেল পাঠিয়ে দিয়েছেন বাচ্চাদের জন্য। শিশুরাই মাইকেলের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।

গত বছর এনসিনো এস্টেটের বাড়ি বদলের সময় মাইকেল তাঁর বাড়ির একটি অংশ বিক্রি করে দেবেন বলে নিলাম ডাকেন। চড়চড় করে দাম উঠতে-উঠতে শেষে দাঁড়ায় ২৩ লক্ষ ডলার। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুক্তোটা ছিল মাইকেলের কাছে, তার ওজন ৫৭৭ ক্যারাট। সেটাও বিক্রি হয়ে গেল সাড়ে ১২ লক্ষ ডলারে। এত টাকা নিয়ে কী করবেন মাইকেল? না, সে টাকার একটি সিকি-আনি-দুয়ানিও স্পর্শ করলেন না মাইকেল, গোটাটাই পাঠিয়ে দিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার গৃহহীন, খরাপীড়িত মানুষদের কাছে। তিনিই তো গানের মাধ্যমে বলেছিলেন, পৃথিবীকে বদল করতে গেলে আগে নিজের দিকে তাকাতে হবে :

'...If you wanna make the
world a better place
Take a look at yourself and
make a change.'

তাই মাইকেল সবসময়েই নিজের দিকে তাকান। জাপান-ভ্রমণের সময় তিনি তাঁর ত্রিশটি স্টেজ-কস্টিউম নিলামে বিক্রি করেন, এতে ওঠে মোট ২০,০০০ ডলার। সেই টাকা এবং নিজের মুখ আঁকা ৭০০০টি স্বর্ণপদক তিনি পাঠিয়ে দেন ইউনেস্কোর সদর দফতরে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে ভাল কাজের জন্য যেন ওই স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। গত বছর নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন ও কানসাস সিটিতে প্রোগ্রাম করে ছ' লক্ষ ডলার দিয়েছিলেন ইউনাইটেড নিগ্রো কলেজ তহবিলে।

স্বভাবের দিক দিয়েও মাইকেল চিরশিশু। শিশুদের মতোই উদ্দাম, চঞ্চল, নির্মল হাসিতে ভরপুর। এক রেকর্ডিং কম্পানির কর্মকর্তারা একবার মাইকেলের এনসিনো এস্টেটের বাড়িতে এসে অবাক! গম্ভীর মুখে মাইকেল তাঁদের জানালেন, "নতুন একজন সেক্রেটারি পাশের ঘরে বসে আছে। রেকর্ডিং কপিরাইট নিয়ে ও-ই এখন সব ব্যাপার দেখবে।"

কে সেই সেক্রেটারি? মাইকেলের পোষা, আদুরে শিম্পাঞ্জি বাব্‌লস্! মাইকেল তাকে নিজের পোশাক পরিয়ে সোফায় বসিয়ে রেখেছেন। বাব্‌লসের পরনে কালো সুট, লাল বো-টাই, চোখে সানগ্লাস, হাতে গ্লাভস্। সেক্রেটারিই বটে! গত বছর জুলাই মাসে মাইকেল ব্রিটেনে কনসার্ট করতে গিয়েছিলেন নিজে ব্যক্তিগতভাবে একটি জাম্বো জেট ভাড়া নিয়ে। সেখানেও বাব্‌লস্ তাঁর সফরসঙ্গী!

ক্যালিফোর্নিয়ার এনসিনো এস্টেটে মাইকেলের বাড়িটি অনেকটা মধ্যযুগীয় টিউডর দুর্গের মতো দেখতে। প্রধান দরজাটি রিমোট-কন্ট্রোলড্, ভেতরে লুকনো অসংখ্য ক্যামেরা। রয়েছে ৬টি শোবার ঘর, একটি জিমনাশিয়াম, একটি সুইমিং-পুল, একটি ভিডিও-গেম্‌স রুম, (মাইকেলের প্রিয়তম খেলা ভিডিও গেম্‌স। ফুটবল, বেসবল, ক্রিকেটে তাঁর বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই) প্রায় চল্লিশজনের বসার উপযোগী একটা সিনেমা-হল। তাঁর নিজের ঘরটি অনেকটা ডিজনিল্যান্ডের গুহার মতো, ডোনাল্ড, মিকি,

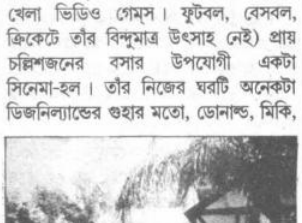

জ্যাকসনের বাড়ি : এনসিনো, ক্যালিফোর্নিয়া

মিনি, সবাই সেখানে উপস্থিত। ঘরটি তৈরি করেছেন ডিজনিল্যান্ডের অডিও-অ্যানিমেট্রনিক্স কম্পানি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাইকেলের প্রিয় ওয়াল্ট ডিজনির কার্টুন-ছবিগুলির গান এবং জন লেনন-এর গাওয়া 'ইয়েস্টারডে'। চার কোটি ৬০ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে তিনি পল ম্যাককার্টনির কাছ থেকে বিটদের সব গান কিনে নিয়েছেন। মুনওয়াক-এ তিনি জন লেননের গান সম্বন্ধে একটিমাত্র শব্দ ব্যবহার করেছেন : পবিত্র।

এনসিনো এস্টেটের অন্যতম দ্রষ্টব্য হল মাইকেলের নিজস্ব চিড়িয়াখানা। প্রতিভাবান, আদুরে বাব্‌লসের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। সে ঘোড়ার পিঠে চড়তে পারে, রোলার স্কেটিং করতে পারে। সে হরদম মাইকেলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। পাখিদের মধ্যে আছে র‍্যাকুন, ময়ূর ও ম্যাকাও। প্রাণীদের মধ্যে আছে মাস্‌ল। মাইকেলের পোষা অজগর। ভেড়ার নাম বেশ ভারিক্কি— মিঃ টিবস্। আর আছে একজোড়া শিশু হরিণ ও হরিণী— এদের নাম যথাক্রমে প্রিন্স ও প্রিন্সেস! রাজপুত্র-রাজকন্যাই বটে! এ ছাড়া আছে একটি জিরাফ এবং লুই নামের একটি লামা। সাদা আরবি ঘোড়ার নাম থ্রিলার! বান্ধবী হিসাবে রয়েছে বিভিন্ন ফ্যাশন-শপের নিষ্প্রাণ, সুন্দরী ডামি পুতুল।

অভিনেতা হিসেবেও মাইকেল অনন্য। রুপোলি পরদায় তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ সিডনি লুমেট পরিচালিত 'দা উইজ' ছবিতে, ১৯৭৭ সালে। ব্রডওয়ের অসামান্য মিউজিকাল রূপকথা দা উইজের চলচ্চিত্ররূপ।

কুইন্সি জোন্‌স প্রযোজিত জ্যাকসনের প্রথম অ্যালবাম (১৯৭৮) 'অফ দা ওয়াল' একটি কারণে স্মরণীয়। ওই অ্যালবামের প্রথম গান 'দা গার্ল ইজ মাইন' লিখেছিলেন পল ম্যাককার্টনি। বিটদের পল ম্যাককার্টনি! দুই প্রজন্মের মিলনের প্রথম সুরসৃষ্টি।

গত বছর থেকে মাইকেল সম্বন্ধে পৃথিবী রীতিমত উদ্বিগ্ন। লন্ডনের মে-ফেয়ার হোটেলে মাইকেল উপস্থিত হয়েছিলেন ডান গালে স্টিকিং প্লাস্টার ও ব্যান্ডেজ বেঁধে। শোনা যাচ্ছে, অতিরিক্ত কসমেটিক সার্জারির ফলে তাঁর নাকের হাড়গুলি এখন দ্রুত ক্ষয়ে যাচ্ছে। কোমরের থেকে হাড় নিয়ে চিবুকে বসানো হয়েছিল, কিন্তু সে হাড়গুলি উপযুক্ত পরিমাণ মজ্জা তৈরি করতে পারেনি। এনসিনো এস্টেটের বাড়ি বদল করে মাইকেল এখন দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায়, সান্তা ইনেজ পাহাড়ের কাছে নিজের খামার-বাড়ি তৈরি করেছেন। পাশের খামারটির মালিকও আর এক বিখ্যাত আমেরিকান। তাঁর নাম রোনাল্ড রেগন।

পৃথিবীর অগণ্য মানুষের দুশ্চিন্তার মধ্যেও তাঁরা কিন্তু হতাশ নন। মুনওয়াকিং জীবনের চলমানতার প্রতীক, আশার প্রতীক। মাইকেলের ময়ূরের মতোই। মাইকেল জ্যাকসনের সব অনুষ্ঠানে মঞ্চের ওপর থাকে একটি আলোর পেখম-তোলা ময়ূর। সাতটা রঙের আলো সেই পেখমের ওপর পড়ে অসাধারণ এক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

মাইকেলকে ময়ূরের পেখমের কথা তুলতে একটু হেসে জবাব দিয়েছেন, " হ্যাঁ, ময়ূর-ই আমার প্রিয় পাখি।ওর পেখমে সাতটা রং খুঁজে পাওয়া যায়।"

তাঁর সব নাচ ও গান সম্বন্ধেও ওই এক কথা। জীবনের সব রোমাঞ্চ, সব উন্মাদনা সব রং ও ঔজ্জ্বল্য নিয়েই যিনি আমাদের কাছে উপস্থিত, তিনিই মাইকেল জ্যাকসন।

বিশ্বকাপ ফুটবলে কেমন করবে বিলার্ডোর আর্জেন্টিনা

তানাজি সেনগুপ্ত

প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ দলনায়ক মারাদোনা। গতবারের বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা এবার সাউথ আমেরিকান নেশন্‌স চ্যাম্পিয়ানশিপ ট্রোফিতে ব্রাজিল এবং উরুগুয়ের কাছে হেরে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। মারাদোনা দায়ী করেছেন কোচ বিলার্ডোর রক্ষণাত্মক নীতিকে। তাঁর বক্তব্য, "এভাবে জেতা যায় না। ফরোয়ার্ডরা বলই পাচ্ছে না। শুধু নিজেদের অর্ধে খেললে গোল করব কী করে?"

আর কয়েক মাস পরেই ইতালিতে বিশ্বকাপের মূল লড়াই, এখন অধিনায়কের মুখে এসব কথা শুনে প্রমাদ গুনছেন আর্জেন্টিনার ফুটবলপ্রেমীরা। অবশ্য এই দোষারোপ এবং ফলাফলে ঘাবড়ে যাওয়ার লোক নন কার্লোস বিলার্ডো। পেশা হওয়া উচিত ছিল ডাক্তারি, ফুটবলকে ভালবেসে হয়ে গেলেন কোচ। সাফল্যের সঙ্গে মিডফিল্ডার হিসেবে খেলেছেন আর্জেন্টিনার একসময়ের বিখ্যাত ক্লাব এস্টু ডিয়ান্তেস ডি লা প্লাতায়। সিজার মেনোত্তি দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর ১৯৮৩ সালে আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের ভার নেন তিনি। তাঁর কোচিংয়ে দল প্রথম ম্যাচ খেলে ১৯৮৩ সালের ১২ মে। সেই থেকে টানা ছ' বছর দলের সঙ্গে আছেন তিনি। দারুণ কিছু ফলাফল যে আর্জেন্টিনা করেছে তা নয়। বরং ১৯৭৮-এর বিশ্বকাপজয়ী শ্রদ্ধেয় কোচ মেনোত্তির মতো আক্রমণাত্মক ও সৃষ্টিধর্মী লাতিন আমেরিকান ঘরানার ফুটবল খেলাচ্ছেন না বলে দর্শকদের প্রবল ধিক্কারই পেয়েছেন বিলার্ডো। ওইসব কথায় অবশ্য কান দেননি তিনি। এবং তার ফলে এই ধিক্কারই বদলে যায় প্রশংসায়, যখন তাঁর কোচিংয়ে মেক্সিকো থেকে আর্জেন্টিনা তুলে আনে বিশ্ব ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের ট্রোফিটি। রাস্তায় রাস্তায় ব্যানার দেখা যায়, "দুঃখিত বিলার্ডো, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন।"

অভিজ্ঞ কোচ বিলার্ডো বলেছেন, "আমার লক্ষ্য আবার বিশ্বকাপ। খুব শক্ত লক্ষ্য নিঃসন্দেহে। যে নীতিতে আগেরবার সাফল্য এসেছে এবারও সেই নীতি গ্রহণ করব। দু-একটা টুর্নামেন্টে হার কোনও ব্যাপারই নয়। বিশ্বকাপে রক্ষণব্যবস্থাকে আগে নিশ্ছিদ্র রাখতে হবে। তবেই হার এড়ানো যাবে। ভাল খেলে হারলে কেউ আমাকে ছাড়বে না।" বিলার্ডো তাই জোর দিয়েছেন সেট পিস মুভমেন্ট, ম্যান টু ম্যান ক্লোজ মার্কিং এবং অফসাইড ট্র্যাপের ওপর। বিলার্ডোর মতে, "বুদ্ধি করে খেললে এই রক্ষণাত্মক ব্যাপারগুলোই আক্রমণে পরিণত হতে পারে। যেমন অফসাইড ট্র্যাপ তো আক্রমণেরও উপায় হতে পারে, যদি তা মাঝমাঠে করা যায়। আর ফরোয়ার্ডরাই বা শুধু গোল করবে কেন? উইং ব্যাকেরা প্রয়োজনে ওভারল্যাপে উঠে এসে গোল করবে।" বিলার্ডোর কথা যে অনেকটাই সত্যি, তার প্রমাণ আমরা গত বিশ্বকাপেই পেয়েছি, পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে ফাইনালে ডিফেন্ডার ব্রাউন যখন উঠে এসে প্রথম গোলটা করে গেলেন।

এবারের বিশ্বকাপ দলের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে অবশ্য কম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না বিলার্ডো। প্রথমত, গত বিশ্বকাপ জেতার ফলে একটা মানসিক চাপ তো আছেই। তা ছাড়া তিনি দলের কয়েকজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের সাহায্য থেকেও বঞ্চিত হবেন। যেমন ভালদানো, ব্রাউন, গারে এবারের বিশ্বকাপে হয়তো খেলবেন না।

বিলার্ডোর দলের সম্ভাব্য ন' জনই খেলছেন বিভিন্ন ক্লাবে। যেমন পম্পেদু (বোটিস ক্লাবে), ব্রাউন (মুরসিয়াতে), রুগেরি (লোগরোনেসে), গ্রোগলিয় ও কানিগিয়া (ভেরোনাতে), মারাদোনা (নেপোলিতে), কলদেরন (প্যারিস সেন্ট জার্মাইনে), ডেজট্টি (লাজিয়তে) এবং বুরুচাগা (ন্যানসিতে)।

সমস্যা আছে ঠিকই, কিন্তু তার সমাধানের পথ জানেন বিলার্ডো। তাঁর কথা, "বিশ্বকাপের আগে সব ঠিক হয়ে যাবে।" আর্জেন্টিনার মানুষ তাই এখন আশায় বুক বেঁধে তাকিয়ে আছেন — 'জাদুকর' মারাদোনা এবং কৌশলে অদ্বিতীয় বিলার্ডোর দিকে।

বিলার্ডো

মারাদোনা

প্লাতিনিকে এখন মাঠের বাইরে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে

বিশ্বকাপের মূল পর্বে কি যেতে পারবে ফ্রান্স

কৃশানু ভট্টাচার্য

আগামী বছর বিশ্বকাপ ফুটবলের মূল আসরে কি ফ্রান্স উঠতে পারবে ? প্রশ্নটির উত্তর এখন বেশ অনিশ্চিত। ইউরোপিয়ান গ্রুপ ফাইভ-এ কোয়ালিফাইং ম্যাচে ফ্রান্স প্রথমেই হেরে যায় যুগোস্লাভিয়ার কাছে ২—৩ গোলে। নরওয়েকে ১—০ হারাবার পর ড্র করে দুর্বল সাইপ্রাস-এর সঙ্গে। ফিরতি খেলায় নরওয়ে ৩—০ গোলে হারিয়ে দেয় ফ্রান্সকে।

ফ্রান্সের ফুটবল আকাশে কালো মেঘ যে কখন জমতে শুরু করেছে তা কেউ লক্ষ করেনি। কিন্তু বিপর্যয়ের শুরুতেই চারদিক থেকে 'গেল গেল' রব ওঠে। সব কিছু সামাল দেবার জন্য তড়িঘড়ি ডেকে আনা হয় মিশেল প্লাতিনিকে। যেহেতু কোচিং-এ তাঁর কোনও ডিপ্লোমা নেই, তাই ম্যানেজার না করে তাঁকে 'নির্বাচক' করা হয়। কোচ অবশ্য একজন আছেন। কিন্তু প্লাতিনিই সব।

কার্যভার নেওয়ার পরে নতুন দলটাকে ঘষেমেজে ঠিক করার কাজে নেমে পড়েন একদা বিশ্বের সেরা মিডফিল্ডারটি। একটি দৈনিক ক্রীড়া-পত্রিকায় লেখা হয়, "কেউ যেন মনে না করেন প্লাতিনি ম্যাজিক জানেন। ফ্রান্সের ফুটবলে কালো দিন শুরু হল। এবার নরকে যাওয়ার পালা।"

সাধারণভাবে বলতে হয়, ফ্রান্সের ফরোয়ার্ডরা কখনওই তেমন সাড়া জাগাতে পারেননি। কিন্তু ফরোয়ার্ডদের ব্যর্থতা সত্ত্বেও গত দু'টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছয় ফ্রান্স। ১৯৮৪-র ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ানও তারা হয়। মূলত মাঝমাঠের খেলোয়াড়দের জন্যই তাদের এই সাফল্য। প্লাতিনি-টিগানা-জিরেস-বসিস সমৃদ্ধ মাঝমাঠের খেলোয়াড়রা গোল করে প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই ফ্রান্সকে উতরে দিয়েছেন। মূলত প্লাতিনির একার প্রচেষ্টাতেই ফ্রান্স ১৯৮৪-তে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ান হয়। সারা টুর্নামেন্টে ফ্রান্সের চোদ্দটি গোলের মধ্যে দশটিই আসে প্লাতিনির বুট থেকে। প্লাতিনির নেতৃত্বে মাঝমাঠের খেলোয়াড়রা ঢেকে দিতেন ফরোয়ার্ডদের সব দোষ-ত্রুটি।

দায়িত্ব নেবার পরই প্লাতিনি মাঝমাঠের জন্য ফিরিয়ে আনেন টিগানাকে। কিন্তু তেত্রিশ বছর বয়স্ক একদা বিখ্যাত মিডফিল্ডারটি তাঁর সেরা দিন পেছনে ফেলে এসেছেন। প্রয়োজনে জ্বলে উঠতে না পারায় তাঁকে ফিরিয়ে এনে খুব একটা সুবিধা হল না প্লাতিনির। গত বছর জুলাই-অগস্ট মাসে ফ্রান্স বিজয়ী হয় একুশ বছরের কমবয়সীদের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপে। দারুণ খেলেছিল ফ্রান্সের এই জুনিয়ার দলটি। প্লাতিনি এই দলের বেশ কয়েকজন ফুটবলারকে জাতীয় দলে এনে পরিণত করে তোলায় মন দিলেন। ইতিমধ্যেই সিনিয়ার দলে এসে পড়েছেন স্ট্রাইকার স্তেপানে পাটি। মিডফিল্ডার ফ্র্যাঙ্ক সাউজি, স্টপার ব্যাসিলে বোনি।

ডাবলিন-এ আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের নীল জার্সি প্রথম পরলেন ডিফেন্ডার ফ্র্যাঙ্ক সিলভেস্টার, মিডফিল্ডার ও লরেন্স ব্লাঁ। ওটি ছিল প্রীতি-ম্যাচ। ম্যাচটি ড্র হয়। কিন্তু আর একটি প্রীতি-ম্যাচে আর্সেনাল ক্লাবের বিরুদ্ধে ০—২ গোলে হারে ফ্রান্স। সেকেন্ড হাফে ফ্রান্সের অনভিজ্ঞ ডিফেন্স ভেঙে পড়ে। জাঁ ফিলিপ ডুরান্ড, নিয়েরি লরে ও লরেন্স ব্লাঁ সমৃদ্ধ মাঝমাঠ আর্সেনালের আক্রমণের চাপে কুটোর মত উড়ে যায়। ফরোয়ার্ডরা ভিজে বারুদের মতো মিইয়ে গিয়েছিল।

এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে ফ্রান্সের পক্ষে বিশ্বকাপের মূল পর্বে যাওয়া বেশ কঠিন। ফ্রান্সের গ্রুপে স্কটল্যান্ড পাঁচটি খেলায় ন' পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে আছে। যুগোস্লাভিয়া চারটি খেলে ছ' পয়েন্ট পেয়েছে। নরওয়ে ও ফ্রান্সের পয়েন্ট-সংখ্যা সমান সমান, চার। ফ্রান্স অবশ্য একটি ম্যাচ বেশি খেলেছে। ফিরতি ম্যাচে দুর্বল নরওয়ে ও সাইপ্রাসকে হারাতেই হবে ফ্রান্সকে। শক্তিশালী স্কটল্যান্ডকে কি প্লাতিনির দল হারাতে পারবে ? বাকি তিনটি ম্যাচে জিতলে ফ্রান্সের মোট পয়েন্ট হবে দশ। বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী যুগোস্লাভিয়াকে সেক্ষেত্রে হয় হারাতে হবে তিনটি ম্যাচে, ড্র করতে হবে তিনটি ও হারাতে হবে একটি ম্যাচে। অর্থাৎ, বাকি চারটি ম্যাচ থেকে যুগোস্লাভিয়া যেন তিনটির বেশি পয়েন্ট সংগ্রহ না করতে পারে।

কিন্তু ফ্রান্সের পক্ষে মূল পর্বে যাওয়ার ব্যাপারটা খুব জটিল হয়ে পড়ছে। নানা রকম সমস্যায় ফ্রান্সের দলটি ভুগছে। প্রধান সমস্যা গোলকিপার জোয়েল বাত্স, তাঁর সেরাদিন পেছনে ফেলে এসেছেন। তাঁর জন্যই প্রথম ম্যাচে ফ্রান্স হেরেছিল। তাঁকে বসিয়ে দেবার কথা ভাবছেন প্লাতিনি। ডিফেন্সে ফুল ব্যাক ম্যানুয়েল অ্যামোরোসকে বলা হত সিংহ। সিংহের দাপটেই তিনি বিচরণ করতেন সারা ডিফেন্স জুড়ে। নিজস্ব ফর্ম এখনও তিনি দেখাতে পারেননি। একই সমস্যায় ভুগছেন স্ট্রাইকার জাঁ পিয়ের পাঁপিন। লিগে ষোলোটি গোল করলেও আন্তর্জাতিক খেলায় এখনও গোল পাননি। উঠতি ফরোয়ার্ড স্তেপানে পাটি দারুণ প্রতিভাবান। খেলায় বুদ্ধির ছাপ আছে। কিন্তু এখনও তেমনভাবে জ্বলে উঠতে পারেননি।

সব সমস্যা মিটিয়ে প্লাতিনি কি পারবেন বেকেনবাউয়ারের মতো তাঁর দলকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করতে ? "পশ্চিম জার্মানিকে মূল পর্বে নিয়ে যেতে না পারলে পদত্যাগ করব", বেকেনবাউয়ার বলেছেন। কিন্তু প্লাতিনি কী বলবেন ? ফ্রান্স কী করে দেখার জন্য আমরা অপেক্ষায় থাকলাম।

গৌতম সরকার

মধ্যমগ্রামের পড়শি

পূর্ব প্রকাশিতের পর

অনেকেই হয়তো জানে না, ছেলেবেলায় প্রথম দিকে আমি ফরোয়ার্ডে খেলতাম, কখনও-কখনও ডিফেন্সে। তবে সারা মাঠ জুড়ে খেলার প্রবণতা তখন থেকেই। সে এগিয়েই খেলি বা পিছিয়ে। সৌভাগ্যের বিষয়, ওই ম্যাচে আমি গোল করলাম, দলকে জেতালাম এবং সেরা খেলোয়াড়ের সম্মানও পেলাম। ফিরে এসে সব ট্রোফি তুলে দিলাম মায়ের হাতে। মা যে কী খুশি! কিন্তু তারপর?

বাবা ট্রোফি দেখে ভুললেন না। শুনলাম, আমি কোথায় গেছি জানার পর মাকে প্রচণ্ড বকেছেন। আমাকেও ধমকালেন, মারও খেলাম। রাত্রে মায়ের পাশে যখন শুয়ে আছি, ঘুম প্রায় চলে এসেছে, চোখটা একটু খুলে দেখলাম, বাবা আমার মাথায় হাত বুলোচ্ছেন আর মাকে বলছেন, "ও আজ অনেক প্রাইজ পাইছে না?" মা ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, "এত খেটেখুটে এসেও তো ছেলেটা মার খেল।" বাবা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। বললেন, "ঠিক আছে, অরে কাল সকালে আমি ভাল মিষ্টি খাওয়ামু।"

বাবার এই একটা ব্যাপার ছিল। খেলার জন্য বাবার হাতে মার খেয়েছি, এমনকী, বেল্ট খুলেও মেরেছেন। কিন্তু আমি ভাল খেললে বাবা কী খুশি হতেন তা বলার নয়, খুশিটা বোঝা যেত মিষ্টি আনার বহর দেখেই। যেহেতু আমি খেলি, আমার শরীরের ব্যাপারে বাবার নজর ছিল দারুণ। প্রত্যেকদিন বাজার যেতেন, নিজে হাতে জিনিস কিনতেন। যতটুকু পারতেন, ভাল খাবার, প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার নিয়ে আসতেন। আসলে বাবা ছিলেন নিয়মনিষ্ঠ। চাইতেন পড়ার সময় যেন পড়ি। শিক্ষার দাম যে কী তা বাবা ভালভাবেই বুঝতেন। কিছুটা লেখাপড়া না করলে তো এমনিতেই মাথা নিচু হয়ে যায়। তাই আমাদের ভাই-বোনদের প্রতি বাবার এত সতর্ক দৃষ্টি। কিন্তু মনে মনে তিনিও ছিলেন খেলার সমঝদার। মুখে না বললেও পরোক্ষে বাবার স্নেহ ও উৎসাহ আমি সবসময়ই পেয়েছি। আর মায়ের কথা তো বললামই। তাঁর প্রশ্রয় না পেলে আর যাই হোক, আমি ফুটবলার হয়ে উঠতাম না কখনওই।

প্রসঙ্গক্রমে দাদা-দিদির কথাও বলে রাখি। আমার খেলার ব্যাপারে দুজনেই আমাকে দারুণ সাহায্য করেছে। খেলা ছাড়া সংসারে আর কোনও ব্যাপারে আমাকে বিব্রত থাকতে হয়নি ওদেরই জন্য। তবে শুধু সাহায্য নয়, এবার একটু গোলমালের কথাও জানাই। ব্যাপারটা অবশ্য মজার। দাদা ছেলেবেলায় ছিল মোহনবাগানের সমর্থক, দিদি ইস্টবেঙ্গলের। আমরা বাঙাল বলেই হয়তো দিদির ইস্টবেঙ্গল-প্রীতি, কিন্তু আমি আবার হয়ে গেলাম মোহনবাগান সমর্থক। রেডিওতে খেলার রিলেতে শুনতাম, রক্ষণভাগে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন জার্নেল সিং, সবাই ওঁর কাছে এসে আটকে যাচ্ছেন। আমার সারা শরীরে একটা অন্যরকম শিহরন বয়ে যেত। জার্নেল খেলতেন মোহনবাগানে। আর ছিলেন চুনী গোস্বামী। চুনীর মতো ফরোয়ার্ড সারা ভারতেই তো কম জন্মেছেন— এঁদের আকর্ষণই আমাকে মোহনবাগান সমর্থক করে দিল। এ-নিয়ে প্রায়ই আমাদের ভাই-বোনে তুলকালাম হত। আরও বেশি হত যখন

বাবা, মা ও আত্মীয়দের সঙ্গে আমি

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ থাকত। আমাদের বাড়ি তখন দু' শিবিরে বিভক্ত। এটা আরও বাড়ল যখন আমার পরের ভাই-বোনেরাও দু'দলে ভাগ হয়ে গেল। সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড! ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান নিয়ে কত ঝগড়াই হয়েছে, চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে গলা ফুলে যেত!

কথায়-কথায় সেই অপমানের জবাব দেওয়ার কথাটা লিখতে ভুলে যাচ্ছিলাম। শ্যামলদার প্রসঙ্গ, আমার মায়ের সান্ত্বনা এবং আমার জেদ চেপে যাওয়ার কথা। খুব বেশি দেরি হয়নি, একদিন সুযোগ জুটে গেল। কবরখানার মাঠে খেলা। একই দলে খেলছি আমি আর শ্যামলদা। ও স্টপারে। আমিও পিছিয়ে খেলছি। সেদিন আমি মায়ের কথা স্মরণ করে উজাড় করে দিয়েছিলাম নিজেকে। সারা মাঠ চষে ফেলেছিলাম। কেমন খেলেছিলাম জানি না, দল জিতেছে এতেই আনন্দ পেয়েছিলাম। খেলার শেষে এক ভদ্রলোক এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, "তুমি আজ মাঠের সেরা খেলোয়াড়, তোমাকে ভাই আমি কিছু পুরস্কার দিতে চাই, নেবে তো?" কথাটা শুনে যেমন ভাল লাগল তেমনই মনে হল,যাক তা হলে আমি নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছি। ভদ্রলোককে বললাম, "আপনি যা দেবেন তা-ই আমি মাথা পেতে নেব।"

বিস্ময়ের অবশ্য তখনও একটু বাকি ছিল। একটু পরে দেখি, সুব্রতদা আমার কাছে এগিয়ে এলেন, কাঁধে হাত রাখলেন, তারপর বললেন, "সত্যিই তুই আজ দারুণ খেলেছিস। তুই পাড়ার এক নম্বর খেলোয়াড়।" কী শুনলাম আমি! কয়েকদিন আগে এই সুব্রতদাই আমাকে খেলা ছেড়ে দিতে বলেছিলেন না। একটু সময় নিয়ে আস্তে-আস্তে বললাম "এক নম্বর দু'নম্বর জানি না। শুধু এটুকু বলতে পারি, ফুটবল ছেড়ে পালানোর জন্য আমি কিন্তু ফুটবল খেলতে আসিনি সুব্রতদা।"

স্কুলের হয়ে খেলি, ক্লাবে খেলি। আবার আন্ডার-হাইটেও নানা জায়গায় খেলে বেড়াচ্ছিলাম আমি। স্কুলের দু-একজন মাস্টারমশাইয়ের কথা কখনও ভুলব না। বাঞ্ছারাম পোদ্দার, শম্ভুনাথ মুখার্জি আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন। এমনকী, খেলা থাকলে স্কুল থেকে আগে ছুটিও পেয়ে যেতাম। মনের আনন্দে ছুটতাম মাঠে।

এই সময়েই একদিন আমার সঙ্গে এসে আলাপ করলেন খেলা-অন্ত-প্রাণ অনিল ভাদুড়ি। আমার খেলা নাকি তাঁর খুব ভাল লেগেছে। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন

> খেলার জন্য বাবার হাতে মার খেয়েছি, এমনকী, বেল্ট খুলেও মেরেছেন। কিন্তু আমি ভাল খেললে বাবা কী খুশি হতেন তা বলার নয়, খুশিটা বোঝা যেত মিষ্টি আনার বহর দেখেই। যেহেতু আমি খেলি, আমার শরীরের ব্যাপারে বাবার নজর ছিল দারুণ। প্রত্যেকদিন বাজার যেতেন, নিজে হাতে জিনিস কিনতেন। যতটুকু পারতেন, ভাল খাবার নিয়ে আসতেন।

বরানগর স্পোর্টিং ক্লাবে। সালটা ১৯৬৫। এই ক্লাবের কোচ গোলরক্ষক নারায়ণ মণ্ডল। নারায়ণদা আমায় ক্লাবে নিলেন। মহা উৎসাহে আমি রোজ প্র্যাকটিস শুরু করে দিলাম।

আমার ফুটবল জীবন তৈরি করার পিছনে বরানগর স্পোর্টিং ক্লাব এবং কোচ নারানদার ভূমিকা অনেকখানি। আগেই বলেছি, খেলতাম ফরোয়ার্ডে, নারানদাই প্রথম আমাকে বললেন, মাঝমাঠে নেমে আসতে, তাতে আমি নাকি বেশি সফল হব। আমি বুঝতাম, আমার মধ্যে যেমন একটা আক্রমণ করার প্রবণতা আছে, তেমনই পিছিয়ে এসে বল ছিনিয়ে নেওয়ারও একটা চেষ্টা ছিল। আমার কাছাকাছি অঞ্চল দিয়ে বিপক্ষের কেউ বল নিয়ে বেরিয়ে যাবে—এ-দৃশ্যটাই আমার কাছে অসহ্য লাগত। আমি ছুটে গিয়ে বাধা দিতাম, আপ্রাণ চেষ্টা করতাম বল কেড়ে নিতে। সেটা দেখেই হয়তো নারানদা চেয়েছিলেন, আমি পিছিয়ে খেলি। ওঁর কথা আমি মেনে নিয়েছিলাম।

ক্লাবে ঢুকে অবশ্য প্রথমে আমি জুনিয়ার দলেই সুযোগ পাই। আমার খেলা দেখে ক্লাব কর্তৃপক্ষ পরে সিনিয়ার দলে নির্বাচিত করেন। কিছুদিনের মধ্যেই আমি 'সিনিয়ার' হয়ে গেলাম।

এক বছর বরানগরে খেলার পর তৃতীয় ডিভিশনের ক্লাব জোড়াবাগানে আমাকে নিয়ে এলেন বীরেন দাস। এলাম তো, খেলার সুযোগই পাই না। একটা ম্যাচে একজন নিয়মিত খেলোয়াড় না আসায় অপ্রত্যাশিতভাবে সুযোগ এসে গেল। বুঝলাম দারুণ সুযোগ,এটাকে কাজে লাগাতে হবে। খেললাম এবং মনে হয় কর্মকর্তাদের খুশিই করতে পেরেছিলাম। অনেক ম্যাচ খেলেছিলাম সে-বছর।

এরই মাঝে একদিন স্থানীয় কয়েকজন ছেলে এসে আমাকে অনুরোধ করল। দমদম এয়ারপোর্ট মাঠে একটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ হবে, আমাকে খেলতে হবে। সেখানে নাকি কলকাতার প্রথম ডিভিশনের নামী কয়েকজন খেলোয়াড় খেলবেন। যাঁদের মধ্যে আছেন তখনকার নামকরা ফরোয়ার্ড অসীম মৌলিক। খেলা দেখতে আসবেন ভবানী রায়, অমল সেনগুপ্তরা। আমাকে উত্তেজিত, রোমাঞ্চিত করতে এইসব নাম যথেষ্ট। বড় ক্লাবের নামী খেলোয়াড় দেখলেই আমার খুব ইচ্ছে করে তাঁদের সঙ্গে খেলতে, কথা বলতে, অনেক-কিছু শিখতে। আমি রাজি হয়ে গেলাম।

এই ম্যাচটা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে গেল। তাই এখনও এই ম্যাচের প্রতিটি মুহূর্ত আমার মনে আছে। বড় খেলোয়াড়ের সামনে নিজেকে যদি সত্যিকারের প্রমাণ করতে না পারি, তা হলে আমি কিসের প্লেয়ার? একটা ঘোরের মধ্যে খেললাম। পরবর্তী সময়েও দেখেছি, আমার যদি জেদ চেপে যায়, আমি নিজেকেই নিজে উত্তেজিত করতে থাকি। আজ ভাল খেলতেই হবে—এই মানসিকতা বাইরে থেকে কেউ চাপিয়ে দিলে ভাল খেলা যায় বলে আমার মনে হয় না। এটা সম্পূর্ণ নিজের ব্যাপার।

যাইহোক, ম্যাচ শেষ হল এবং খেলে আমিও খুব তৃপ্তি পেলাম। তবে ভাল দু-একটা পাস কেন বাড়াতে পারলাম না, সেসব নিয়েও ভাবছিলাম। এমন সময় অমল সেনগুপ্ত আমায় ডাকলেন এবং বললেন, "তোমাকে আমি আগামী বছর ইস্টার্ন রেলে খেলাতে চাই, তুমি খেলবে তো?"

খেলব মানে? ময়দানে প্রথম ডিভিশন ক্লাবে খেলার জন্য আমার মন ছটপট করছে আর ইস্টার্ন রেল তো বিরাট ক্লাব, সেখানে আছেন আমার আদর্শ কাজল মুখার্জি। আছেন আমাদের ছেলেবেলার স্বপ্ন প্রদীপ ব্যানার্জি এবং কোচ বাঘা সোম। এঁদের সান্নিধ্য পাব আমি! এঁদের সঙ্গে একসঙ্গে প্র্যাকটিস করব, খেলব, বল বাড়াব প্রদীপদাকে! স্বপ্ন-টপ্ন দেখছি না তো! নিজের গায়ে চিমটি কাটলাম। না, বেশ ব্যথা লাগল তো! আমি অমলদার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলাম। (ক্রমশ)

অনুলিখন : তানাজি সেনগুপ্ত

রোয়িংয়ে বাংলার ছেলেমেয়েরা

চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনের যে জল থেকে বাংলার কয়েকজন মেয়ে-রোয়ার তিনটি ইভেন্টে তিনটি রুপো তুলে আনলেন, সেই জল বাংলার ছেলেদের একটি পদকও দিল না। ঘটনাটি কিছুদিন আগের। শুধু পুনে কেন, গত কয়েকটি ন্যাশনাল রোয়িং ঠিক এভাবেই বাংলার ছেলেদের জলে ডুবিয়ে ছেড়েছে। পদকের ধারেকাছে আসতে দেয়নি ওদের। কিন্তু রোয়িং-এ বাংলার এমন হতাশাব্যঞ্জক ছবি দেখে যাঁরা খুব কষ্ট পান, তাঁরা চমকে যাবেন যদি অ্যালবামের পাতা উলটে আগের ছবিগুলি দেখেন।

বাংলার রোয়িং সত্যি খুব গর্বের ছিল, কত সোনালি দিন এসেছে এখানে। যদি প্রশ্ন করা হয়, এশিয়ার প্রথম রোয়িং ক্লাব কোনটি, উত্তরটি আমাদের আনন্দ দেবে। ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব। রবীন্দ্র সরোবরের এই ক্লাবটি ১৩০ বছরেও চিরনতুন। এশিয়ার প্রথম তো বটেই, পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন এই সি আর সি। এরপর এসেছে বেঙ্গল রোয়িং ক্লাব, লেক ক্লাব, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি রোয়িং ক্লাব প্রভৃতি। এই তিনটির মধ্যে আবার বেঙ্গল রোয়িং ক্লাব সবচেয়ে পুরনো। ৬১ বছর বয়স।

ক্লাবের ঐতিহ্যের মতোই রোয়ারদের নামও গর্ব করে বলা যেত। সুমন্ত দুমরা, গিরীশ ফাদনিস, কাবাস কাপাডিয়া, গৌরীশংকর মজুমদার, আরও কত!

ছ'বারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান সোনার স্কালার সুমন্ত এখন আমেরিকায় সংসার পেতেছেন।

যাই হোক, ঘুরেফিরে কিন্তু সেই একই প্রশ্ন মনে এসে যায়, বাংলার ছেলেরা নৌকোয় বসে তলিয়ে যাচ্ছে কেন! রাজ্য-সংস্থার সভাপতি, এক সময়ের দক্ষ রোয়ার, ফোর্স স্ট্রোকার কল্যাণ ঘোষ বলেছেন, "কিছু করার নেই। যেদিন থেকে সেনারা নৌকো নিয়ে জলে নামল সেদিন থেকেই আমরা ডুবতে বসেছি। কোর এঞ্জিনিয়ারিং রোয়িং অ্যাসোসিয়েশন (সেরা), সার্ভিসেস স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড (এস এস সি বি), মহারাষ্ট্র, এদের চাকরি-বাকরি সবই হচ্ছে রোয়িংয়ের জন্য। ঘুম থেকে উঠে ওরা দেখে ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। বাস, উঠে পড়ল সেখানে। সোজা গিয়ে পড়ল জলে। ওদের উঠতে-বসতে, খেতে-ঘুমোতে শুধু রোয়িং আর রোয়িং। আর আমাদের? লেখাপড়া, চাকরি-বাকরি এসব সামলে সবাই রোয়িংয়ে আসে। রোয়ারদের ভালবাসা আছে বলেই এখনও পর্যন্ত বাংলার রোয়িং টিকে আছে। তবে এভাবে চললে জল শুকোবেই।

কিন্তু সংস্থা কী করছে? কল্যাণবাবু সঙ্গে সঙ্গে জানালেন, "সব করি, স্টেট মিট হয়, বিভিন্ন-ক্লাব মিটগুলি করতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সাহায্য করি। স্কুল-কলেজের প্রতিযোগিতাও হয়। ছেলেমেয়েরা প্রচণ্ড ভাল। তাই প্রায় নিজেদের পয়সায় পুনে থেকে ন্যাশনাল করে এল।"

বাংলার রোয়িংয়ের একটা বড় বাধা, জলের দূরত্ব। প্রতিযোগিতায় যেতে হয় ২০০০ মিটার। কিন্তু লেকে ১০০০ মিটারের বেশি জায়গা নেই। একথা সভাপতি বলেছেন, বলেছেন অমিতাভ শর্মা, দীপ্তাংশু চৌধুরি ও দেবদান মণ্ডলের মতো কয়েকজন রোয়ার, আর বলেছেন মেয়ে রোয়ার সুরভি মিত্র। উল্লেখ্য, সুরভি মূলত অ্যাথলিট। পরে এসেছেন হকি আর রোয়িংয়ে। রোয়াররা বলেছেন, "যতদিন না রোয়িংয়ের জন্য কেউ চাকরি পাচ্ছে, ততদিন বাংলার রোয়িং উঠবে না। বাংলায় যত বড় বড় রোয়ার হয়েছেন তাঁরা সবাই নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন অন্যভাবে। রোয়িংয়ের জন্য নয়। তাঁরা কেউই চান না, নিজেদের ছেলেরা এই খেলায় আসুক।"

মেয়েদের সাফল্যের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম লেখাটা। এই সাফল্য এনেছেন শর্মি ঘোষ (স্কালস্), টিনা কোলা-ভাবনা নিলমা (পেয়ার্স), সুরভি মিত্র, সঙ্গীতা চতুর্বেদী সুচেতা দে, মৌসুমী দত্তচৌধুরি, তনুশ্রী বসু (ফোর্স)।

মেয়েদের সাফল্য কিন্তু এই একবারই নয়। জাতীয় গেম্স থেকে সোনা-রুপো এঁরা আনছেনই। ১৯৮৫-র দিল্লি ন্যাশনাল গেম্স থেকেও মেয়েরা সফল হয়ে ঘরে ফিরেছেন। '৮৭-তেও তাই। প্রসঙ্গত একটা কথা বলে রাখি। রোয়িংয়ে বাংলার মেয়েদের তৈরি করে দিয়ে গেছেন প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ান সাঁতারু শ্রীপর্ণা ব্যানার্জি। ১৯৮৩-তে বাড়ি থেকে মেয়েদের জলে নামিয়ে, সাঁতার শিখিয়ে নৌকোয় তুলেছেন তিনি।

প্রতিকূল স্রোতে উর্মিলা-সুমিতা

অমিতাভ রায়

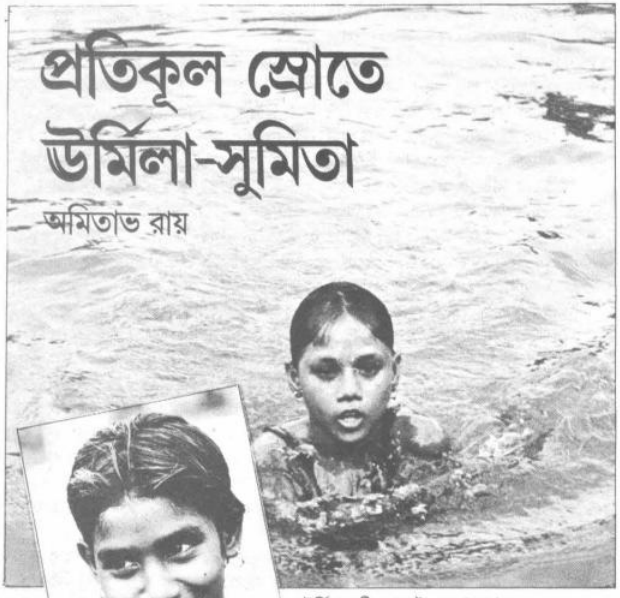

উর্মিলা ছেত্রী ফোটো : সন্তোষ ঘোষ

সুমিতা পাড়ুই ফোটো : অশোক চক্রবর্তী

দু'জনের খুব মিল। উর্মিলা ছেত্রী আর সুমিতা পাড়ুই-এর। দু'জনেই সাব-জুনিয়ার সাঁতারে পটাপট রাজ্য রেকর্ড ভাঙছে এবং গড়ছে, দু'জনেই একই জায়গার মেয়ে, সাঁতারও কাটে একই ক্লাবে, পড়েও একই স্কুলে, দু'জনের বন্ধুত্বও প্রচণ্ড। আর-একটা ব্যাপারেও মিল আছে। সেটা শেষেই বলা যাবে।

বালি স্টেশনে নেমে অনেকখানি আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে কৈলাশ ব্যানার্জি লেনে উর্মিলাদের বাড়ি। সেখানে অবশ্য উর্মিলাকে পাওয়া গেল না। রবিবার বলে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল কিছুটা দূরে এক ক্লাবের পুলে। ওর ক্লাব বালি সুইমিং সেন্টারের পুকুর বাঁধানো নয় বলে প্র্যাকটিসে কিছুটা অসুবিধা হয়। দূরের সুইমিং পুলটা অনেক ভাল। তাই প্রত্যেক রবিবার ওখানে গিয়ে ওরা সাঁতার কাটে। অবশ্য এই সাঁতার কাটার অনুমতি ওরা সপ্তাহে একদিনের জন্যই পেয়েছে। কী অবস্থা! জাতীয় চ্যাম্পিয়ানের জন্য পুলের বরাদ্দ মাত্র একদিন!

সাড়ে বারো বছরের মেয়ে উর্মিলা সাঁতারে নেমেছে চার বছর। ১৯৮৬-তে প্রথম রাজ্য এজ গ্রুপ সাঁতারে নেমেই ও প্রথম হয়। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় অবশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। ব্যর্থতা যেন ওর উদ্যমকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তারপর থেকে প্রতি বছরই ভাল ফল করেছে। এ-বছর বাঙ্গালোরে জাতীয় সাব-জুনিয়ার থেকে ও তো একেবারে "সোনার মেয়ে" হয়ে ফিরে এসেছে। ৪টি সোনা, তার মধ্যে একটিতে আবার জাতীয় রেকর্ড। ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলিতে ১৯৮৩-তে গড়া বুলা চৌধুরির রেকর্ড ভেঙেছে ২·৪৫·২৫ সেকেন্ড করে। কলকাতা রাজ্য এজ গ্রুপ সাঁতারেও সেরা সাঁতারুর সম্মান পেল উর্মিলা ৮টি সোনা পেয়ে, তার মধ্যে ৩টি রেকর্ড।

উর্মিলার প্রিয় ইভেন্ট ১০০ মিটার বাটারফ্লাই। সেটায় কিন্তু ও জাতীয় রেকর্ড এখনও ভাঙতে পারেনি। প্রিয় ইভেন্টেই পারলে না? লাজুক হেসে উর্মিলা জানাল, "আগামীবার চেষ্টা করব।" উর্মিলার আপাতত লক্ষ্য রেকর্ড করা এবং সময় কমানো, বড় লক্ষ্য আরও পরে।

বালি শিক্ষানিকেতনের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী উর্মিলার সময় কাটে সকালে বিকালে দু'বেলা প্র্যাকটিস, দুপুরে স্কুল আর রাত্রে পড়ার মধ্যে দিয়ে। সাঁতার ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে? উর্মিলা স্পষ্ট জানায়, "না।" অর্থাৎ, ওর লক্ষ্য এখন একটাই।

উর্মিলার চেয়ে বয়সে ছোট, এগারো বছরের একই স্কুলের ক্লাস সিক্স-এর ছাত্রী সুমিতা পাড়ুইও এ-বছর দারুণ সাফল্য পাচ্ছে। রাজ্য সাঁতারে সেও ছ'টি সোনা পেয়েছে, ভেঙেছে বুলা এবং উর্মিলার রেকর্ড। সুমিতার আশা, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও ও ভাল করবে। রোগা ছটফটে সুমিতা জানাল, সাঁতার কাটতে ওর সবচেয়ে ভাল লাগে, খারাপ লাগে স্কুলের ইংরেজি পাঠ্যবই।

কথা হচ্ছিল উর্মিলা ও সুমিতার কোচ, প্রাক্তন জাতীয় সাঁতারু, বয়সে তরুণ বিশ্বজিৎ ঘোষের সঙ্গে। বিশ্বজিতের মতে, "ওরা দু'জনেই অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। খুব আন্তরিক, কষ্টসাধ্য যে ধরনের প্র্যাকটিসই দিই না কেন, ওরা দু'জনে তা টানবেই। খুব অসুবিধা না হলে একদিনও প্র্যাকটিসে ফাঁকি দেয় না। তবে দু'জনেরই ফ্যাট কম। আরও একটু ফ্যাট দরকার। আর পরিশ্রম যা করে তার জন্য আরও খাদ্য।"

এই খাদ্যের ব্যাপারেই দুই বান্ধবী উর্মিলা ও সুমিতার খুব মিল। উর্মিলার বাবা মোহন ছেত্রী ট্রলি রিকশ চালান। দোকান থেকে দোকানে চাল, গমের বস্তা নিয়ে যান। উর্মিলার মা জানালেন, "আয়ের কোনও ঠিক নেই। কোনওদিন ১৫ টাকা, কোনওদিন বা ২০, ২৫ টাকা। এই দিয়ে কি সংসার চলে, বলুন?" উর্মিলার দাদা লাইটের টুকটাক কাজ করে, কিন্তু সাত ভাই-বোনের সংসারে তাতেও খুব একটা সুরাহা হয় না। দু-একজন সাহায্য করেন বটে, কিন্তু দরকারের তুলনায় তা আর কতটুকু? সুতরাং কোনওরকমে ডাল রুটি খাওয়াই উর্মিলার ভাগ্য। সুমিতার বাবার লজেন্স-বিস্কুটের দোকান, বিরাট কিছু নয়। সুতরাং সুমিতাও ওর প্রিয় খাবার—দুধ কালেভদ্রে মুখে দিতে পারে।

ফিরে আসবার সময় দেখলাম, এক বাড়ির বারান্দায় আদরের বিড়ালকে দুধ খাওয়াচ্ছেন এক মহিলা। মুঠো মুঠো সোনা হাতে নিয়ে বাংলার দুই সম্ভাবনাময় সাঁতারু এই বিড়ালের ভাগ্যও পেল না! আন্তরিকতা, পরিশ্রম করার স্পৃহা এবং ভবিষ্যতের এক রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে সুইমিং পুলের জলে লড়াই করলেও, অভাবের সমুদ্রে এখন হাবুডুবু খাচ্ছে উর্মিলা ও সুমিতা।

ভারতের করিম জব্বার

বিশ্বের অন্যতম সেরা বাস্কেটবলার করিম আব্দুল জব্বার অবসর নিতে না নিতেই 'সাই' কর্তৃপক্ষ ভারতের এক করিমের খোঁজ পেয়েছেন কি ? ৭ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা, কলকাতার সল্ট লেকের উনিশ বছরের এই ছেলেটির নাম জিতেন্দর সিং। জিতেন্দর কোনওদিনই বাস্কেটবল খেলেনি, কিন্তু সে দুর্দান্ত লম্বা। এই উচ্চতাকে কাজে লাগাতে তাকে ইতিমধ্যেই দিল্লিতে ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয়েছে।

পরবর্তীকালে সে কেমন খেলবে তা এখনই বোঝা না গেলেও, একটি সমস্যা নিয়ে সে খুব বিব্রত ছিল—জুতোর মাপ। তার সাইজ ১৬, যেখানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সবাধিক লম্বা বোলার কার্টলে অ্যামব্রোসের জুতোর মাপ মাত্র ১২ !

খেলায় রেগন

'খেলার খবর'-এ প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগনের ছবি দেখে অনেকেরই মনে হতে পারে, ভুল করে ছাপা হয়েছে। ভুল নয়, রেগন এখন খবরেরই শিরোনামে। বেসবল অনুরক্ত রেগন ত্রিশের দশকে বেতারে দারুণ ধারাভাষ্য দিতেন। পরে ফিল্ম এবং আরও পরে রাজনীতির চাপে আর মাঠে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বর্তমানে অবসর-জীবনে আবার মাঠে ফিরে এসেছেন তিনি। আমেরিকার জাতীয় বেসবল লিগের একটি ম্যাচের ধারাবিবরণী দিয়ে জানালেন, "অভিজ্ঞতাটা বেশ সুখপ্রদই।"

ডিজাইনার ফ্লো জো

সোল ওলিম্পিকে আলোড়ন তুলেছিলেন ফ্লোরেন্স গ্রিফিথ জয়নার। শুধু মহিলাদের দৌড়ে নানা রেকর্ড করেই নয়, পোশাক-আশাকে অভিনব স্টাইল এনে তিনি সবার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন। ওলিম্পিকের শেষে ট্র্যাক থেকে বিদায় নিলেও, ড্রেস-ডিজাইনার হিসেবে তাঁর কিন্তু খুব চাহিদা। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা পেসার্স বাস্কেটবল দল তাদের জার্সির নতুন ডিজাইন করার দায়িত্ব দিয়েছে ফ্লো জো-কে। কর্মকর্তাদের ধারণা, হয়তো ফ্লো জো-র হাতের গুণে শুধু জার্সির চাকচিক্যই বাড়বে না, ক্লাবের ভাগ্যও দারুণ খুলে যাবে।

অন্য ম্যাকেনরো

আম্পায়ারদের সঙ্গে তো বটেই, সাংবাদিকদের সঙ্গেও ভাল সম্পর্ক নয় জন ম্যাকেনরোর। উইম্বলডনের আসরে হঠাৎ একদিন অন্য এক দৃশ্য দেখে সবাই অবাক। এক সাংবাদিকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছেন, এমনকী তার গাল ধরে নেড়েও দিলেন ম্যাকেনরো। কী ব্যাপার ! আসলে, সাংবাদিক এক শিশু-পত্রিকার প্রতিনিধি, এগারো বছর বয়স। জিততে পারবেন ? এই প্রশ্নে ম্যাকেনরো তাকে জানান, "আপ্রাণ চেষ্টা করব। বন্ধুদের বলবে, তারাও খেলতে গিয়ে যেন জেতার প্রাণপণ চেষ্টা করে।"

দশ নম্বর জার্সি

ফুটবলের কিংবদন্তি পেলের বহু সোনালি দিন কেটেছে ব্রাজিলের স্যান্টোস ক্লাবে। পেলের জন্যই স্যান্টোস পেয়েছে বিশ্বব্যাপী প্রচার। স্যান্টোস ক্লাবের আর্থিক অবস্থা কিন্তু এখন ভাল নয়। এই কারণেই ক্লাব কর্তৃপক্ষ মারাদোনা এবং পেলেকে নিয়ে একটি ম্যাচ আয়োজনের চেষ্টা করছেন। সেই খেলার শেষে অবশ্য সেরা আকর্ষণ হবে পেলের বিখ্যাত দশ নম্বর জার্সির নিলাম। করবেন স্বয়ং পেলে। ক্লাব প্রেসিডেন্ট মিগেল আসাদ ফিল্‌হো জানিয়েছেন, অতঃপর ক্লাবে আর দশ নম্বর জার্সি কেউ পরবে না, তার জায়গা নেবে কুড়ি নম্বর।

দর্শক

সফল স্টিভ

স্পোর্টস ফ্যামিলি বা খেলাধুলার পরিবার বলা-ই ভাল । বাবা রজার এবং মা বেভারলি দু'জনেই ভাল টেনিস খেলতেন । চার ভাই খেলে ক্রিকেট । ক্রিকেট-বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণী যদি ঠিক হয় তা হলে আগামী দিনে এই চারজনই অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটে সফল হতে চলেছে । বড় ভাই স্টিভ ও অবশ্য ইতিমধ্যেই বেশ সফল হয়ে উঠেছেন । ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বর্তমান অ্যাশেজ সিরিজে প্রথম দুটি টেস্টে দুটি অপরাজিত শতরান এবং ৩৫০ রান দেখে অনেকেই তাঁকে 'নতুন ব্রাডম্যান' বলছেন । স্টিফেন রজার ও-র (স্টিভ ও নামেই বেশি পরিচিত) জন্ম সিডনিতে ১৯৬৫ সালের ২ জুন । ছোট ভাই মার্ক চার মিনিটের ছোট । ছেলেবেলায় দু' ভাই মিলে বাড়িতেই ক্রিকেট

ব্যাট নিয়ে নেমে পড়তেন । বাড়ি থেকে তা আস্তে-আস্তে সারা অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-মাঠগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল । ভারতের বিরুদ্ধে ১৯৮৫-৮৬ সিরিজে টেস্ট খেলার সুযোগ পান স্টিভ । ১৯৮৭ সালে রিলায়েন্স বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার জয়ে স্টিভ ও'র অবদান অনেকখানি । গত মরসুমে ইংল্যান্ডের লিগে মার্টিন ক্রোর বদলি হিসেবে সমারসেটে খেলেন তিনি । গাড়ি থেকে নেমেই প্রথম ম্যাচটি খেলতে ছুটতে হয় এবং অপরাজিত ১১৫ রান করেন । খুঁতখুঁতে সমারসেট-কর্তারা সেদিন সন্ধ্যাতেই ও-র সঙ্গে মরসুমের চুক্তি পাকা করেন । 'উইজডেন' পত্রিকার বিচারে গতবারের সেরা পাঁচ ক্রিকেটারের অন্যতম স্টিভ কম্পিউটার র‍্যাঙ্কিং-এও বর্তমানে বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানদের তালিকায় সাত নম্বরে চলে এসেছেন । তালিকার আরও ওপর দিকে আসতে বোধহয় খুব বেশি সময় নেবেন না স্টিভ । স্টিভ ও-র ব্যাটিং-দক্ষতা ও অলরাউন্ড পারফরম্যান্স দেখে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল মুগ্ধ । তাঁর মতে, "স্টিভের ভাল খেলা মানেই দলের জয় । রান পাক, না পাক ও জাত খেলোয়াড় ।" বর্ডারের পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে এখন থেকেই চিহ্নিত হচ্ছেন স্টিভ । স্টিভ অবশ্য বলেন, "এখন ওসব নিয়ে আমি ভাবছি না । ভাল খেলাই আমার কাজ ।" দেখা যাচ্ছে, কাজটা ভালভাবেই শুরু করেছেন স্টিভ ও ।

সুজন সেন

কোমরের দু'পাশের মেদ কমানোর ব্যায়াম

'অর্জুন' মলয় রায়

সুন্দরের প্রতি আমাদের একটা সহজাত আকর্ষণ আছে । সৌন্দর্যসচেতন বলেই আমরা নিজেদের এতটা সাজাতে ভালবাসি । আর আমি এখন শরীরটাকে সাজাতে যে পরামর্শ দিচ্ছি তার জন্য বিশেষ কোনও পোশাক-আশাক বা অলঙ্কারের প্রয়োজন নেই । ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরটাকে সুঠাম ও কর্মক্ষম রাখাই হল সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য ।

মুখ যত সুন্দরই হোক, শরীরে যদি বাড়তি মেদ থাকে তা হলে চেহারা মোটেই সুন্দর দেখাবে না । শরীরের বিভিন্ন জায়গার মেদ জমতে পারে । আজ বলছি কোমরের দু'পাশের মেদ কমানোর ব্যায়াম ।

পা এক থেকে দেড় হাত ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ডান হাত মাথার ওপর সোজা করে তোলো ও বাঁ হাত বাঁ পায়ের পাশে সোজা করে রাখো । এবার শ্বাস নিতে নিতে যে হাত পায়ের পাশে আছে সেইদিকে বেঁকে যাও । বাঁ হাত বাঁ পা ছুঁয়ে নামাও, আর ডান হাত কানের পাশ দিয়ে নিয়ে গিয়ে পা ছুঁয়ে আছে যে-হাত সেই দিকে যতটা সম্ভব বেঁকিয়ে দাও । প্রথম প্রথম হাতের কনুই ভাঁজ হয়ে যেতে পারে, পরে

অভ্যাস করলে আর অসুবিধা হবে না । হাঁটু দুটোও সোজা রাখতে হবে । আবার শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সোজা হয়ে দাঁড়াও । বাঁ হাত লম্বা করে মাথার ওপর তোলো । ডান হাত ডান পায়ের পাশে সোজা করে রাখো ।

শ্বাস নিতে নিতে ডানদিকে বেঁকে যাও ও কোমরটাকে ডানদিকে বেঁকিয়ে দাও । ডান হাত রাখো ডান পায়ের পাশে, বাঁ হাত কানের পাশ দিয়ে নিয়ে গিয়ে পা ছুঁয়ে আছে যে-হাত সেইদিকে বেঁকিয়ে দাও । শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আবার আগের অবস্থায় ফিরে এসো । এই ব্যায়ামটি একটু তাড়াতাড়ি করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে ।

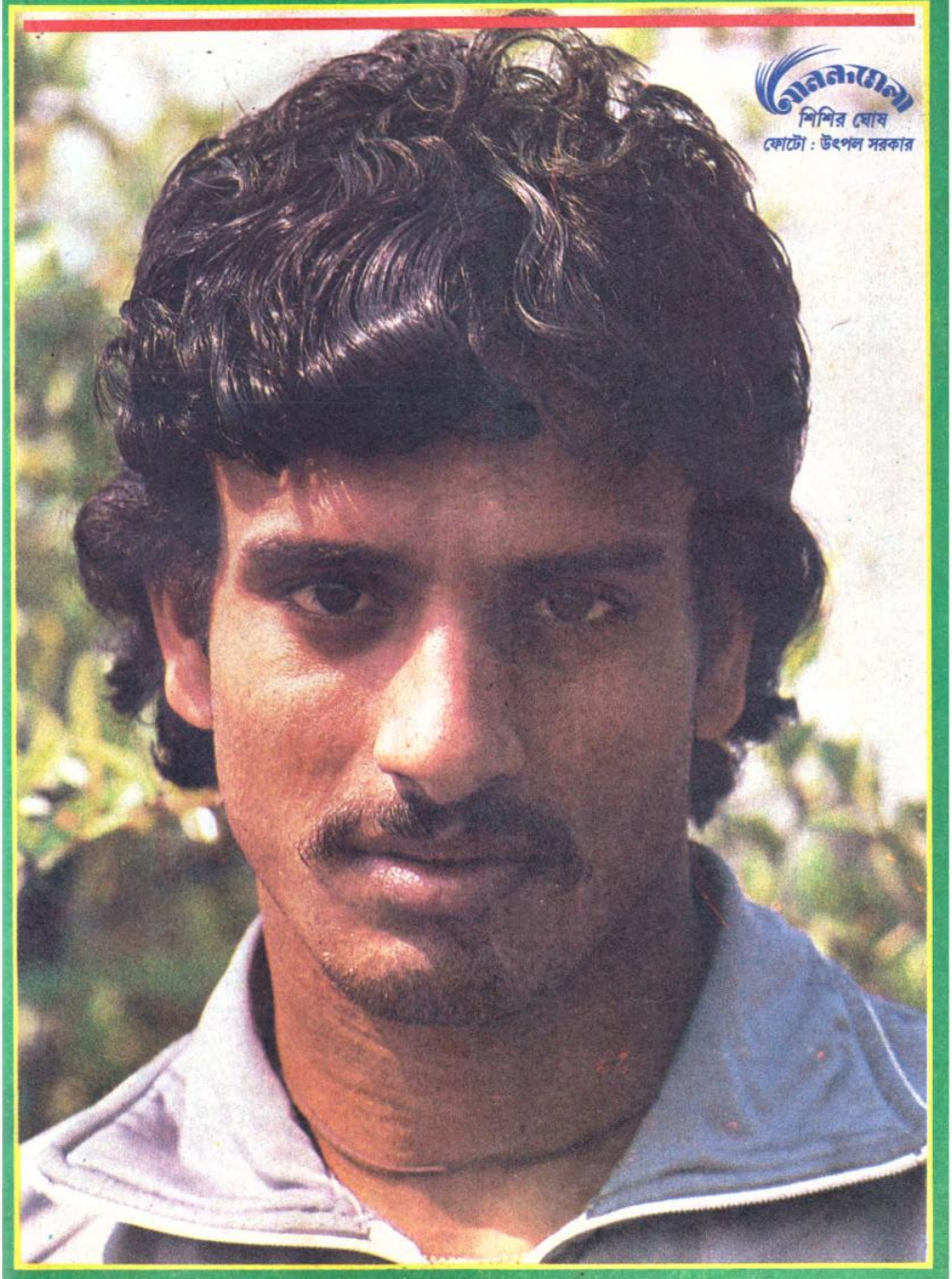

শিশির ঘোষ
ফোটো : উৎপল সরকার

বরিস বেকার

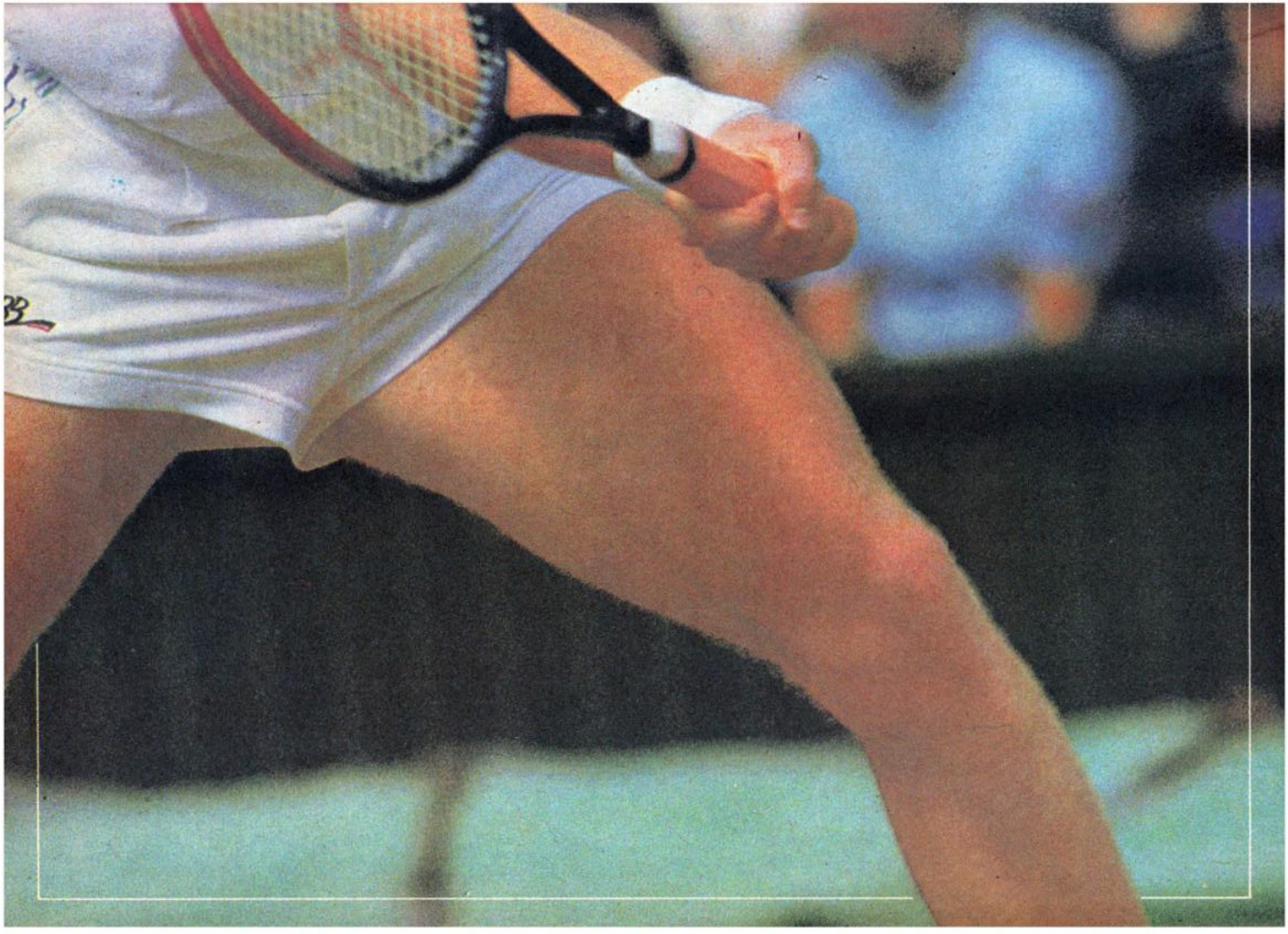

বুড়িবালামের তীরে

বীথি বসু

চাঁদিপুরের সমুদ্র
ফোটো : সত্যপ্রিয়া সরকার

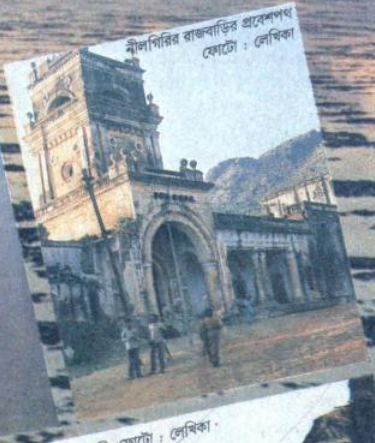

নীলগিরির রাজবাড়ির প্রবেশপথ
ফোটো : লেখিকা

চেউয়ের ফেনায় প্রকৃতির আশ্চর্য শিশু ফোটো : সোমনাথ ঘোষ

বুড়িবালামের তীরে ধীবরপল্লী ফোটো : লেখিকা

সমুদ্র আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। হঠাৎই আমরা কয়েকজন বেরিয়ে পড়লাম। পুরী বা দিঘা নয়, আমরা যাব চাঁদিপুর। আকাশে-বাতাসে ছুটির আমেজ। রোদ-ঝলমলে দিন।

কলকাতা থেকে ওড়িশার বালেশ্বরের দূরত্ব ২৩২ কিমি, বালেশ্বর থেকে ১৬ কিমি দূরে সমুদ্রসৈকত। স্টেশনে নেমে ওড়িশা সরকারের ব্যবস্থাপনাতে গাড়ির বন্দোবস্ত হয়েছিল। সকলের মনেই এক অপরিসীম স্ফূর্তির মেজাজ। কালো পিচঢালা রাস্তার দু'দিকে কেয়ার ঝাড়। নিচু জমিগুলি শুধু ধানের খেত, বাবলাগাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা। কেয়া ঝোপের ভিতর দিয়ে গাড়ি চলছে দুরন্ত গতিতে। নির্ধারিত সময়েই আমরা এসে পৌঁছলাম আমাদের বাসস্থানের সামনে। সকলেই নেমে এগিয়ে চললাম সামনের দিকে। দু'দিকে শুধু নারকেলবীথি। প্রতিটি গাছেই নম্বর দেওয়া। দীর্ঘ রাস্তা পেরিয়ে যেখানে এলাম, জায়গাটা বেশ উঁচু। নানারকম সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে আছে। এক আশ্চর্য সুন্দর প্রকৃতির রাজ্য। এত সুন্দর লাল অশোকের গুচ্ছ আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে হল না। তাড়াতাড়ি বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে রেখে চলে গেলাম সমুদ্রে। ঢালু রাস্তা দিয়ে ঝাউবীথি পেরিয়ে সমুদ্রের পাড়ে এসে পৌঁছলাম। ঢেউয়ের কী নৃত্য ! পাড়ে এসে আছাড় খেয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে। রৌদ্রঝলকে সে এক অপরূপ মহিমা। আমরা সকলেই সমুদ্রে নেমে পড়লাম। ঢেউয়ের তালে তালে স্নান করতে আমাদের যেন নেশায় পেয়ে গেল। সে দিনের মতো স্নান করে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। আমাদের খাওয়ার জায়গাটি চমৎকার। পরিপাটি করে সাজানো। ওপরে খড়ের ছাউনি, মাটির দেওয়াল। কোথায় একটা মাটির ভেজা ঘ্রাণের স্বাদ। যে ছেলেটি খাবার পরিবেশন করছে তার নাম রাজু। দেওয়ালে রাজুর বাবার অল্প বয়সের ছবি, হাতে তরোয়াল, পুষ্ট গোঁফ চোখে দীপ্তিময় চাহনি ? এখন রাজুর বাবা আশির কোঠায়। মাথায় পাগড়ি, পক্ক গোঁফ, নরম চোখের চাহনি। মুখে স্মিত হাসি। বাগানের চারদিক আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন। মাঝে-মাঝে খড়ের ছাউনি দেওয়া এক-একটি কটেজ। আধুনিক উপায়ে ভেতরগুলো সাজানো। বাগানের মধ্যে একটি বেশ বড় পুকুর, ছোট-ছোট আম ও পেয়ারা গাছগুলি জলের বুকে ছায়া ফেলেছে। রাজুদের ঘরও এখানে।

চাঁদিপুরে ফুলের সমারোহ বড় আকর্ষক। রাস্তার ধারে এক ধরনের বেগুনি রঙের ফুল খুব সুন্দর। তেমন গন্ধ নেই। রাস্তার দু'দিকে শুধু ভাটফুল।

বিকেলবেলাটা খুব যেন তাড়াতাড়ি চলে এল। আমরাও দেরি না করে সমুদ্রের দিকে এগোলাম। যে নৃত্যভঙ্গিমায় গর্বিত জলরাশি সকালবেলার সমুদ্রকে মাতিয়ে রেখেছিল, তারা এখন অন্তরালে। হাঁটছি তো হাঁটছি। মাটির উপর যেন আলপনা আঁকা। সমুদ্র এখন সরে গেছে বহু দূরে। প্রায় দুই-আড়াই মাইল দূরে। শেষ সীমানা আর দেখা যায় না। শুধু কানে ভেসে আসছে মৃদু গর্জন।

পরের দিন ভোরের আকাশের সব তারা নেভেনি। আমরা বেরিয়ে পড়লাম বুড়িবালামের উদ্দেশ্যে। সমুদ্রের পাড় দিয়ে হাঁটছি তো হাঁটছি। মায়ের দস্যি ছেলে এখন কত শান্ত। আঁচলে করে ঝিনুক শামুক তুলছি। আমাদের ছেলেমানুষিতে পেয়েছে। আবছা অন্ধকার অস্পষ্ট আলোয় আমাদের দলটি সমুদ্রের পাড় ধরে চলেছে। হঠাৎ যেন একটু আলোর আভাস, একটা ছোট্ট বিন্দু আকাশে উঁকি দিল। পলক ফেলতে-না-ফেলতে আরও বড় হয়ে উঠল। আমরা হাঁটছি, বিন্দুটাও ক্রমশ বড় হতে

মায়ের দস্যি ছেলে এখন কত শান্ত *ফোটো : সোমনাথ ঘোষ*

অর্ধেক পথ হেঁটে দেখলাম লম্বাভাবে মধ্যভাগ জাল দিয়ে ঘেরা, সেখানে জেলেরা মাছ ধরার ব্যবস্থা করে রেখেছে। জাল ডিঙিয়ে যাওয়া যাবে না। পায়ের পাতা অল্প-অল্প ভিজে গেছে। কী বিচিত্র আনন্দানুভূতি। অস্তগামী সূর্যের লাল আলো এক অপার আনন্দে আপ্লুত করে দিল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে সমুদ্র যেন এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে। আমরা ফিরে চললাম ঘরের দিকে। বারান্দায় সারি-সারি ডেকচেয়ার সাজানো। এত হেঁটেও আমরা ক্লান্তি বোধ করিনি। রাত যত বাড়তে লাগল ঢেউয়ের গর্জন তত এগিয়ে আসতে লাগল। মধ্যরাত্রিতে ঢেউয়ের আর-এক রূপ। এক অপরূপ লীলায়িত ভঙ্গিমায় হাত ধরাধরি করে এগিয়ে আসতে লাগল।

লাগল। দিগন্তবিস্তৃত এক উদ্ভাসিত মহিমাময় রূপ। বাঁ দিকে ফেলে রেখে চলেছি ঝাউবীথি। সমুদ্রকে আটকাবার জন্য বড়-বড় পাথরের চাঁই। হঠাৎ যেন ক্ষীণ রেখার মতো লঞ্চের মাস্তুল দেখতে পেলাম।

এখন সমুদ্রের পাড় থেকে অনেক উঁচুতে উঠে এসেছি। এই সেই বুড়িবালামের তীর। একদিকে সমুদ্রের কিনারা ও অন্যদিকে বুড়িবালামের সংযোগস্থল। সেই ইতিহাসবিখ্যাত জায়গা, যেখানে অগ্নিযুগের বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) ব্রিটিশের সঙ্গে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হন। কী বিরাট নদী। সারি-সারি নৌকো দাঁড়িয়ে আছে। ধীবরেরা তোড়জোড় করছে মাছ নিয়ে যাওয়ার জন্য। মাছই এদের প্রধান ব্যবসা। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। এই

মাটির দেওয়াল নিকনোর কাজে গ্রামের মেয়ে

মুহূর্তে তাদের কোনওদিকে তাকাবার অবসর নেই। নদীর উলটোদিকে ধীবরপল্লী দেখতে গেলাম। বাড়িগুলির মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। একদুয়ারি ঘর। অনেকেই জাল বুনতে ব্যস্ত, নাইলন সুতো দিয়ে জাল বুনছে। লম্বায় তিনশো হাত, চওড়াতেও বেশ উঁচু। লাইন দিয়ে সার বেঁধে এদের ঘরগুলি। একটি ঘরের কাছে গিয়ে দেখলাম, তার ভেতর স্তূপাকার সমুদ্রের মাছ। আমরা বাজার ছেড়ে বুড়িবালামকে পাশে রেখে এগিয়ে চললাম সামনের দিকে। উঁচু পিচের রাস্তা। মাঝে-মাঝে পাথরের চাঁই স্তূপীকৃত। রাস্তার পাশে গ্রামের মেয়েরা মাছ শুকোতে ব্যস্ত। কোনও-কোনও মহিলা হাতে একটা লাঠি নিয়ে বসে আছে। এটাই ওদের জীবিকা। এ ছাড়া এরা চাষবাসের কাজও করে। সারাদিনই পরিশ্রম করে। সপ্তাহে একদিন হাটে যায়।

হাটের জন্য আমরা রওনা হলাম বিকেলবেলা। ধানকাটা মাঠের ওপর ডুবে যেতে থাকা সূর্য দৌড়ে-দৌড়ে কীভাবে আমাদের নিয়ে চলল অত দীর্ঘ পথ, আমরা টেরও পেলাম না। ঘোরের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি, মাঝে-মাঝে হঠাৎ একটা কিসের আওয়াজ কানে আসতে লাগল। জানতে পারলাম বিরাট উঁচু দেওয়াল ঘেরা বিস্তৃত জায়গাটি ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা কেন্দ্র (মিসাইল উন্নয়ন প্রকল্প)।

তখন পুরোপুরি সন্ধে। আমরা হাটে পৌঁছলাম। হাটের একদিকে তরিতরকারি,

বুড়িবালামের তীরে নৌকো আর জেলেদের জাল ফোটো : সোমনাথ ঘোষ

বুড়িবালামের তীরে *ফোটো : সোমনাথ ঘোষ*

মাছ, চাল, মসলাপাতি ; আবার জামাকাপড়, গামছা ইত্যাদিও দেখলাম। এ হাট বক্সিগঞ্জের পদ্মাপারের না হলেও মিল বোধ হয় কোথাও-কোথাও আছে ঠিকই। ফেরার পথে আমরা কয়েকজন দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। পথ দীর্ঘ এবং অন্ধকারময়। পরের দিন ভোরবেলা সমুদ্রের পাড়ে বেড়াতে বেরোলাম। এবার বুড়িবালামের দিকে নয়, উলটো দিকে। হঠাৎ দেখি দু'জন ধীবর মাছ ধরে নিয়ে আসছেন। অতবড় পার্শে মাছ আগে দেখিনি। খুবই সামান্য দামে আমরা মাছগুলি কিনে নিলাম। দুপুরের খাবারের সময় ওই মাছ রান্না করে পরিবেশন করা হল।

দুপুরেই খাওয়াদাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লাম নীলগিরি পাহাড় দেখতে। বালেশ্বরের নীলগিরি পাহাড় দেখার মতো জায়গা। ছোটদা একটা গাড়ির ব্যবস্থা করলেন। শহর ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ি চলল দ্রুত বেগে। রাস্তার দু'দিকে শুধু মাঠ। সদ্য ধানকাটা হয়েছে। পাশে বাড়িগুলি মাটির। কেউ-কেউ উঠানে উনুন পেতে রান্না করছে। কেউ-বা ধানসেদ্ধ করছে। ছোট বাচ্চাগুলি আদুড় গায়েই ঘোরাফেরা করছে। দূরে হালকা পাহাড়ের রেখা দেখা যাচ্ছে। গাড়ির গতির সঙ্গে পাহাড়ও যেন ছুটছে। অবশেষে পাহাড়ের কোলে আমাদের গাড়ি এসে থামল। লালমাটির ওপর দিয়ে হেঁটে পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। অনেক জায়গায় পাহাড় কেটে রাস্তা করা হয়েছে। এক জায়গায় পাহাড়ের কোলে শিবের মন্দির। মন্দিরের গায়ে ঝরনার জল পাথরের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে পড়ছে। কোথা থেকে যে আসছে এ জল তা বোঝ যায় না। কী স্বচ্ছ পরিষ্কার জল, আঁজলা ভরে জল পান করেও যেন তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। পা টিপে টিপে মসৃণ পাথর কাটা রাস্তা দিয়ে নামলাম নীচে। অনেকেই পুজো দিতে এসেছে এখানে। কারও হাতে গোটা নারকেল, কারও হাতে কলা-নকুলদানা ফুল-বেলপাতা। আরও কিছুটা উপরে উঠলে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর মন্দির। তবে এই মন্দিরটি কয়েক ধাপ নিচুতে। এক অপূর্ব মনোরম দৃশ্য। পাহাড়ের কোল কেটে তৈরি দেবতার মন্দিরের সামনে বহু দর্শনার্থী দাঁড়িয়ে আছে।

সূর্য হেলে পড়তে শুরু করছে। অস্তগামী সূর্যের ছটা আমাদের ফেরার পথকে আলোকিত করলেও বড় তীব্রভাবে মুখের উপর এসে পড়েছিল। আমাদের পাশে এই পাহাড়ি অঞ্চলের পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা কাঁধে, কেউ-বা বাঁকে করে জঙ্গলের কাঠ নিয়ে চলেছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, এই কাঠ ওরা বিক্রিও করে, আবার নিজেদের প্রয়োজনে জ্বালানির কাজ করে। কথা বলতে-বলতে সমতলে নেমে এলাম। বেলাশেষের আলোয় নীলগিরি মহারাজের স্থাপিত চণ্ডীমন্দির দেখলাম। বাইরের দেওয়ালের গায়ে যে পুরাণের ছবিগুলি আঁকা সেগুলি অপূর্ব। কিছু দূর গিয়ে নীলগিরি মহারাজের প্রাসাদ দেখলাম। স্থানীয় পুরোহিতের কাছ থেকে শোনা গেল, ইংরেজরা মহারাজের কাছ থেকে প্রাসাদটি অধিকার করে। এখন শুধু ধ্বংসাবশেষ। দু-এক ঘর ভাড়াটে। প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে ডান দিকে পুজোর দালান বা মঞ্চ। এখানে বারোয়ারি পুজো হয়, আবার থিয়েটার-যাত্রাও হয়। অলিন্দ পেরিয়ে ভেতর-বাড়িতে প্রবেশ করলাম। চারদিকে প্রশস্ত বারান্দা। মাঝখানের উঠোনের মধ্যে এক উঁচু জায়গা, সেখানে রাজবাড়ির প্রতিদিনের গৃহস্থালির কাজ হত। এখন দেওয়ালের ইট খুলে গেছে। বালি ঝরে পড়ছে। রাজা এসে প্রতিদিন সেখানে বসতেন, জায়গাটি গোল ও তিনদিকে খোলা। বাঁ দিকে মহারাজের স্থাপিত রাধাকৃষ্ণের মন্দির।

এখন ঘোর অন্ধকার, রাত্রি। রাত্রির অন্ধকারেও বোগেনভেলিয়ার সৌন্দর্যে পথটি আলোকিত হয়ে ছিল। নারকেলবীথির প্রতিটি গাছে বৈদ্যুতিক আলো থাকায় পথটি অপরূপ। সদ্য-ফোটা আমের বোলের মনমাতানো পালন-করা গন্ধ। এখান থেকেই ঢেউয়ের গর্জন কানে ভেসে আসছে। এই শব্দ মানুষকে শুধু টানে অনুভূতিময় এক অজানা আনন্দে। আজ কারও মুখে কোনও কথা নেই।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই ফেরার প্রস্তুতি। এ ক'দিন যাদের সঙ্গে কাটিয়ে গেলাম, সকলেই গাড়ির কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। মনের মধ্যে অনুরণিত হচ্ছে : যাব না যাব না যাব না ঘরে/বাহির করেছে পাগল মোরে।

এখন থেকে দশ বছর পর ওদের কথা ভাবুন।

ভরা স্বাস্থ্যের ঝলমলে এক ছবি। দেখে আপনি গর্ববোধ না ক'রে পারবেন না। কারণ ওদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য মা হিসেবে এখন থেকেই আপনি ওদের জন্য সবকিছু ক'রে চলেছেন।

আপনার বুকভরা স্নেহ ভালবাসার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো, ওদের সঠিক পুষ্টি বিধান।

"হ্যাঁ, হরলিকসের পুষ্টি। বাড়ন্ত বয়সের প্রকৃত পুষ্টি। সুস্বাস্থ্য ও সর্ব্বাঙগীন বিকাশের জন্য হরলিকসে আছে অতি প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি উপাদান –প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল ও কার্বোহাইড্রেট।

তার সঙ্গে আছে, শক্ত দাঁত ও মজবুত হাড়ের জন্য অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম।

তাইতো, বাড়ন্ত বয়সের বাচ্চাদের স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তির সর্বাঙগীণ বিকাশের জন্য চাই হরলিক্স।"

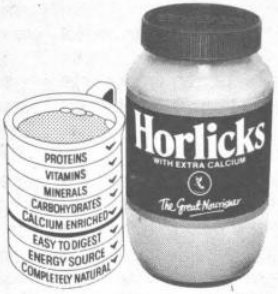

পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়

HTA 6223 BEN

ধারাবাহিক উপন্যাস

বিন্নির খই লাল বাতাসা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবা ফরাসে বসার আগে তাকে ডেকে পাঠালেন। সে মহানামদাকে বলল, "যাচ্ছি।"

কিন্তু যাচ্ছি বললেই তো যাওয়া যায় না। যদি সেই দণ্ডে উড়োজাহাজটা উড়তে শুরু করে।

কিন্তু বাবা এত বারবার ডেকে পাঠালে সে বসেই বা থাকে কী করে! বাবার কাছে গেলে বললেন, "কাল গেছিলি যাত্রা দেখতে?"

সে ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

"কোথায় বসেছিলি, দেখলাম না তো!"

সে বুঝি ধরা পড়ে গেল! ঢোক গিলে বলল, "কেন, রক্ষিতজ্যাঠার পাশে।" ডাহা মিথ্যে কথা বলতে তার মুখে আটকাল না।

বাবা কাঠের বাক্স বার করে রেজগি পয়সা গুনতে-গুনতে বললেন, "যা গণ্ডগোল, ধস্তাধস্তি, কোথায় তুই, খুঁজছিলাম। যাক রক্ষিতদাদার সঙ্গে ছিলি, রক্ষা।"

হাতিটাকে মেরে ফেলা হবে কি হবে না, বাবা হয়তো জানেন। এত বড় আমলা জানবেন না হয় না। খবরটা কতদূর সত্যি জানার আগ্রহে সে ব্যাকুল হয়ে পড়ছে। বলল, "বাবা, লক্ষ্মীকে নাকি মেরে ফেলা হবে!"

বাবা একটা লাল রঙের জাবদা খাতা খুলে লিখলেন তখন, 'হরি সহায়'। তারপর খাতাটা কপালে ঠেকিয়ে বাচ্চুর দিকে তাকালেন। বললেন, "তা ছাড়া কী উপায়! যা গেল! সর্বজ্ঞের আশ্রম থেকে শেকল ছিঁড়ে চলে এল। রাস্তায় ঘরবাড়ি ভেঙেছে। লোকের শস্য নষ্ট করেছে। শুঁড় তুলে ত্রাহি চিৎকার। সে দৃশ্য দেখা যায় না। কখন আবার খেপে যাবে কে জানে! ওসব ভেবে তোমার লাভ নেই। দ্যাখোগে, দাদারা উঠল কি না। বেলা হয়েছে। ডেকে দাওগে। রান্নাবাড়ি থেকে দু'বার খবর পাঠিয়েছে। কাজের বাড়ি, সবাইকে বুঝেসুঝে চলতে হয়!"

সে দৌড়ে দাদাদের ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে ছুট। তার যে উড়োজাহাজ উড়ে আসবে কথা আছে।

এসে যেতেও পারে।

যদি আসে, তবে কোথায় পড়বে, যদি কারও হাতে পড়ে যায় এই দুশ্চিন্তায় সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। তারপর কেন যে ভাবল, ঠিক পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রাসাদ-সংলগ্ন কিছু ধুতুরা ফুলের গাছ, এবং জায়গাটা সামান্য জংলা। যদি উড়ে এসে সেখানে পড়ে থাকে! এমন সব সংশয়ে সামনের মাঠে নেমে গেল। ঘাসের উপর দু-একটা কাগজের টুকরো পড়ে আছে। সে সেগুলি তুলে আবার ফেলে দিল। উড়োজাহাজ নয়, কিংবা কাগজে কিছু তেমন সঙ্কেত নেই। ধুতুরা ফুলের জঙ্গলটার দিকে হেঁটে গেল। এমনভাবে হাঁটছে যেন, সে ফুল তুলতে যাচ্ছে।

ঝোপজঙ্গলে যদি আটকে থাকে।

থাকতেই পারে। ইন্দু তো আর সে বারান্দায় বসে আছে কি না দেখতে পায় না। ছাদের কোনও গুপ্ত স্থান থেকে হয়তো উড়োজাহাজটাকে ভাসিয়ে দেয়। সে তো নিশ্চিন্ত— বাচ্চু বেঞ্চিতে বসে আছে। তার সঙ্কেত না পাওয়া পর্যন্ত সে সেখান থেকে নড়বে না।

আচ্ছা ইন্দু বল, তোর কাণ্ডজ্ঞান হবে না। এক জায়গায় চুপচাপ বসে থাকলে লোকের মনে সন্দেহ জাগবে না।

সে ডালপালা ফাঁক করে খুঁজছে। জংলার ভিতরে ঢুকে গেছে। হালকা কাগজ, ডালপালায় আটকে থাকতে পারে। সে পাগলের মতো তন্ন-তন্ন করে খুঁজছে।

দাদারা রান্নাবাড়ির দিকে যাচ্ছে। হঠাৎ তারা দেখল, বাচ্চু জঙ্গলের মধ্যে আঁতিপাঁতি করে কী খুঁজছে।

"এই বাচ্চু, আমরা খেতে যাচ্ছি। কী করছিস ওখানে? খেতে চল।"

বাচ্চু জঙ্গল থেকেই মুখ বাড়িয়ে বলল, "তোরা যা। আমি যাচ্ছি।"

বাচ্চু কী যে করে। এখনই খেয়ে না নিলে, কাজের বাড়িতে কে কার খোঁজ রাখে। তা ছাড়া দাদারা যদি জানতে চায়, বাচ্চু তুই জঙ্গলে ঢুকে বসে ছিলি কেন রে! তা হলে কী বলবে।

বলতে পারে ধুতুরার গোটা খুঁজছিলাম। ধুতুরা গোটার যেমন বিষ, তেমনই এক বয়সে তাদের কাছে খেলার সামগ্রী। অবিশ্বাস করবে না দাদারা।

সে বুঝল, বসে থেকে লাভ নেই। খেয়ে নেওয়া দরকার। কোনও বিপদ না হয়, খুব বিচলিত হয়ে পড়াও ঠিক না। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। সে রান্নাবাড়ি থেকে খেয়ে এক ছুট। আবার বারান্দায়। তখনই ডাক পড়ল ফের বাচ্চুর। এই রে, তবে কি উড়োজাহাজটা কারও হাতে পড়ে গেছে। বাবার কাছে এনে দিয়েছে। কিন্তু তারা এখন বিন্নির খই, লাল বাতাসা— বাবা বুঝবেন কী করে! হাতের লেখা দেখে যদি টের পান— অকারণে এভাবে ত্রাসের মধ্যে পড়ে যেতে হয় এই প্রথম টের পেল সে।

বাবা বললেন, "বোসো।"

সে বাবার পাশে বসল। পিছনে বিশাল কাঠের র‍্যাক। রাশি-রাশি জাবদা খাতা জমা। বারান্দায় লোকজন বসে আছে। এক-একজন করে ডাকা হয়, কাজ সেরে চলে যায় তারা। ঘরে ঢুকেই বাবাকে মাথা নুয়ে অভিবাদন করার পর আজ্ঞে, জি, অথবা হুজুর বাহাদুরের কী হুকুম হয়েছে জানতে চায়। এসব কারণে তার বাবা যে খুবই সম্মানীয় ব্যক্তি সে বুঝতে পারে। তার মধ্যে যতই উচাটন থাকুক, এমন একজন দাপুটে মানুষের হুকুমে না বসেই বা কী করে! বাবার

বোধ হয় একপ্রস্থ কাজ সারা। কিছুটা ফুরসত মিলেছে।

"বাচ্চু, তুমি কিন্তু লক্ষ্মীর কাছে যাবে না। কেউ যাচ্ছে না। লোক দেখলেই খেপে যায়। আমরা তো সেদিন কাছারিবাড়ির দরজা বন্ধ করে বসে ছিলাম আতঙ্কে।"

বাচ্চু বলল, "আমি যাই-ই না।"

"না যাবে না। তবে লক্ষ্মী ইন্দুকে পছন্দ করে। ইন্দুকে পছন্দ করে বলেই তোমাকেও করবে ভেবো না। না-ও করতে পারে।"

বাচ্চু আর না বলে পারল না, "কবে হাতিটাকে মেরে ফেলা হবে বাবা?"

"তা তো জানি না।"

"দেবীপক্ষেই মেরে ফেলবে শুনছি।"

"কে বলল তোমাকে দেবীপক্ষে? মেরে ফেলা হবে? আমি তো বিন্দুবিসর্গ জানি না।"

বাবা জানেন না, সে বিশ্বাস করতে পারে না। কিংবা বাবা যদি খুবই গোপনে কাজটা হাসিল করা হবে এমন জেনে তাকে এড়িয়ে যান? যেতেই পারেন। বাবুমশাই ডাকলেই তো আজ্ঞে যাই হুজুর। বারান্দার সামনে লন, লন পার হয়ে বাবুমশাইয়ের আটচালা বৈঠকখানা। বারান্দায় ইজিচেয়ার, বেতের চেয়ার নীল রঙের— ঘরের ভিতর টানা পাংখা ঝোলানো বিশাল ফরাস, তাকিয়া, পাট-ভাঙা সব। ইন্দু তাকে নিয়ে একবার সেবারে ঘরটায় ঢুকেছিল, কী মনোরম ঘ্রাণ ঘরে। আর বড়-বড় জানালা। শনের মোটা চাল। ঘর নাকি এতে গরমে ঠাণ্ডা থাকে, ঠাণ্ডায় গরম থাকে। বিলাস সামগ্রী বলতে নীল রঙের দুটো লণ্ঠন এবং একটা ডে-লাইট জ্বালানো হত রাতে। এবারে এসে, সে একদিনও বাবুমশাইকে বৈঠকখানায় বসতে দেখেনি। বাঘের মতো তেজ দেখেছে মানুষটার। এখন কেমন ক্ষীণস্বরে কথা বলেন। এবারে সে বৈঠকখানায় কাউকে রাত্রে আলো জ্বালাতেও দেখেনি। দরজা-জানালা বন্ধ। কেবল সকালবেলায় ফরাসদার দরজা খুলে ঝেড়েপুঁছে আবার ঘর বন্ধ করে দেয়।

বাচ্চুর মনে হল, বাবা সব জানেন। সে নিজেও জানে— কারণ ইন্দু তার এত বড় অসময়ে কখনও মিছে কথা বলতে পারে না। তবে বাবা বললে একশো ভাগ সত্যি মনে হত তার। বাবা তো আর দীক্ষা নেননি। দীক্ষা নিলে মানুষ জাঁতাকলে পড়ে যায় এমন মনে হল তার।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বাবা ফের বললেন, "কে বলল দেবীপক্ষেই লক্ষ্মীকে মেরে ফেলা হবে?"

সে আমতা-আমতা করতে থাকল।

বাবার মুখেও কেমন দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠছে। তবে কি গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল! বাবার এমন সংশয়ের মুখ বাচ্চু কখনও দেখেনি। সে বাবাকে সমীহ করে— কিন্তু ভয় পায় না। সে আজ তার বাবাকে দেখেও ভয় পেয়ে গেল। জমিদারবাড়ির খুনখারাবি নাকি কাকপক্ষীও টের পায় না। কার কাছে যেন সে শুনেছে। সে আর বসে থাকতে পারল না। বাবার মুখ দেখে আর-এক আতঙ্কে পড়ে গেছে। যদি তাকে বাবার পরে বাবুমশাই জেরা করতে শুরু করেন। সে প্রায় দৌড়ে পালাবার মতো বারান্দায় আসতেই দেখল— ভেসে আসছে। বুক ধড়াস করে উঠল। কী লেখা থাকবে কে জানে!

সে উড়োজাহাজটা পকেটে নিয়ে আবার হলুদ জমিতে হাজির।

টুপ করে বাচ্চু হলুদ গাছের ভিতর ডুবে গেল। তবে সেবারের মতো সবটা ঢেকে যায় না। মাথার কিছুটা গাছের উপর ভেসে থাকে। সে আরও নিচু হয়ে চিঠিটা পড়ল। বিন্নির খই লিখেছে,লাল বাতাসা, আজ হাতিটাকে পবনদা নদীতে চান করাতে নিয়ে যাবে। জানি না কপালে কী আছে। লক্ষ্মী পাগলামি করতেই পারে। তুই কাছে থাকলে সাহস পাবে। পাগলামি নাও করতে পারে। অন্দরমহলের বাইরে দিনের বেলায় বের হতে পারি না রে! আমার ভয় করছে। তুই কিন্তু সারা দিন হাতিটাকে পাহারা দিবি। পারিস তো লক্ষ্মীর গায়ে ফিনাইল ঢেলে দিস। শেকলে বাঁধা থেকে ঘা হয়ে গেছে। কতটা পথ যাব, লক্ষ্মী বসে গেলে সব যাবে।

পায়ে ঘা! কই কাল তো ইন্দু তাকে কিছু বলেনি। আসলে ইন্দু জানে না, কী হতে যাচ্ছে। ইন্দুর মাথাটাও ঠিক থাকতে না পারে।

পরে ইন্দু লিখেছে, বিবেক সাহার দোকানে গিয়ে আমার নাম বললেই দেবে। খুড়ামশাইয়ের নামও বলতে পারিস। তুই খুড়ামশাইয়ের ছেলে বলবি। ফিনাইল গায়ে দিলে জানিস তো মাছি বসতে পারে না। ঘায়ে মাছিরা ডিম পাড়ে। পোকা হয়। ঘা শুকিয়ে আসছে। কাল এত উত্তেজনার মধ্যে ছিলাম— ফিনাইল ঢেলে দিতে ভুলে গেছি। বোতলটা নিতেও ভুলে গেছিলাম। সব তোকে খুলে বলতেও পারিনি।

সে আর-এক দণ্ড দেরি করল না। যেন গিয়ে সে দেখতে পাবে লক্ষ্মীকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। লক্ষ্মীর জন্য তারও যে কেমন এক টান ধরে গেছে। সে আর লক্ষ্মীকে ভয় পায় না। কাছে যেতেই লক্ষ্মী শুঁড় তুলে তাকে সেলাম দিল। যেন কোনও অন্তর্গত অভিলাষ শুঁড় তুলে তাকে জানাচ্ছে কিংবা ইন্দুর বন্ধু ভেবে খেলা শুরু করে দিতে পারে। সে কাছে যেতেই লক্ষ্মী এগিয়ে এল। শুঁড়ে হাত দিতেই শরীরে তার আশ্চর্য শিহরন খেলে গেল। নিরীহ অবোধ হাতিটারও রক্ষা নেই সর্বজ্ঞের কোপ থেকে। ভেতরে সেও ইন্দুর মতো জেদি হয়ে যাচ্ছে। পিছনের পা দেখল কাছে বসে। ঘা শুকায়নি ভালমতো। মাছি ভনভন করছে। সে দৌড়ে গিয়ে বিবেক সাহাকে বলতেই এক বোতল ফিনাইল পেয়ে গেল। কিছুটা ঢেলে দিতেই মাছিগুলি উড়ে গেল। দুটো-চারটে পোকা বের হয়ে এল ঘা থেকে। ওর এতটুকু ঘৃণা নেই। হাতিটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে। আরাম পেলে এটা হয়।

বাচ্চু সারা সকাল একবার কাছারিবাড়ি একবার পিলখানা— কখন চান করাতে নিয়ে যাবে সে জানে না। চান করাতে নিয়ে গেলে কী হয় জানে না। ইন্দু বিপদের সঙ্কেত না পেলে এভাবে তার কাছে উড়োজাহাজ পাঠাত না। জরুরি বলেই উড়োজাহাজে খবর পাঠিয়েছে। সারাদিন পাহারা দিবি। কী হচ্ছে না হচ্ছে উড়োজাহাজে খবর পাঠাবি। দক্ষিণের জানালা খোলা থাকবে।

অবাক, পবন মাহুত হাতিটার কাছেই গেল না। একবার মাত্র হাতিটাকে খেতে দেওয়ার জন্য গেছে। কলাগাছ আর মান্দারগাছের ডাল ঠেলে দিয়ে এসেছে। ঠাকুরদালানে অঞ্জলি দেবার সময় গেলে সে দেখতে পেল অন্দরমহলের সবার সঙ্গে ইন্দু এসেছে অঞ্জলি দিতে। জেঠিমাকে দেখে সে টুক করে একটা প্রণামও সেরে ফেলল।

বাবা, ঠাকুরদালানের সিঁড়িতে নামাবলী গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জেঠিমা বোধ হয় তাকে চিনতে পারেনি। না পারারই কথা। সেবারে আর এবারে কত যে তফাত!

বাবাই বললেন, "বউঠান, বাচ্চু, চিনতে পারছেন না?"

"অ মা, তুই কত বড় হয়ে গেছিস!"

এ-সময় ইন্দু ভিড়ের ভিতর থেকে এগিয়ে এল। সবার সামনে বাচ্চুর সঙ্গে কথা বললে দোষের না। সে বলল, "তুই বাচ্চু!" কত যেন অবাক হয়ে গেছে ইন্দু। চোখে-মুখে কপট বিস্ময়।

বাচ্চু ফিসফিস করে বলল, "জানিস, হাতিটাকে চান করাতে নিয়ে যায়নি।"

"চুপ।"

ঠাকুরদালানের এক কোনায় পড়ে আছে ঝুনো সব নারকেল। ইন্দু দুটো নারকেল হাতে দিয়ে বলল, "লক্ষ্মীকে দিবি। আজ অষ্টমী পূজা, ভাল-মন্দ সবার খেতে ইচ্ছে হয়। কী, পারবি তো, ভয়ে আবার পালাবি না তো?" এর পর ইন্দু মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, "মা, আমি যাব বাচ্চুর সঙ্গে। লক্ষ্মীকে নারকেল খাইয়ে চলে আসব।"

"যাও। অন্নদা সঙ্গে যাক।"

বাবুমশাই বললেন, "পদ্মাবতী, তোমারও দেখছি মাথাখারাপ। কোথায় যাবে। কে যাবে! বাচ্চু, তুই নারকেল দুটো নিয়ে যা। লক্ষ্মীকে খেতে দিস। তিনি অন্তর্যামী, ক্ষুব্ধ হতে পারেন।"

ইন্দু গুম হয়ে গেল। পূজার দিনেও তাকে এভাবে নজরবন্দী করে রাখছে! সে নারকেলজোড়া বাচ্চুর হাতে তুলে দেওয়ার সময় কানে কানে বলল, "সাঁঝবেলায় উড়োজাহাজ যাবে। লক্ষ রাখিস।"

॥ ৩১ ॥

অষ্টমী নবমী দশমী পর-পর উড়োজাহাজ ভেসে আসতে থাকল। উড়োজাহাজে এক-একদিন এক-একরকমের ফর্দ থাকত। উড়োজাহাজে এখন ইন্দু শুধু ফর্দ পাঠায়। কী কিনতে হবে, কোথায় কী রাখতে হবে, সঙ্কেতে জানিয়ে দেয়। সে ফর্দমতো সব সংগ্রহ করে গোবরার জঙ্গলে লুকিয়ে রাখছে।

এক ডজন মোমবাতি। একটা দেশলাই। খবর আসত, পোড়োবাড়িটা তো জানিস, ওখানে লুকিয়ে রাখবি। ফর্দমতো জিনিস কিনবি। আমার নামে খুড়ামশাইয়ের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিবি।

এভাবে একটা কাঠের বাক্স গোবরার জঙ্গলে। ভিতরে লাল বেনারসি। আবার সঙ্কেত। একআঁটি কঞ্চি, কঞ্চির ডগায় কাঁঠালের আঠা। গোবরার জঙ্গলে ঘাস-পাতা দিয়ে ঢেকে রাখবি। পাঁচিল পার করে দেব আমি।

একটা ড্রাম। ড্রামে মুড়ি, লাড্ডু, বিন্নির খই, লাল বাতাসা।

শুধু নিশীথে ইন্দু পাঁচিল টপকে নেমে আসত। কখনও শাড়ি পরে, কখনও ফ্রক গায়ে। শাড়ি পরলে একেবারে দেবী-চৌধুরানি। চুল খোলা। হাত খালি। শস্তা তাঁতের শাড়ি পরনে। ফুল-হাতা ব্লাউজ গায়ে। পাঁচিল থেকে ফ্রক পরে নেমে এলে মনে হত ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ। শুধু কোমরে তরবারি ঝুলছে না, ইন্দু তার সঙ্গে নদীর বিশাল চরে—প্রায় তিন-চার ক্রোশ হবে হাতির পিঠে ঘুরে বেড়াত, হাতিটা ছুটছে দুরন্ত গতিতে, আর হাতির পিঠে ইন্দু দাঁড়িয়ে আছে প্রতিমার মতো। হেলছে না, দুলছে না। দেবীদর্শনের রিহার্সাল কি না কে জানে। গভীর রাতে খোলা আকাশের নীচে এভাবে হাতি নিয়ে ছুটে বেড়ানোর আর কী কারণ থাকতে পারে সে বোঝে না। ইন্দু কত সহজে হাতির পিঠে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, আর তার ভয়ে তখন মাথা 'বনবন' করে। ইন্দু তো কিছু খুলে বলে না।

"আরে, ইন্দু, এগুলো দিয়ে কী হবে ?" কাঁঠালের আঠার কঞ্চি তুলে প্রশ্ন করলেই ধমক, "রাখ তো। কেবল এটা কী হবে, ওটা কী হবে। এই কাসকেটটা রাখ। আমার গয়না।"

"গয়না !" বাচ্চু চিৎকার করে উঠল ? "আরে তুই কি পাগল হয়ে গেলি ! গয়না দিয়ে কী হবে ?"

"কী হবে, তোমার মাথা হবে। দেবীর গায়ে অলঙ্কার লাগে না !" বাচ্চু অবাক, অন্ধকারেও আলো ঠিকরে বের হচ্ছে। জড়োয়া সেট। মাথায় মুকুট, চুর, কঙ্কন, আরও কত কী !

কোনও রাতে, পাঁচিলের ওপাশ থেকে হাঁক আসে—"লাল বাতাসা হাজির !"

"হাজির।"

"এত রাতে কে জাগে ?"

"রাক্ষসের ভাই খোক্কস জাগে।" বাচ্চু পাঁচিলের ওপাশে বসে কৃত্রিম ভয় দেখাবার চেষ্টা করলে—ইন্দুর কথা, "ঠিক বললি না।"

"কী ঠিক বললাম না।"

"বল বিন্নির খই জাগে।"

"বলব না।"

"তোমার ঘাড় বলবে।"

পাঁচিলের পলস্তারা খসা। ইটের খাঁজে পা রেখে বাচ্চু ওপাশে ঝুলে দেখে।

ইন্দু বসে-বসে কী একটা বড় আঁটি বাঁধছে।

"আমি নেমে আসব ?" বাচ্চু পাঁচিলের ওপর থেকে বলল।

ইন্দু উপরের দিকে তাকিয়েই বলে, "নামতে হবে না। ওদিকে নেমে যা। দড়িটা ধর।"

একটা লম্বা দড়ি তার দিকে ছুঁড়ে দিলে খপ করে দড়ির মাথাটা ধরে ফেলার চেষ্টা করে। পারে না। আবছা অন্ধকারে ঠিক বোঝাও যায় না। সে ধরতে না পারায় ইন্দু খেপে গেল। বলল, "ঠিক আছে নেমে যাব ওপাশে।" তারপর সে নিজেই পাঁচিলের মাথায় হাতে দড়ি নিয়ে উঠে গেল। শেষে লাফ দিয়ে পাঁচিলের ওপাশে নেমে বলল, "ধর।"

সে ধরে আছে।

ইন্দু লাফিয়ে আবার পাঁচিলে উঠে গেল। শেষে লাফ দিয়ে নেমে বলল, "ভাল করে ধরিস। কী, ধরেছিস তো !"

"ধরলাম তো।"

"ঝুঁকে আবার পড়ে যাস না। শক্ত করে ধর।"

"ধুস। এক কথা বারবার। বলছি শক্ত করে ধরেছি।"

"ছেড়ে দিলাম।"

আর সঙ্গে-সঙ্গে বাচ্চু হেঁচড়ে পাঁচিলের গায়ে ঠেসে গেল। কী ওজন ! সে হাঁপাচ্ছে। "দড়িতে কী ঝোলালি ? টেনে রাখতে পারছি না।"

ইন্দু কাঁধ ঠেকিয়ে রেখেছে। তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। পাঁচিলটা হাতে নাগাল পায় না। ইন্দু কী করবে ঠিক করতে না পেরে বলল, "শক্ত করে টেনে ধর।" বলেই পাঁচিলে উঠে কুয়োয় বালতি টানার মতো ভারী পাকা বাঁশের লাঠিগুলি তুলে নিল।

এ কী ! আট-দশটা পাকা বাঁশের লাঠি। বাচ্চু ঘাবড়ে গেল, হাত দেড়-দুই লম্বা। কোনও প্রশ্ন করাও যাচ্ছে না। কিছু বললেই খেঁকিয়ে উঠছে ইন্দু। সে আর ইন্দু সুপারির বাগানে বসে লাঠির মাথায় কাঁঠালের আঠায় মোড়া কঞ্চিগুলি বাঁধতে থাকে। কী যে হয়েছে ইন্দুর ! এত উত্তেজনার মধ্যে বোধ হয় ইন্দু মাথা ঠিক রাখতে পারে না।

বাচ্চু না বলে পারে না, "এগুলো কী মশাল বানাচ্ছিস !"

"কিছু বুঝতে পারিস না ! তুই কী রে !"

এই এক কথা ইন্দুর—কেমন তাকে সব বিষয়েই উপেক্ষা করার স্বভাব ইন্দুর। সে অবশ্য জানে কাঁঠালের আঠা ন্যাকড়ায় পেঁচিয়ে লাঠির ডগায় বেঁধে নিলে মশালের মতো জ্বলতে থাকে। এক-একটা মশাল সারা রাত জ্বলেও শেষ হয় না। তা দেবী কি হাতে মশাল নিয়ে যাত্রা করবেন ? বাচ্চু প্রশ্ন না করে পারে না, "তোর হাতে বুঝি মশাল রাখবি ?"

"দ্যাখ কী রাখি। ধর শঙ্খটা। কাঠের বাক্সে ভরে নে।"

তার ফলে আশ্চর্য নীরবতা। গভীর জ্যোৎস্নায় গোপনে এই বের হয়ে আসার মধ্যেও থাকে ভারী মজা। দু'জনে যতক্ষণ পারে হাতের কাজ সেরে রাখছে। বাচ্চু শুধু ইন্দু যা বলছে করে যাচ্ছে। মাথার উপর জোনাকিরা জ্বলে। শেয়াল ডাকে দূরে। "ভাল করে টেনে বাঁধ। খুলে যায় না যেন।"

ওরা কথাও বলে খুব নিভৃতে। নদী থেকে হাওয়া উঠে আসে। বাদুড় উড়ে যায়। টুপটাপ সুপারির ফল ঝরে পড়ে। কখনও ঘাসের ভিতর থেকে উঠে আসে কীটপতঙ্গের আওয়াজ—দূরে কোথাও ধর্মীয় আওয়াজ ওঠে। রাইপুরা পরাপরদি পর-পর সব গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনও কোনও গ্রাম থেকে ধ্বনি ওঠে, বন্দে মাতরম। কোনও-কোনও রাতে মশার কামড়ে হাত-পা ফুলে যায়।

কখনও নদীর ওপারে মিছিল ভেসে যায়। মিছিলে নানারকম স্লোগান ওঠে। এই যখন চলছিল, তখন ধর্মের আর-এক গুরুঠাকুর বাবুমশাইয়ের মাথায় ভর করেছেন।

ইন্দু কেমন বিচলিত গলায় বলে, "জানি না কী হবে। আমরা কালই বের হচ্ছি। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ নেব। ওটা আমার শরীরে, মুখে ঠিকমতো জ্বালিয়ে রাখতে না পারলে তুইও মরবি, আমিও মরব।

"কে কে যাব ?"

"আমি, তুই, লক্ষ্মী।"

"টর্চ জ্বালিয়ে রাখলে ধরা পড়ে যাব না ?"

"ধরা পড়বি মানে ?"

"বা রে, লোকজন ছুটে আসবে না ! তোর শরীরে টর্চের ফোকাস ফেললে হাতির পিঠে তুই আছিস লোকে বুঝতে পারবে না। বাবুমশাইকে খবর দেবে ইন্দুদিদি হাতি নিয়ে চলে গেছে। লোকজন ঘিরে ফেললে কী করবি ?"

ইন্দুকে কেমন চিন্তিত দেখাল। তারপর বলল, "মনে তো হয় না তাড়া করবে। ঘিরে ফেলবে, তা হলেই হয়েছে। দেখা যাক।" বলে সে ফের কী খুঁজতে থাকল। (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

রোভার্সের রয়

বোলার বদল হতেই ঝটপট দুটো উইকেট পড়ে গেল !

স্ট্যানথর্প ইউনাইটেডকে সাহায্য করতে রোভার্স ক্যাভেলিয়ার্সের সঙ্গে কয়েকটি একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ খেলছিল। ফাস্ট বোলার মিকারের বলে ওয়ালেস আহত হয়েছে। এখন রয় আর ন্যাট গসডেন টিকে থাকার জন্যে লড়ছে !

আহ্, খাসা মার, রয় ! স্লিপে ঠেলে দিয়েছে !

আর-এক রান ! চমৎকার জুটি তৈরি হচ্ছে !

ইয়ায়ায়া !

ক্যাভেলিয়ার্স...কী হচ্ছে ! বুড়ি ঠাকুমা'র মতো ফিল্ডিং করছ ?

মনে হয় মিকার মেজাজ হারাচ্ছে। এটা রোভার্সের পক্ষে ভাল খবর !

কিন্তু ওভারের শেষে ন্যাট গসডেন আর-একটা রান করলে...

ভাল বল করেছ, র‍্যালফ্ ! একটু বিশ্রাম নাও !

বন কারমোডি মিকারকে তুলে নিচ্ছে ! হয়তো বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত...

হ্যাঁ, তাই। নিউজিল্যান্ডের স্পিনার মোরি ওয়াশহ্যাক র‍্যালফের বদলে এল আর...

দারুণ ক্যাচ !

ন্যাট আউট ! ওয়াশহ্যাক অফ-ব্রেকে ওকে ফাঁদে ফেলল !

ভারনন এলিয়ট যখন এল রোভার্সের তখন ৭ উইকেটে ১১১ রান...

মিকার ব্যাটের ওপর ঝুঁকে আছে ! আশা করি ভারনন জোরে মেরে ওকে সরাবার চেষ্টা করবে না...

কিন্তু...

উঁউফ !

এই শট মারার আগে অভিজ্ঞ ভারননের বলে চোখ রাখা উচিত ছিল !

বোল্ড !

জুটি শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে রয় সব বলই মারছিল...

উহুহ !

তা হলে রয় একটা সুযোগ দিল, তবে আর-একটা চার !

বেশিক্ষণ নয়...
আহ্ !
ও আউট ! কিন্তু রেসি গর্ব করতে পারে !
ওর ৪৭ রান খুবই মূল্যবান হতে পারে !
রোভার্সের শেষ দুই ব্যাটসমেন, ডানকান ম্যাকে আর জিমি স্লেডের প্রচণ্ড মারে দর্শকরা আনন্দ পেল...
এটা ছক্কা !
হুররেএএএ !
MONIQUE T
RICHARD GWYNNE
এবং ইনিংস যখন শেষ হল...
২২ ওভারে ১৪৪ রানে সকলে আউট !
ক্যাভেলিয়ার্সের মতো টিমের বিরুদ্ধে খারাপ রান নয় !
পরে, চা পানের সময়...
রয় কোথায় ?
জানি না ! কে যেন বলল রয়কে টেলিফোনে ডাকছে...
...তার পরেই ও হাওয়া !
তখন...
পেনির কাছে মাঠের ফোন নম্বর রেখে এসে ভাল করেছিলাম...
...যেমন আশা করেছিলাম তার আগেই হল !
মেলচে জেনারে হাসপা
এবং !
পেনি, তুমি ভাল আছ ? এবার কি... ?
শান্ত হও, রয় ! এবার একটির বেশি পারিনি...
আমাদের আর-একটি মেয়ে হয়েছে !
কী সুন্দর ! আর ওর নাম তো ঠিক করেই রেখেছি, তাই না ?
নিশ্চয় ! আর-একটি সাম্প্রতিক আনন্দের ঘটনা ভুলিনি । শুধু একটি নামেই ওকে আমরা ডাকতে পারি !
ঠিক ! এই, ডায়ানা !
পরের সংখ্যায় : "মনে হচ্ছে রোভার্স ছাতু হয়ে যাবে..."

রঙিন কাগজের মৌচাক

যে কোনও উৎসব অথবা অনুষ্ঠানে ঘর সাজানোর জন্য রঙিন কাগজের মৌচাক বা মৌচাক-বল তোমরা নিজেরাই বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারো। এটি দেখতে যেমন সুন্দর, তৈরি করাও তেমন সহজ। আবার হয়তো বৃষ্টির দিনে ঘরে বসে আছ। সময় কাটছে না। তখনও এই সুন্দর জিনিসগুলো তৈরি করতে পারো।

বাজার থেকে কিছু রঙিন ঘুড়ির কাগজ কিনে ১০×১৮ সেন্টিমিটার মাপে ৬০টি কাগজ কেটে নাও। একই রং অথবা ২০টা করে তিনরকম রং নিতে পারো।

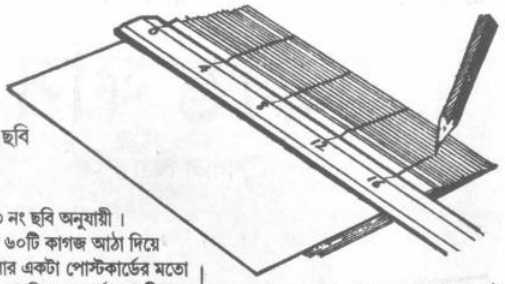

১ নং ছবি

লাইন টানো। ৩ নং ছবি অনুযায়ী। এভাবে পর-পর ৬০টি কাগজ আঠা দিয়ে জুড়ে নাও। এবার একটা পোস্টকার্ডের মতো শক্ত বোর্ডে ৯ সেঃ মিঃ ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত কম্পাস দিয়ে এঁকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে কেটে নাও। ৪ নং ছবির মতো অর্ধবৃত্তটা কাগজগুলোর ওপর ফেলে কাঁচি দিয়ে ধারটা কেটে ফেলো।

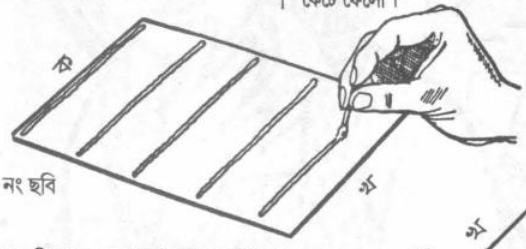

২ নং ছবি

এই ৬০টি কাগজ পর-পর এমনভাবে রাখো যাতে প্রতিটি কাগজের ধারগুলো একটু করে বেরিয়ে থাকে। বাঁ দিক থেকে ৪ সেন্টিমিটার করে পর-পর পেন্সিল দিয়ে লাইন টেনে নাও। ডান দিকের শেষ অংশে থাকবে ২ সেঃ মিঃ। ১ নং ছবির মতো। এবার দাগ দেওয়া কাগজ থেকে একটা কাগজ তুলে প্রথমে বাঁ দিকের কোনা, তারপর ৪ সেঃ মিঃ অন্তর যেখানে পেন্সিলের দাগ দেওয়া আছে সেখান দিয়ে দেশলাই কাঠিতে আঠা লাগিয়ে সরু করে আঠার লাইন টেনে নাও। ২ নং ছবির মতো।

পরের কাগজটা এমনভাবে ঘুরিয়ে বসাও যাতে 'খ' দিকটা অর্থাৎ ২ সেঃ মিঃ দিকটা বাঁ দিকে থাকে। এই কাগজে প্রথমে ডান দিকের কোনায় আঠার লাইন টেনে নাও। তারপর ডান দিক থেকে ৪ সেঃ মিঃ অন্তর আঠার

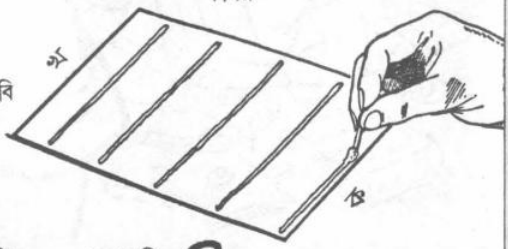

৩ নং ছবি

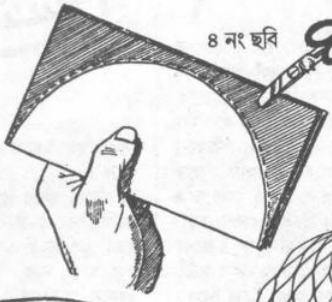

৪ নং ছবি

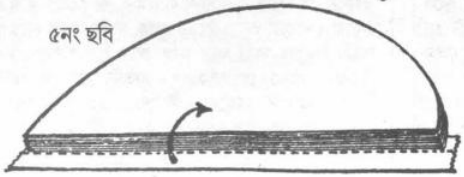

৫নং ছবি

এবার দু'খানা অর্ধবৃত্ত উপরে এবং নীচে আঠা দিয়ে লাগিয়ে পাশটায় সেলোটেপ অথবা কাগজের পটি জুড়ে নাও। ৫ নং ছবির মতো।

ব্যস, এবার দু'পাশের কার্ড ধরে বইয়ের মতো খোলো। দ্যাখো, কী সুন্দর কাগজের মৌচাক তৈরি হয়ে গেল। রঙিন কাগজের পরিবর্তে পুরনো খবরের কাগজ দিয়েও তৈরি করা যেতে পারে। শুধু পাশগুলো পোস্টার কালার দিয়ে রং করে দিলে ভাল হয়।

কবির

চক্রান্ত ফাঁস

শৈবাল মিত্র

ভূগোল-টিচার লছমি সিনহার থমথমে হাঁড়িমুখ, তাঁর দু' চোখের বরফ-কঠিন চাহনি দেখে পরীক্ষার শুরুতে ভয় পেয়ে গেল চিরশ্রী। পরীক্ষার হলে ভূগোল-টিচার যে আজ তাকে নাজেহাল, নাস্তানাবুদ করবেন আঁচ করতে পারল সে। এ-বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে চিরশ্রী। আজ তার ভূগোল প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা। আজই পরীক্ষার শেষ দিন। ইংরেজি, বাংলা, ফিলজফি, হোম ম্যানেজমেন্ট, এমনকী ভূগোল থিওরিটিকাল পরীক্ষাও বেশ ভাল দিয়েছে সে। বলা যায় আশাতিরিক্ত ভাল। চিরশ্রীর ধারণা, ফার্স্ট ডিভিশনের উঁচু দিকে থাকবে সে। ভূগোল প্র্যাকটিকালে চল্লিশের মধ্যে খুব কম তিরিশ পেলেও তার হিসেবে টোটাল মার্কস সাড়ে সাতশোর কম হবে না। প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা হচ্ছে তার স্কুলে। ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন তার প্র্যাকটিকাল খাতা। ক্লাসের দু-তিনটে সেরা খাতার মধ্যে তার বিশ্বাস, তার খাতা জায়গা পাবে। না পাবার কোনও কারণ নেই। চমৎকার হাতের লেখা তার। আঁকাতেও সে ভাল। শঙ্করস উইকলি এবং পেলিকান আয়োজিত সারা ভারত ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় একাধিকবার প্রাইজ পেয়েছে সে। ক্লাস-প্র্যাকটিকাল খাতায় পাঁচে পাঁচ না পেলেও চার পাবেই। জোরালো আত্মবিশ্বাস নিয়ে তাই প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা দিতে এসেছিল চিরশ্রী। পরীক্ষা শেষ হলে আগামী দু-তিন মাস কত মজা, আনন্দ করবে, ঝলকে ঝলকে সেসব স্বপ্ন মগজে ঢুকে গত দু-তিনদিন মশগুল করে রেখেছে তাকে।

পরীক্ষা শুরুর ঘণ্টা বাজার আগে হলের সামনে চেয়ারে-বসা লছমি সিনহাকে ক্লাস-প্র্যাকটিকালের খাতা জমা দিতে গিয়ে প্রথম ধাক্কা খেল চিরশ্রী। সাদা আর্ট পেপারের মলাট, পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি তার খাতা, নাক সিঁটকে দু' আঙুলে ভূগোল-টিচার এমনভাবে ধরলেন, যেন খাতাটা নস্যি-মাখা রুমাল, বা ঐঁটো থালার চেয়ে বেশি নোংরা। খাতাটা ধরলে হাতের দুর্গন্ধ, ময়লা সাবান দিয়ে ধুতে হবে। লছমি সিনহার খাতা ধরার ভঙ্গি দেখে বুক কাঁপতে শুরু করেছিল চিরশ্রীর। সামনে টেবিলের ওপর খাতাটা রেখে এক পলক মলাটের দিকে তাকিয়ে দু' আঙুলে মলাট খুলে ভেতরের তিন-চারটে পাতায় এলোমেলো দ্রুত চোখ বোলালেন ভূগোল-টিচার। তারপর টান মেরে টেবিল থেকে খাতাটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাঁকা গলায় বললেন, "মলাট দেবার জন্য ব্রাউন পেপার কেনার পয়সা নেই তোমার মা-বাবার ? পুরনো ক্যালেন্ডারের পাতায় মলাট ? যত সব হ্যাগার্ড।"

প্র্যাকটিকাল খাতার মলাট যে ক্যালেন্ডারের পাতায় তৈরি, এ অভিযোগ মিথ্যে নয়। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই। দামি, গ্লসি, ধপধপে সাদা আর্ট পেপারে ছাপা এক বিলিতি প্রতিষ্ঠানের বিশাল সাইজের ক্যালেন্ডারের এ-বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের পাতায় খাতার মলাট দিয়েছে চিরশ্রী। এখন মার্চের শেষ। পাতা ময়লা হয়নি। ব্রাউন পেপারের চেয়ে এ-মলাটে খাতার জেল্লা, গাম্ভীর্য অনেক বেড়েছে, ভেবেছিল সে। মেঝেতে লুটিয়ে থাকা খাতাটা এক পলক দেখে চিরশ্রীর বুকের মধ্যে থরথর কাঁপছে। কান্না চোখের জল সামলে শান্ত থাকার চেষ্টা করছে সে। পরীক্ষার হলে, যে-যার জায়গায় বসে বন্ধুরা তাকিয়ে আছে চিরশ্রীর দিকে। হলে ঢুকে লছমি সিনহার হাঁড়িমুখ, চোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টি দেখে চিরশ্রীর আশঙ্কা ফলতে শুরু করেছে।

জ্বালজেলে মলাট প্র্যাকটিকাল খাতা হাতে সুতনুকা হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকতে মিষ্টি হাসিতে মুখ ভরে তাকে ভূগোল-টিচার প্রশ্ন করলেন, "এত হাঁপাচ্ছ কেন ?"

"ভাবলাম পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে।"

সুতনুকাকে নরম গলায় লছমি সিনহা বললেন, "এখনও দু' মিনিট দেরি। যাও, ফ্যানের তলায় গিয়ে বোসো।"

যাবার আগে সুতনুকার প্র্যাকটিকাল খাতা দু' হাত বাড়িয়ে দুধের শিশু কোলে ধরার মতো সযত্নে নিলেন লছমি সিনহা। মলাট, পাতা উলটে ভাঙাচোরা কাঁচা হাতের লেখা, রবার-ঘষা ময়লা কালো ছবি দেখে তারিফ করে বললেন, "বাহ্, ব্রিলিয়ান্ট খাতা !"

খুশিতে উজ্জ্বল মুখে জায়গায় গিয়ে বসল সুতনুকা। চিরশ্রীকে দেখিয়ে সুতনুকার নামের পাশে প্র্যাকটিকাল খাতার জন্য সাড়ে চার নম্বর বসালেন ভূগোল-টিচার। মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে চিরশ্রীর খাতা। তার দিকে তাকিয়ে শক্ত থমথমে মুখে লছমি সিনহা ধমকে উঠলেন, "বোকার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? খাতাটা তুলে আনো।"

মাথা ঘুরছে চিরশ্রীর। দু'চোখে ধুতরো ফুল দেখছে সে। টলমল পায়ে খাতাটা তুলে এনে সে টেবিলের ওপর রাখল। ধুলো, ময়লা লেগেছে সাদা মলাটে। তাকে দেখিয়ে তার নামের পাশে লছমি সিনহা নম্বর লিখলেন, দুই। অসুস্থ বোধ করছে চিরশ্রী। মাথা নিচু করে দাঁত টিপে সে দাঁড়িয়ে আছে। পরীক্ষা শুরুর ঘণ্টা বাজল।

চিরশ্রী তার জায়গায় এসে বসেছে। আতঙ্ক, অসহায়তায় শরীরের মধ্যে কাঁপুনি টের পাচ্ছে সে। মাথার ভেতরটা ধুধু মরুভূমির মতো ফাঁকা। যা পড়ে এসেছিল, সব ভুলে গেছে। তার পাশে বসেছে মণিদীপা। খুব ভাল মেয়ে সে। চিরশ্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে সে একজন। ফিসফিস করে মণিদীপা শুধাল, "শরীর খারাপ লাগছে ?"

দু' চোখে জল উপচে এলেও চিরশ্রী বলল, "নাহ্।"

পরীক্ষার খাতা, প্রশ্নপত্র , আইসোথার্ম শিট, গ্রাফ মেয়েদের হাতে তুলে দিচ্ছেন লছমি সিনহা। চিরশ্রীর সামান্য নাহ্ কথাটা কানে যেতে খিঁচিয়ে উঠে বললেন, "লুক চিরশ্রী, পরীক্ষার ঘণ্টা পড়ে গেছে। দ্বিতীয়বার তোমাকে কথা বলতে দেখলে হল থেকে বার করে দেব।"

ভয়ে কুঁকড়ে গেল চিরশ্রী। এলিজা সেনকে খাতা, প্রশ্ন, দুটো কাগজ দিয়ে হেসে-হেসে লছমি সিনহা বলছেন, "তোমাদের ভাগ্য ভাল। এ-বছরে কাউন্সিল কোথাও এক্সটার্নাল এগজামিনার পাঠায়নি। কিছু অসুবিধে হলে বলবে আমাকে।"

প্রশ্নোত্তর লেখার ঘণ্টা বাজার মধ্যে সকলে খাতা, প্রশ্ন, কাগজপত্র পেয়ে গেলেও চিরশ্রী, মণিদীপার হাতে সেগুলো পৌঁছল আরও পাঁচ মিনিট পরে। তার পাশে বসার জন্য মণিদীপার যে এ ভোগান্তি, বুঝতে অসুবিধে হল না চিরশ্রীর। প্রশ্নপত্রের দিকে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে আছে সে। কিছুই পড়তে পারছে না। ভূগোল-প্র্যাকটিকালে তাকে যে লছমি সিনহা কিছুতে পাশ করতে দেবেন না, সে জেনে গেছে। ফলে ভূগোল-থিওরিটিকালে হিসেব মতো শতকরা সত্তর-পঁচাত্তর পেলেও প্র্যাকটিকালের জন্য উচ্চ মাধ্যমিকে ফেল করে যাবে সে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভূগোলে সাতাশি, লেটার মার্কস ছিল তার। ভূগোলে অনার্স নিয়ে বি.এ.পড়ার জন্য উচ্চ মাধ্যমিকে ভূগোল রেখেছিল সে। শূন্য দৃষ্টি প্রশ্নপত্রে রেখে এখন তার মনে হচ্ছে, ভূগোল নিয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল সে করে ফেলেছে। এ-যাত্রা এ-বিপদ উতরে গেলে সারাজীবনে ভূগোল-বই আর সে স্পর্শ করবে না।

মায়ের ওপরও এখন চিরশ্রীর রাগ হচ্ছে। রাগের সঙ্গে মিলে আছে অভিমান। মায়ের পরামর্শে উচ্চ মাধ্যমিকে ভূগোল নিয়েছে সে। তার মা মল্লিকা দেবী, ভূগোলে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেছিলেন। নানা অসুবিধেতে এম.এ. পড়া না হলেও ভূগোলের কঠিন অঙ্ক এখনও টকাটক মিলিয়ে দেন মল্লিকা দেবী। ভূগোলে মাস্টার্স ডিগ্রি পাবার নিজের অপূর্ণ ইচ্ছে মেটাতে এরকম এক সাঙ্ঘাতিক বিপদে চিরশ্রীকে ফেলে দিয়েছেন তিনি। মাধ্যমিকে চিরশ্রীকে ভূগোল পড়িয়েছিলেন। ভূগোলে চিরশ্রী লেটার পেতে আনন্দে আত্মহারা মল্লিকা দেবী বলেছিলেন, "সংসার করে, হেঁশেল ঠেলেও যা পড়েছিলাম ভুলিনি। চাকরি পেলে আমিও ভাল টিচার হতে পারতাম।"

মায়ের আনন্দ দেখে চিরশ্রীও খুশি হয়েছিল ভীষণ। তারপর নতুন স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার জন্য ভর্তি হবার সময়ে মায়ের চাপাচাপিতে ভূগোল নিল চিরশ্রী। বিষয়টা সম্পর্কে তার আগ্রহও কম ছিল না। মল্লিকা দেবী তৈরি করে দিয়েছিলেন এ আগ্রহ। ভূগোল নেবার আরও একটা কারণ চিরশ্রীর ছিল। মাধ্যমিক পড়ার সময়ে সে বুঝেছিল ভূগোলে মা চৌখস। স্কুলের ভূগোল টিচারের চেয়ে মায়ের জ্ঞান কম নয়। মায়ের পড়াবার ভঙ্গিও আলাদা। এত সহজ, প্রাঞ্জল করে স্কুলের ভূগোল-টিচার দীপিকাদি পড়াতেন না। ফলে ফাঁকি মেরেও মায়ের হাতযশে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আবার লেটার মার্কস পেয়ে যাবার স্বপ্ন দেখেছিল চিরশ্রী।

ফার্স্ট বেঞ্চে-বসা প্রিয় ছাত্রী মঞ্জরীকে কীভাবে গ্রাফ আঁকতে হবে চাপা গলায় বলে দিচ্ছেন লছমি সিনহা। দৃষ্টির কুয়াশা সরে যেতে প্রশ্নপত্র পড়ে চিরশ্রী বেশ আশ্বস্ত হয়েছে। এমন-কিছু কঠিন নয়। প্র্যাকটিকালে পাশমার্ক বারো। এ নম্বর পেতে তার অসুবিধে হবে না। বরং অনেক বেশি পাবে। গ্রাফ আর আইসোথার্মে আছে ষোলো নম্বর। দুটোই তার জানা। ষোলোতে ফুলমার্কস না পেলেও, চোদ্দ নম্বর পাবেই। দুটো প্রশ্নের প্রথমটা কমন, মিলে গেছে। তার মানে পাঁচে পাঁচ। আর একটা চার নম্বরের প্রশ্নে হেসেখেলে দুই পাবে। এই একুশ নম্বরের সঙ্গে প্র্যাকটিকাল খাতার দু' নম্বর যোগ করে হয় তেইশ। ফলে লিখিত পরীক্ষার পরে মৌখিকে পাঁচে যদি লছমি সিনহা শূন্য দেন, যা তিনি দেবেনই,তা হলেও ফেল করবে না সে।

হিসেব কষে আত্মবিশ্বাস, সাহস ফিরে পেল চিরশ্রী। পাঁচ নম্বরের প্রশ্নটা চটপট লিখে চার নম্বরের প্রশ্ন শুরু করল। বাঁকা,চলসহ নিখুঁত আঁকল ভারতবর্ষের মানচিত্র। পেন্সিলের শিস মোটা হয়ে যেতে ইনস্ট্রুমেন্ট-বক্স খুলে ব্লেড খুঁজে পেল না। পড়ার টেবিলের ওপর ব্লেড রেখেও বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ে তাড়াহুড়োয় বাক্সে ব্লেড ঢোকাতে ভুলে গেছে। আইসোথার্ম চার্ট আঁকতে এলিজাকে সাহায্য করছেন লছমি সিনহা। সামনে-বসা ঈশিতার স্কেলের পাশে কাগজে মোড়া ব্লেড দেখে নিচু গলায় চিরশ্রী বলল "তোর ব্লেডটা একটু দিবি ?"

গ্রাফ আঁকায় মগ্ন ঈশিতা ব্লেডের কথা না শুনলেও চিরশ্রীর গলা কানে যেতে পেছনে তাকাল।

চিরশ্রী বলল, "ব্লেড।"

তখনই দুড়দাড় করে ছুটে এসে প্রথমে চিরশ্রীর তারপর ঈশিতার খাতা ছিনিয়ে কেড়ে নিলেন লছমি সিনহা। ব্যাপার না বুঝে বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল দুজনে।

"গেট আউট, বেরিয়ে যাও হল থেকে।" বাজের মতো ফেটে পড়েন লছমি সিনহা বললেন, "এক্সপেল করলাম তোমাদের দুজনকে। অ্যানসার স্ক্রিপ্টে যা লেখার লিখে দেব আমি।"

চিরশ্রী ধীর ভদ্র, বিচক্ষণ মেয়ে হলেও ঈষিতা সেরকম নয়। গোবেচারা নিরীহ সে। তাকেও দু'চোখে দেখতে পারেন না লছমি সিনহা। আতঙ্কে হাউহাউ করে কেঁদে ঈশিতা বলল, "মিস, ব্লেড চেয়েছিল চিরশ্রী। আমি দিতে গিয়েছিলাম।"

"শাট আপ।"

লছমি সিনহার গর্জন শুনে বোবা হয়ে গেল ঈশিতা, চোখের জলে ভাসছে তার মুখ। দুটো খাতা উলটে-পালটে দেখে প্রথমে ঈশিতার খাতা, তারপর চিরশ্রীর খাতা ফেরত দিয়ে লছমি সিনহা চিরশ্রীকে বললেন, "লাস্ট ওয়ার্নিং! আর একবার তুমি কথা বললে, বা ঘাড় ঘোরালে হল থেকে দূর করে দেব। জাস্ট আই উইল থ্রো য়ু আউট অব দ্য এগজামিনেশন হল। মাইন্ড ইট।"

চিরশ্রীর হাতে খাতা দিয়ে লছমি সিনহা বললেন, "এই তো খাতার ছিরি। শিবের বাবাও পাশ করাতে পারবে না তোমাকে!"

ঠাণ্ডা স্রোত বইছে চিরশ্রীর শিরদাঁড়ায়। নম্বরের যে হিসেব প্রশ্ন পড়ে করেছিল তছনছ হয়ে যাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় তাকে আটকাতে যত দূর যা করার লছমি সিনহা করবেন। এ চিন্তার সঙ্গে ভয়ঙ্কর এক সম্ভাবনা ঝিলিক দিয়ে উঠল তার মাথায়। গ্রাফ এবং আইসোথার্মের আলগা দুটো পাতা খাতায় না জুড়ে ইচ্ছে করলেই ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারেন লছমি সিনহা। ফেলে না দিয়েও কিছু ভুল, এলোমেলো বিন্দু, রেখা টেনে দুটো শিট বরবাদ করে দেওয়া যায়। তা হলে হিসেবের তেইশ নম্বর থেকে নিমেষে চোদ্দ নম্বর খসে গিয়ে পড়ে থাকবে নয়। তার মানে ফেল, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফেল! উচ্চ মাধ্যমিকে যে ফেল করে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পাশ করা দূরের কথা, এ জীবনে ফেল করার সুযোগও পাবে না সে। দ্বিতীয় চান্সে যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে, কলেজে ভর্তিই হতে পারে না তারা। সি· সি· রোল নম্বর, মানে কন্টিনিউড ক্যান্ডিডেট মার্কা ছাত্রীকে পরীক্ষক থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষ, হঠাতে পারলে বেঁচে যান। তারা হল 'দূর ছাই'-এর দল। ভূগোল-প্র্যাকটিকালে পাশ করা যে অসম্ভব লছমি সিনহা তা হতে দেবেন না, এমন এক ভয়ার্ত সংকেত একটু দেরিতে হলেও চিরশ্রীর বুকের গভীরে ছড়িয়ে গেল। শিথিল হল তার হাত-পা। মনে হচ্ছে, চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছে সে। তার খাতার সঙ্গে আইসোথার্ম আর গ্রাফের আলগা দুটো শিট যে সেলাই হবে না, হলেও তার তৈরি দুটো রেখাচিত্রকে বারোটা বাজিয়ে দেওয়া হবে, শেষ কথাতে সে ইঙ্গিত দিয়েছেন লছমি সিনহা।

গ্রাফ তৈরিতে হাত দিয়ে আবার চোখে ঝাপসা দেখছে চিরশ্রী। নির্ভুল ছকে বিন্দু বসিয়ে রেখা জুড়তে গিয়ে তার ভয় হল, সে নিজেই ভুল করে ফেলবে। অসহায় কান্না তাল ঠুকছে বুকে। আজ পরীক্ষা শেষ হলেই এ-স্কুলের সঙ্গে চুকে যাবে তার সম্পর্ক। টেস্ট পরীক্ষার পরে, প্রায় তিন মাস হল, স্কুলের সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। থাকার কথাও নয়। টেস্ট পরীক্ষার পর কোনও স্কুল-কলেজে পরীক্ষার্থীদের জন্যে আলাদা ক্লাস হয় না। তখন বাড়িতে পড়ে তারা। তবু স্কুল-কলেজের সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের এক অদৃশ্য বাঁধন থেকে যায়। পরীক্ষা হয়ে গেলে সে সম্পর্ক শেষ। গত তিন মাস চোখ নাক গুঁজে পড়ার সময়ে স্কুলের সঙ্গে পাকাপাকি বিচ্ছেদের রুথা ভেবে মাঝে মাঝে চিরশ্রীর মনখারাপ হয়েছে। বিশেষ করে ইংরেজির টিচার সুতপা দত্ত, বাংলা-শিক্ষিকা অরুণিমাদি, হোমম্যানেজমেন্টের শীলাদির জন্যে প্রায়ই চিরশ্রীর মন কেমন করত। ইংরেজির সুতপা দত্ত আবার অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিসট্রেস। গম্ভীর, রাশভারী মহিলা। অসাধারণ পড়ান। তাঁর প্রিয় ছাত্রীদের একজন হল চিরশ্রী। টেস্ট পরীক্ষায় ভূগোলে চিরশ্রী ফেল করতে দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন মল্লিকা দেবী। মনমরা হয়ে ছিলেন ক'দিন। ক্লাসের শুরু থেকে বাড়িতে তিনি নিজে চিরশ্রীকে পড়িয়েছেন। দু'তিনবার পরীক্ষা নিয়েছেন। কড়া হাতে মার্কিং করেও মেয়েকে একশোয় পঁয়ষট্টির কম কখনও দিতে পারেননি মল্লিকা দেবী। সে মেয়ে ভূগোলে ফেল করে, উইল ওয়ার্নিং টেস্টে অ্যালাও হতে বেশ দমে গেলেন মল্লিকা দেবী তাঁর মনে হল, তাঁর পড়ানোয় গলদ ছিল। বিশ বছর আগের ভূগোলের সঙ্গে আধুনিক ভূগোলের নিশ্চয় এখন ফারাক ঘটে গেছে, যা তিনি বোঝেননি। কিন্তু চিরশ্রীর মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় তো এমন হয়নি। তার উচ্চ মাধ্যমিকের ভূগোল বই পড়েও যুগান্তকারী রদবদল চোখে পড়েনি মল্লিকা দেবীর।

টেস্ট পরীক্ষায় ভূগোলের নম্বর দেখে উদ্বেগ, অস্বস্তিতে মায়ের ছটফটানি টের পেয়েছিল চিরশ্রী। প্রকৃতিতে মা চাপা, কম কথা বলেন। কপালের রেখা শুকনো, মুখ দেখে মায়ের অশান্তি তবু টের পেয়েছিল চিরশ্রী।

টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার তিন-চারদিন পরে তার সামনে একদিন ভূগোলে ফেল করার কথা মা শোনালেন বাবাকে। চিরশ্রীর বাবা জয়ন্ত গুপ্ত, ব্যস্ত মানুষ। অফিসে উঁচুপদে চাকরি করার জন্য বছরে তিন-চার মাস হিল্লি-দিল্লি করতে হয় তাঁকে। বাড়িতে থাকলেও মেয়েকে পড়াবার ফুরসত হয় না তাঁর। পড়াবার চেয়ে অবসর পেলে মল্লিকা দেবী-চিরশ্রীর সঙ্গে গল্প, আড্ডাতে বেশি আনন্দ পান জয়ন্তবাবু। চিরশ্রী ভূগোলে ফেল শুনেও মজা করে জয়ন্তবাবু ছড়া কাটলেন, "ইতিহাসে পাতিহাঁস, ভূগোলেতে গোল, অঙ্কে আতঙ্ক···।"

সে ছড়া শেষ করার আগেই গম্ভীর গলায় মল্লিকাদেবী বললেন, "ইয়ার্কি রাখো, ভাল লাগছে না আমার। কী যে করি?"

মল্লিকা দেবীর দুশ্চিন্তা দেখে থতমত খেয়ে জয়ন্তবাবু বললেন, "সত্যি তো, একটু ভাবা দরকার।"

কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে মল্লিকা দেবীকে জয়ন্তবাবু প্রশ্ন করলেন, "রিঙ্কুর স্কুলের ভূগোল-টিচারের সঙ্গে তোমার কি কখনও ঝগড়া, খটাখটি হয়েছে?"

প্রশ্ন শেষ না করে জয়ন্তবাবু থেমে যেতে মল্লিকা দেবী বলেছিলেন, "ভূগোলের দুটো অঙ্ক মিস সিনহা ভুল শিখিয়েছিলেন। রিঙ্কুর খাতায় সে দুটো অঙ্ক শুদ্ধ করে দিয়েছিলাম আমি। এ বছরখানেক আগের ঘটনা।"

চিরশ্রীর বাড়ির নাম রিঙ্কু। মা-বাবার কথা শুনছিল সে। জয়ন্তবাবু প্রশ্ন করলেন, "আর কিছু?"

মল্লিকা দেবী বললেন, "গত বছরে রিঙ্কুর স্কুলে গার্জিয়ানস মিটিং-এ গিয়ে মিস সিনহার সঙ্গে যেচে কথা বললাম আমি। মিস সিনহা প্রশ্ন করলেন, 'কে ভূগোল পড়ায় চিরশ্রীকে?'

"আমার জবাব শুনে তিনি এমন শ্লেষের হাসি হাসলেন যে, 'থ' হয়ে গেলাম আমি। তারপর যতবার কথা বলতে গেলাম, মুখ ঘুরিয়ে

না শোনার ভান করে চলে গেলেন তিনি।"

এ-ঘটনা চিরশ্রী জানলেও সেদিন প্রথম শুনলেন জয়ন্তবাবু। এক মুহূর্ত চুপ থেকে জয়ন্তবাবু বলেছিলেন "টেস্টে ফেল করালেও ফাইনালে তো তাঁর কিছু করার নেই।"

"ভূগোল-প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা তাঁর কাছেই রিঙ্কুকে দিতে হবে।"

মল্লিকা দেবীর কথার পিঠে জয়ন্তবাবু বললেন, "প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা একা নেবেন না তিনি। পরীক্ষার হলে কাউন্সিলের পাঠানো একস্টার্নাল এগজামিনার থাকেন একজন।"

জয়ন্তবাবুর যুক্তিতে মল্লিকা দেবী কতটা ভরসা পেলেন, বুঝতে পারেনি চিরশ্রী। হাশিখুশি বাবাকেও গুম মেরে বসে থাকতে দেখল চিরশ্রী। কয়েক সেকেন্ড পরে বাবা বলেছিলেন, "একজন টিচার এত প্রতিহিংসাপরায়ণ, নিষ্ঠুর!"

চিরশ্রীর ওপর চোখ পড়তে মেয়ের সামনে শিক্ষিকার নিন্দে করার লজ্জায় কথা গিলে নিয়েছিলেন জয়ন্তবাবু। ভূগোলে ফেল করে অপমানে, রাগে জ্বলছিল চিরশ্রী। বাবা মুখ খুলতে সে বলল, "ফি-বছর দু-তিনজন মেয়েকে বেছে নিয়ে ভূগোল মিস এরকম অত্যাচার করেন। ওঁর ভয়ে কত মেয়ে যে স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের পাড়ার অর্পিতা ভূগোল-মিসের অত্যাচারে এ-বছর ক্লাস ইলেভেনে ভর্তি হয়েও ট্রান্সফার নিয়ে কলেজে চলে গেছে। অর্পিতা বলে, ভূগোল-টিচারকে একদম পছন্দ হয় না।"

মেয়েকে ধমকে থামিয়ে দিয়েও মল্লিকা দেবী বলেছিলেন, "এসব টুকরো খবর আমিও শুনেছি।"

"কী করা যায়?"

জয়ন্তবাবুর প্রশ্নের জবাবে মল্লিকা দেবী বলেছিলেন, "স্কুলে ফর্ম ফিল-আপ করতে কাল রিঙ্কু যাবে। ওর সঙ্গে আমিও যাব।"

"তারপর?"

"কোনও অপরাধ করে থাকলে ক্ষমা চাইব মিস সিনহার কাছে।"

"ছোট হয়ে যাবে তুমি।"

"মেয়ের জন্যে হতে রাজি।"

মা-বাবার কথা শুনে সেদিন খুব কষ্ট পেয়েছিল চিরশ্রী। তার জন্য মায়ের এই হেনস্থা কুরে-কুরে খাচ্ছিল তাকে। কিন্তু ফেল করার ভয় তারও ছিল। মাকে তাই সে ঠেকায়নি।

চিরশ্রীর সঙ্গে ফর্ম ফিল-আপের জন্য পরের দিন স্কুলে গেলেন মল্লিকা দেবী। জয়ন্তবাবু যা আশঙ্কা করেছিলেন, তাই হল। মল্লিকা দেবী হাজার ডাকাডাকিতেও ঘর থেকে বেরোলেন না লছমি সিনহা। বিশাল শিল্পপতি গোষ্ঠীর স্কুল। এখানে আদবকায়দা সব আলাদা। স্টাফ রুমের সামনে থেকে দরোয়ান প্রায় জোর করে সরিয়ে দিল মল্লিকা দেবীকে। সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নামার সময়ে লজ্জায়, অপমানে বিদীর্ণ মল্লিকা দেবীকে পেছন থেকে কে যেন ডাকলেন, "অ্যাই মল্লিকা?"

ঘাড় ঘুরিয়ে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর পুরনো সহপাঠিনী সুতপাকে চিনে ভাঙা গলায় মল্লিকা দেবী প্রশ্ন করেছিলেন "তুমি?"

"এখানে পড়াই আমি। ছ' মাস হল এসেছি।" কুটো আঁকড়ে ডুবন্ত মানুষের বেঁচে ওঠার মতো কলেজের বন্ধু সুতপাকে পেয়ে বর্তে গেলেন মল্লিকা দেবী। নিজের ঘরে নিভৃতে তাঁর মুখে সব শুনে সুতপা বললেন, "মাত্র ছ' মাস অ্যাসিস্টান্ট হেডমিসট্রেস হয়ে এখানে জয়েন করেছি আমি। এই অল্প সময়ে লছমির বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ এসেছে আমার কাছে। আমার ধারণা শি ইজ এ স্যাডিস্ট। অত্যাচার করে আনন্দ পায়। মানসিক রুগি। ওর চিকিৎসা দরকার।"

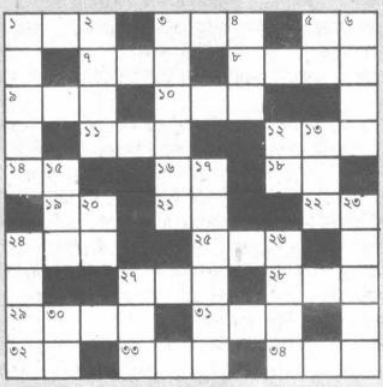

সংকেত : পাশাপাশি : (১) দেবগায়ক। (৩) অচল। (৫) মধু। (৭) আকারযুক্ত। (৮) পদ্ম। (৯) রসবিশেষ। (১০) ব্যাধ। (১১) উলটে নিলে পোষণ বা রক্ষণ। (১২) সুপুরি। (১৪) ব্যস্ত, আগ্রহী। (১৬) গভীর জলে যা পাওয়া মুশকিল। (১৮) খেদ জানাতে এই উক্তি। (১৯) লাঙল। (২১) শব্দ, গুজব। (২২)—গানবাজনা—এই নিয়ে তো জলসা। (২৪) অণু-বিষয়ক। (২৫) এই প্রথা লোপ পেলেও কারও কারও চালচলনে বা মেজাজে এটা প্রকাশ পায়। (২৭) 'মোদের —মোদের আশা…'। (২৮) ভূমিকম্প এমনই হয়। (২৯) রাম। (৩১) ঘোড়া। (৩২) সংগীতে তালের সমাপ্তি যা বেশি জোরে উচ্চারিত বা বাদিত হয়। (৩৩) লেখেন যাঁরা কবি তাঁরা। (৩৪) স্বর্গীয় বৃক্ষ বা পুষ্প।

উপর-নীচ : (১) কী করা উচিত? (২) বিজ্ঞানের একটি বিষয়। (৩) পরশুরামের কাহিনী, ছবি করলেন সত্যজিৎ। (৪) এক রকমের রেশম। (৫) অসির চেয়ে এর জোর নাকি বেশি। (৬) নির্বোধ, আহাম্মক। (১২) অজন্তা-ইলোরার যেখানে ছবি। (১৩) আবদার। (১৫) সূর্যেও লাগে চাঁদেও লাগে। (১৭) যেসব বিদেশী পর্যটক ভারতে এসেছিলেন তাঁদের একজন। (২০) বিভাজ্য অঙ্ক। (২৩) অতি সুন্দর। (২৪) দেবগুরু বৃহস্পতি। (২৬) পাখি। (২৭) দশা, অবস্থা। (৩০) স্বপ্ন দেখার সময়।

গত সংখ্যার সমাধান

জী	ব	ন	যা	প	ন	■	উ	লূ	ক
ব	ল	দ	■	রি	■	■	দ্য	■	থা
ম্বৃ	■	■	দা	তা	■	আ	ম	ল	ক
ত	র্জ	নী	■	প	র	টা	■	ব	লি
■	■	প	শু	■	■	কা	■	ঙ্গ	■
■	ক	■	ক	■	■	মা	স	■	■
বৈ	র	■	শা	ব	ক	■	দা	ত্যূ	হ
কা	লা	হা	রি	■	ল	ব্ধ	■	■	র
লি	■	কি	■	■	ম	■	জা	নি	ত
ক	ল	ম	■	বি	চি	ত্রা	নু	ষ্ঠা	ন

রঞ্জন

ফাঁকা চোখে মল্লিকা দেবীকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সুতপা বলেছিলেন, "লেখাপড়ায় চিরশ্রী খুব ভাল। ইংরেজি ক্লাসে ছ' মাস পেয়েছি তাকে। শি ইজ একসেপশনালি ব্রিলিয়ান্ট। তার যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, সে দায়িত্ব আমার।"

সুতপার কথায় নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে আলো দেখেছিলেন মল্লিকা দেবী।

দেড় ঘণ্টার প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার এক ঘণ্টা শেষ হয়েছে পনেরো মিনিট আগে। পনেরো মিনিট পরেই খাতা জমা দিতে হবে সকলকে। তারপর শুরু হবে মৌখিক প্রশ্নোত্তরের পরীক্ষা। এই সওয়া ঘণ্টায় অরুণিমাদি, শীলাদি পরীক্ষার হলে একবার করে টুঁ মেরে গেছেন। চিরশ্রীর পাশে এসে তার পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিয়েছেন দু'জনে। তার কানে-কানে শীলাদি বলেছেন, "হোমম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিকালে চল্লিশে আটত্রিশ পেয়েছ তুমি। হাইয়েস্ট মার্কস। একসটার্নালি এলে চৌত্রিশের বেশি হত না।"

ছলছল চোখে শীলাদিকে কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গিয়েছিল চিরশ্রী। একসটার্নালি এগজামিনার না পাঠানোয় কাউন্সিলের ওপর রাগে ফেটে যাচ্ছিল তার বুক। কিন্তু এ-কথা কাউকে বলা যায় না।

গোল্লা চোখ, কঠিন মুখ লছমি সিনহা তাকিয়ে আছেন তার দিকে। চিরশ্রী আশা করছিল সুতপাদি পরীক্ষার হলে একবার আসবেন। সুতপাদি এলেন না। আইসোথার্মের কাগজ চিরশ্রী শেষ করার মুহূর্তে পরীক্ষার ফাইনাল ঘণ্টা বাজল। শিকারি বাজের মতো তখনই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অ্যানসার স্ক্রিপ্ট এবং যাবতীয় কাগজ ছোঁ মেরে কেড়ে নিলেন লছমি সিনহা। একবার মিলিয়ে দেখার, রিভিশনের সুযোগ পেল না চিরশ্রী। বন্ধুদের অনেকে বিশেষ করে সুতনুকা, এলিজা, মঞ্জরী তখনও টিমেতালে, নির্ভয়ে লিখছে। তাদের দিকে না তাকিয়ে ঈশিতার খাতা কেড়ে নিলেন তিনি। গ্রাফ, আইসোথার্মের আলগা দুটো কাগজ তখনও মূল খাতায় সেলাই করেনি ঈশিতা। সেলাই করার জন্যে সে দৌড়ে যেতে লছমি সিনহা ধমকে তাড়িয়ে দিলেন তাকে। আবার নিঃশব্দে কাঁদছে ঈশিতা। আলগা দুটো কাগজ মূল খাতার সঙ্গে জুড়ে দিয়েও চিরশ্রী জানে, কাগজ দুটোর পরিণাম কী হবে। আতঙ্কে বুক তোলপাড় করলেও চিরশ্রী চুপ। পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড নেবার দিনের ছবি মাথায় ভাসছে তার। দিন-পনেরো আগের ঘটনা। অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে সব টিচারকে প্রণাম করার রেওয়াজ মেনে লছমি সিনহাকেও প্রণাম করতে গিয়েছিল চিরশ্রী। সে হাত বাড়াতে চেয়ারের ওপর দু'পা তুলে তিনি বলেছিলেন, "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ!"

হাত গুটিয়ে ম্লান মুখে ফিরে এসেছিল চিরশ্রী। শুকনো মুখে মেয়েকে বাড়ি ঢুকতে দেখে কী হয়েছে জানতে চেয়েছিলেন মল্লিকা দেবী। চিরশ্রী কিছু না বলায় দ্বিতীয়বার আর জানতে চাননি।

পরীক্ষা শেষ। খাতা জমা পড়ে গেছে সকলের। হলের বাইরে মৌখিক পরীক্ষার জন্য বেঞ্চে পাশাপাশি বসে আছে মেয়েরা। কেউ খুশিতে ডগমগ, কেউ খুশি চেপে গম্ভীর, কেউ আতঙ্কে ফ্যাকাসে। মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে হল থেকে এক-এক করে বেরিয়ে আসছে চিরশ্রীর বন্ধুরা। বেঞ্চ খালি, করিডর ফাঁকা হবার পরে সকলের শেষে ডাক পড়ল চিরশ্রীর। পরীক্ষার হলে সে ঢুকতেই লছমি সিনহা বললেন, "অ্যানসার স্ক্রিপ্ট দেখে মনে হল শূন্য পাবে তুমি। কী আর জিজ্ঞেস করব তোমাকে?"

পায়ের তলায় টলমল মাটি, ভোঁ-চক্কর মাথা, তবু স্থির দাঁড়িয়ে আছে চিরশ্রী।

লছমি সিনহা প্রশ্ন করলেন, "অ্যান্টার্কটিকায় যখন সন্ধে সাতটা, গুরুদাসপুরে তখন সময় কী?"

এ প্রশ্ন মৌখিক আসে না। এ প্রশ্নের জন্য তৈরি ছিল না চিরশ্রী। কাগজ-কলমে অঙ্ক কষে প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য সে বলল, "মিস, একটা কাগজ!"

তার সকাতর প্রার্থনায় কান না দিয়ে লছমি সিনহা প্রশ্ন করলেন, "দু' হাজার একুশ সালের সাতই মার্চ কী বার?"

হালভাঙা নৌকোর মতো বেসামাল চিরশ্রী কাগজ চাইতেও ভুলে গেল। স্রোতের ধাক্কায় এখন যে-কোনও দিকে ভেসে যাবার জন্য সে প্রস্তুত।

"দু' হাজার চুরাশি সালে হ্যালির ধূমকেতু কোথায় থাকবে?"

লছমি সিনহার তৃতীয় প্রশ্ন শুনেও বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল চিরশ্রী।

রুক্ষ, নীরস গলায় লছমি সিনহা বললেন, "পাঁচে শূন্য। এবার যেতে পারো তুমি।"

হলের বাইরে এসে ফাঁকা বেঞ্চে আছড়ে পড়লেও চিরশ্রীর চোখ থেকে একফোঁটা জল বেরোল না। বেঞ্চের ওপর পাঁচ-সাত মিনিট মুখ থুবড়ে পড়ে থেকে নীচে নেমে এসে সে দেখল, মা দাঁড়িয়ে আছেন। মায়ের পাশে সুতপাদি।

মলিন মুখে চিরশ্রীকে দেখে দ্রুত পায়ে দোতলায় উঠে গেলেন সুতপাদি।

চিরশ্রীর কাঁধে হাত রেখে মা প্রশ্ন করলেন, "কেমন হল?"

মাকে জাপটে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল চিরশ্রী। গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তার শরীর। দেড়-দু' ঘণ্টা আটকে রাখা তার আবেগ, কান্না ঢেউ-এর পর ঢেউ ভাঙতে থাকল মায়ের শরীরে। দু' হাতে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে আছেন মল্লিকা দেবী। রিঙ্কু কাঁদার মেয়ে নয়। সে যখন কাঁদে, বুঝতে হবে অঘটন ঘটেছে। মেয়েকে কোনও প্রশ্ন না করে সিঁড়ির মুখে সুতপার জন্য দাঁড়িয়ে থাকলেন মল্লিকা দেবী।

মিনিট-পনেরো পরে হেডমিসট্রেস ভার্গিসকে নিয়ে সুতপাদি ফিরলেন। দু'জনেই অস্থির, উত্তেজিত।

সুতপাদি বললেন, "লছমির চক্রান্ত তার ফাঁস। তার বজ্জাতি ধরে ফেলেছি আমরা।

অবুঝ চোখে তাকিয়ে আছেন মল্লিকা দেবী।

সুতপা বললেন, "তোমার আশঙ্কার কথা আগেই জানিয়ে রেখেছিলাম মিসেস ভার্গিসকে। ঘর থেকে ওঁকে নিয়ে পরীক্ষার হলে গেলাম আমরা দু'জন। ফাঁকা হলঘর। দেখলাম, চিরশ্রীর গ্রাফ আইসোথার্মের শিট দুটো খাতা থেকে খুলে কাটাকুটি করছে লছমি। আরও একটা খাতা ছিল। সেটার কোনও ক্ষতি হয়নি। হাতেনাতে ধরে ফেলেছি তাকে। পুলিশে খবর দিলে জেল হয়ে যাবে তার। স্কুলের দুর্নাম এড়াতে থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাছারি করতে চাই না আমরা। তবে রেজিগনেশন দেবে লছমি। আজই। কাল থেকে আর স্কুলে আসবে না সে।"

এত কথায় চিরশ্রীর কান নেই। কান্না-জড়ানো গলায় সে প্রশ্ন করল, "আমার কী হবে? প্র্যাকটিকালে যে ফেল করে যাব আমি?"

বিধ্বস্ত, ক্লান্ত চিরশ্রীর কাঁধে হাত রেখে হেডমিসট্রেস মিসেস ভার্গিস সস্নেহে বললেন, "কোনও ভয় নেই তোমার। আমার ঘরে বসে গ্রাফ, আইসোথার্মের নতুন দুটো শিট ভরে দাও। তোমার মা, মিসেস দত্ত, আমিও থাকব সেখানে।"

পুনশ্চ : উচ্চ মাধ্যমিকে সাতশো তিরিশ পেল চিরশ্রী। তাকে ভূগোলে অনার্স পড়াতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন মল্লিকা দেবী। পেরে ওঠেননি। ভূগোলের কথা উঠলে এখন বাবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে চিরশ্রী ছড়া কাটে, "ভূগোলেতে গোল।"

ছবি : দেবাশিস দেব

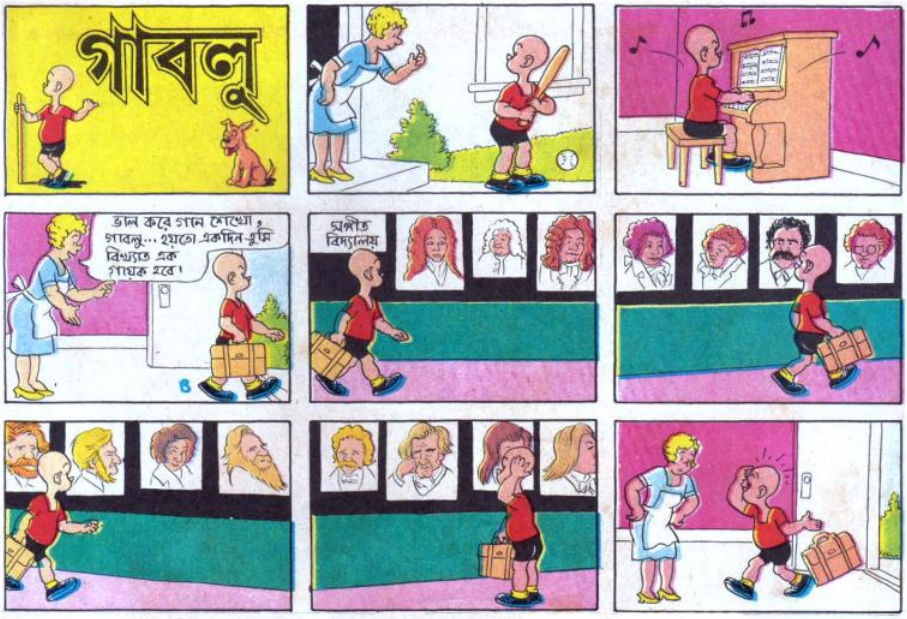
গাবলু
ভাল করে গান শেখো, গাবলু... হয়তো একদিন তুমি বিশ্বের এক গায়ক হবে।
সঙ্গীত বিদ্যালয়

গাবলু
হায় ভগবান! গাবলু, সঙ্গে ছাতা থাকতেও তুমি এত ভিজলে কী করে?

গোয়েন্দা তাতারের দ্বিতীয় অভিযান

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

যে-লোক দুটো তাতারকে ধরেছিল তাদের বলিষ্ঠ বাহুর চাপে তাতারের দম বন্ধ হয়ে এল। লোক দুটো ওকে ধরে সজোরে এক ধাক্কায় ঠেলে দিল ঘরের ভেতর।

তাতারের পরিচিত সবাই তো আছে সে-ঘরে। সেই ন্যাড়ামাথা মঞ্জু, অ্যাসিডে-পোড়া জুলি, গাল-কাটা বব, ভিকি এবং আরও দু-একজন।

ওদের ধাক্কার বেগ সামলাতে না পেরে তাতার এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মঞ্জুর পায়ে।

রক্তচক্ষু মঞ্জু ওর চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলল। তারপর ঠাসঠাস

করে দু'গালে দুটো চড় মেরে বলল, "এত দূর স্পর্ধা ! এখান পর্যন্ত ধাওয়া করেছিস তুই ?"

তাতার তখন আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে।

মঞ্জু বলল, "বল, এখানে কী করে এলি ?"

তাতার কথা বলবে কী ? মার খেয়ে ওর তখন কান মাথা ভোঁভোঁ করছে।

"বল, তোর সঙ্গে আর কে কে আছে ?"

অতি কষ্টে কাঁপা-কাঁপা গলায় তাতার বলল, "কেউ নেই। আমি একা।"

"এখানে কী করতে এসেছিস ?"

"বিশ্বাস করুন, অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই আমার। শুধু সোনাইয়ের খোঁজে এখানে এসেছিলাম।"

মঞ্জু হুঙ্কার দিয়ে বলল, "কিন্তু এলি কী করে ?"

তাতারের ঠোঁট কেঁপে উঠল। ঘরের ভেতর আর যারা ছিল তাদের সকলকে একবার ভয়ে-ভয়ে দেখল তাতার। তারাও সবাই ওর মুখের কথা শোনবার জন্য হাঁ করে আছে ওর দিকে।

"বল কী করে এলি ?"

তাতার নিরুত্তর।

মঞ্জু বলল, "আমি ভেবে পাচ্ছি না ওই হিংস্র কুকুরগুলোর গ্রাস থেকে তুই ছাড়া পেলি কী করে ?"

জুলি বলল, "তখন ওগুলো চিৎকার করছিল বলে বাহাদুর নিশ্চয়ই ঘরে ঢুকিয়েছে ওদের।"

"দ্যাখ তো জুলি, ব্যাপারটা কী।"

অ্যাসিডে পোড়া জুলি বলল, "দাঁড়ান, দেখছি কী ব্যাপার।" বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর ফিরে এসে বলল, "শয়তান ছেলেটা কুকুরগুলোকে বিষ খাইয়েছে মঞ্জুদা।"

মঞ্জু বোমার মতো ফেটে পড়ল এবার, "আমার হান্টারটা নিয়ে আয় তো। ওকে আমি চাবকে শেষ করব।"

দানবের শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াল মঞ্জু।

ওর ওই ভয়াবহ মূর্তি দেখে তাতারের মনে হল এক্ষুনি ও জ্ঞান হারাবে বুঝি।

মঞ্জু উঠে দাঁড়াল। তারপর ভীষণ উত্তেজনায় একবার ঘরময় পায়চারি করে আবার এসে বসল। বলল, "দাঁড়া, তোর বেশ ভালরকম ব্যবস্থা করছি।" বলেই ঘরের লোকগুলোকে বলল, "লালজিকো বুলাও।"

ভিকি উঠে গেল লালজিকে ডাকতে। এবং কিছু সময়ের মধ্যেই লালজিকে ডেকে আনল।

মেঘের মতো কালো বিশাল শরীরের ভয়াবহ লালজি একটা চওড়া পাড় ধুতি ও নেটের গেঞ্জি পরে পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। ভিকির ডাকে কুতকুতে লাল চোখে উঠে এসে ঘরে ঢুকলেন। মানুষের শরীরের ভেতর কোনও হিংস্র দানব যে কীভাবে লুকিয়ে থাকে, তা লালজিকে না দেখলে ধারণা করা যাবে না। লালজি তাতারের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে রসকষহীন গলায় বললেন, "এহি হ্যায় ও ছোকরা ?"

"জি হাঁ।"

"ক্যা নাম হ্যায় তুমহারা ?"

"তাতার।"

মঞ্জু বলল, "এই ছেলেটাকে আর বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হবে না লালজি। এর সঙ্গে আরও দুটো ছেলে আছে। এরা আমাদের অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। অনেক-কিছু দেখেছে। কাল তো আর-একটু হলেই ধরে ফেলত ভিকিকে। তাই..."

লালজি গম্ভীর গলায় আদেশ দিলেন, "মার ডালো উসকো। আভি।"

তাতার চিৎকার করে উঠল, "না,না। আমাকে মেরো না। আমি তোমাদের কী এমন ক্ষতি করেছি যে আমাকে মেরে ফেলবে ?"

লালজি ধমক দিলেন, "স্টপ।"

মঞ্জু গম্ভীর গলায় বলল, "এই কে আছিস, বাইরেটা একবার ভাল করে দ্যাখ তো আর কেউ আছে কি না। যদি থাকে দেখলেই গুলি করবি।"

মঞ্জুর কথা শুনে দু'জন বন্দুকধারী ছুটে গেল বাইরেটা দেখতে। একবার বারান্দার ওপর থেকে নীচেটা দেখল। কিন্তু পাঁচিলের আড়াল থাকায় বাইরের অবস্থাটা ঠিক বোঝা গেল না। তাই দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে নেপালি দরোয়ানের ঘরের শিকল খুলে ওকে ডেকে তুলল। তারপর ওর কাছ থেকে চাবিটা চেয়ে নিয়ে গেট খুলে যেই না বাইরে বেরোল, অমনি সেই অন্ধকারে অতর্কিতে ওদের ওপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ডগার।

আক্রমণ করতে এসে এইভাবে যে পালটা আক্রমণের বলি হতে হবে তা ভাবতেও পারেনি ওরা। তাই ডগারের আক্রমণে বন্দুক ছিটকে পড়ল হাত থেকে। তারপর নিমেষের মধ্যে ডগারের কামড়ানির চোটে ওদের দুটি দেহ দগদগে ঘায়ের মতো হয়ে উঠল। ওরা প্রাণ বাঁচাবার বৃথা চেষ্টা জেনেও যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে দৌড়ল।

ডগারও ভয়ঙ্করভাবে তাড়া করল ওদের।

দেবু ও শঙ্কু এই মুহূর্তে কী করবে কিছু ভেবে পেল না। ওদিকে পাঁচিলের ওপর মালিনী অস্থিরভাবে ছুটোছুটি করছে তখন।

আর তাতার ?

ওর তো মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়েছে। তবুও করুণ মিনতি করছে ওদের কাছে, "ছেড়ে দাও। তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কারও কাছে বলব না তোমাদের কথা। আর কখনও এদিকে আসব না। কেউ কিছু জানতে পারবে না। আমাকে একবার আমার মা-বাবার কাছে যেতে দাও।"

মঞ্জু বলল, "আমরা একবার কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিলে কোনও কিছুতেই সেই দণ্ডাদেশ আর ফিরিয়ে নিই না।"

তাতার জানে ওরা এই কথাই বলবে। ওদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাওয়া মানেই অরণ্যে রোদন করা। ও জানে ঘাতকের পায়ে মাথা খোঁড়া একটা নিষ্ফল প্রচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু তবু এই মুহূর্তে ওর মরতে বড় ভয় করল। তাই মনে-মনে দুর্বল হয়ে ব্যর্থ হবে জেনেও প্রার্থনা করল ওদের কাছে।

লালজি বললেন, "উসকো শিরা (গলা) কাটকে ডাস্টবিনমে ফিক্ দো।"

মঞ্জু শয়তানের হাসি হেসে বলল, "না। অত সুখের মৃত্যু ওর জন্য নয়। ওকে এমনভাবে মারতে হবে যাতে ও তিল তিল করে মরে। অথচ ডেডবডি পাওয়া না যায়। ডাস্টবিনে ওর লাশ পাওয়া গেলে কাল সকালে জানাজানি হয়ে যাবে সব। তখন পুলিশের ঝক্কিটা পোহাকে কে ?"

"তব ক্যা করোগে ?"

"আমি ওকে বস্তায় পুরে সেই বস্তার মুখ বেঁধে মতিঝিলে ফেলে দেব। দম বন্ধ হয়ে একটু-একটু করে ও মরবে। অথচ ডেডবডিও খুঁজে পাবে না কেউ।"

লালজি বললেন, "ঠিক হ্যায়। ওহি কাম করো।"

মঞ্জু বলল, "জুলি আর বব, এ-কাজের দায়িত্ব তোমাদের দু'জনের ওপর দেওয়া হল।"

অ্যাসিডে-পোড়া জুলি আর গাল-কাটা বব ঘাড় নেড়ে জানাল তারা রাজি। ভিকি তক্ষুনি একটা বড়সড় চালের বস্তা এনে ওদের দিল।

ওরা জোর করে তাতারকে ঢুকিয়ে দিল তার ভেতর। তারপর চল্লিশ কেজি ওজনের একটা বাটখারার সঙ্গে বস্তার মুখ বেঁধে ধরাধরি করে ওকে নীচে নামাল। উঠোনের মধ্যেই একপাশে অন্ধকারে অ্যাম্বাসাডার গাড়ি ছিল একটা। ওরা বস্তা-বন্দী তাতারকে সেই গাড়িতে তুলে ঝড়ের বেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলল গাড়িটা।

অসহায় তাতার মৃত্যুর প্রহর গুনতে লাগল।

মতিঝিল এখান থেকে খুব বেশি দূরে তো নয়। তাই মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল মতিঝিলে। এই কুখ্যাত মতিঝিলের অতল গভীর জলে কত মানুষের জীবনান্ত যে হয়েছে তার ঠিক নেই। শুধু স্নান করতে এসেই ডুবে মরেছে কত লোক। আবার কত লোককে মেরে-কেটেও ফেলে রেখে গেছে এই মতিঝিলে। শহরের এক প্রান্তে নির্জন এই মতিঝিলে জনমানুষের চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না। তায় এই গভীর রাতে কেউ-ই ছিল না সেখানে।

মতিঝিলের কাছে অ্যাম্বাসাডার থামিয়ে বস্তা-বন্দী তাতারকে টেনে আনল জুলি ও বব। তারপর বহু কষ্টে দু'জনে মিলে ধরাধরি করে ঝিলের উঁচু বাঁধে ওঠাল।

তাতার শেষবারের মতো ওর মা-বাবা ও টিঙ্কুর কথা মনে করল। সেই সঙ্গে মনে-মনে ধিক্কার দিল নিজেকেই। যে মানুষ নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারে তাকে কে বাঁচায়? এইভাবে বোকার মতো ওইরকম একটা শত্রুপুরীতে ঢুকে পড়াটাই ভুল হয়েছে ওর। অথচ এখন ওকে রক্ষা করার মতো কেউ নেই। না ডগার, না মালিনী, না ওর বন্ধুরা, না কোনও ভগবান।

তবু এই চরম মুহূর্তেও হঠাৎ একটু আশার আলো দেখতে পেল। জুলি ও বব-এর কথাবার্তা কানে এল ওর।

বব বলল, "এটা কিন্তু বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল মঞ্জুদার। দু-এক ঘা দিয়ে ছেড়ে দিলেই তো পারত।"

জুলি বলল, "ছেড়ে দিলেই কেলেঙ্কারি হয়ে যেত। এরা সব জেনে ফেলেছে।"

"জানলেই বা। জেনে ফেলেই বা করবেটা কী শুনি? পুলিশ তো এদের থেকেও অনেক বেশি জানে আমাদের। কী করতে পেরেছেটা আমাদের? তবে কাদের ভয়ে এইভাবে মেরে ফেলা?"

"দ্যাখ বব, এসব নিয়ে মাথা ঘামাস না। আমরা যা করতে এসেছি করে চলে যাই চল।"

"এ-কাজে আমার কিন্তু একটুও সমর্থন নেই।"

"তা হলে তুই কী করতে চাস? কী তুই বলতে চাস স্পষ্ট করে বল?"

"আমি বলি কি, ছেলেটাকে আমরা মুক্তি দিই আয়। কী সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটা। দেখে মায়া হয়। আমরা খারাপ সঙ্গে পড়ে খারাপ হয়েছি। আমাদের দরকার নেটি। শুধু-শুধু এইভাবে পাপের বোঝা বাড়িয়ে লাভ কী? ওঁদের যা মাথায় আসবে তাই হুকুম করবেন, আর হাত কালো করব আমরা?"

"সে তো বুঝলুম। কিন্তু ফিরে গিয়ে বলবি কী? ও তো ছাড়া পেলেই বাড়ি ছুটবে, আর ওর বাপ-মা যাবে থানায়। তারপর?"

"তারপর যা হবার তাই হবে। এইসব দেখেশুনে আজকাল আমার কী মনে হয় জানিস? মনে হয়, আমি নিজেই গিয়ে পুলিশে ধরা দিই। সব কথা খুলে বলি।"

"সর্বনাশ! তার মানে ভেতরে ভেতরে তুই আমাদের জেলের ঘানি টানাবার স্বপ্ন দেখিস?"

বব হাসল। বলল, "এক-একসময় তাই মনে হয়।"

এখন তা হলে কী করতে চাস?"

"ছেলেটাকে মুক্তি দিতে চাই।"

"মঞ্জুদাকে গিয়ে কী বলবি তা হলে?"

"সত্যি কথাই বলব। যে হঠাৎ কুকুরের তাড়া খেয়ে বা লোকজন এসে পড়ায় ছেলেটাকে ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছি আমরা।"

"ঠিক বলেছিস।" বলেই বলল, "দ্যাখ তো বব! মনে হচ্ছে কে যেন আসছে এদিকে।"

বব চমকে ফিরে তাকিয়ে বলল, "কই, কোথায় কে?"

"দেখতে পাচ্ছিস না? ওই দ্যাখ।" বলে একটা ছোরা বার করে অতর্কিতে ববের পিঠে গেঁথে দিল জুলি।"

বব আর্তনাদ করে উঠল।

জুলি বলল, "বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস কে আসছে? যে আসছে সে তোর মৃত্যুদূত।"

বব মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

জুলি ডাকল, "প্রেমজি! প্রেমজি!"

ড্রাইভার প্রেমজি এগিয়ে এল এবার, "ফরমাইয়ে।"

"ধরো দেখি বস্তাটা। বেশ শক্ত করে ধরো। একটু দূরে সরে ফেলতে হবে।"

প্রেমজি ও জুলি বস্তাবন্দী তাতারকে সেই চল্লিশ কেজি বাটখারা সমেত মতিঝিলে নিক্ষেপ করল। এই ঘন অন্ধকারে এমনভাবে একটি কিশোরের সলিল সমাধি হল যে, কাক-পক্ষীতেও তা জানতে পারল না। শুধু মৃত্যুপথযাত্রী ওই আহত বব ছাড়া। এই ঘোর অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে মতিঝিলের জলে সামান্য ক'টি বুদবুদ উঠল বুঝি। তারপর সব স্থির হয়ে গেল।

এই ঘটনা ঘটে যাবার কিছু পরেই দেখা গেল একজন পুলিশ ইনসপেক্টর চারজন বন্দুকধারী কনস্টেবলকে নিয়ে লালমহলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। গেটের দরজা ভেতর থেকেই বন্ধ ছিল। ইনসপেক্টর একবার 'কুকুর হইতে সাবধান' লেখাটির দিকে তাকালেন। তারপর গেটের ওপর দুমদাম করে বুটের লাথি মারলেন কয়েকটা।

লাথির পরেই সেই নেপালি দারোয়ানটা দরজা খুলে বেরিয়ে এল, "ক্যা মাংতা।"

ইনসপেক্টর বললেন, "অন্দর মে কোই হ্যায়?"

পুলিশ দেখে তো দরোয়ানের বুক শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। তাই কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "হ্যায়। উপরমে।"

"পহলে কুত্তা সামাল।"

"ও সব মর চুকা বাবু।"

"ঠিক?"

"জি হাঁ।"

ইনসপেক্টর কনস্টেবলদের নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। তারপর বললেন, "কাঁহা হ্যায় ও লোগ? সাথ লে কে চলো।"

দরোয়ান পুলিশ নিয়ে ওপরে উঠল।

পুলিশ দেখেই তো চক্ষুস্থির সব।

জুলি সবেমাত্র ফিরে এসে তার বৃত্তান্ত পেশ করছে। এমন সময় এই অশুভ আবির্ভাবে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর মুখ। ড্রাইভার প্রেমজিও কাঁপতে লাগল থরথর করে।

ইনসপেক্টর প্রথমেই গিয়ে ধরলেন সেই দু'জন বন্দুকধারীকে। যারা বাড়ি পাহারা দিচ্ছিল। বললেন, "এত রাতে বন্দুক নিয়ে তোমরা

কী করছ ?"

"আজ্ঞে।"

"লাইসেন্স আছে বন্দুকের ?"

"ওসবের আমরা কিছু জানি না। আমরা বডিগার্ড মাত্র।" লালজি সব জানে।"

"এ-কথা বললে তো পুলিশ শুনবে না ভাই। তোমাদের কাছে বন্দুক থাকবে, আর লাইসেন্স দেখাবে অন্য লোক ? দেখি বন্দুকগুলো ?"

ইনসপেক্টর ওদের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে বললেন, "এ-মাল তোমরা কোথায় পেলে ? এ তো তোমাদের কাছে থাকবার কথা নয়।"

"আপনার যা কিছু জিজ্ঞেস করবার লালজিকে করুন।"

লালজি তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর সেই ভয়ঙ্কর ভাবটা এখন আর অতটা নেই। তবুও একটু ভারিক্কি গলায় বললেন, "আপনারা কোথা থেকে আসছেন ?"

"সেটা কয়েক ঘা রুলের গুঁতো পড়লেই বুঝতে পারবেন।"

লালজি এবার একটু হেসে বললেন, "না, মানে একটু অচেনা মুখ দেখছি কিনা তাই।"

"তাই এই রাতদুপুরে আমিই আপনার সঙ্গে একটু জান-পহছান করতে এলাম। আপনিই লালজি ?"

"জি হাঁ। লেকিন...।"

"লেকিন-ফেকিন কিছু নেই। আপনার কাছেই এসেছি আমি। আপনাকে যে এভাবে পাব, তা ভাবতেও পারিনি। কেননা, গভীর জলের মাছ তো আপনি।"

লালজি বললেন, "আসুন, আসুন। ভেতরে আসুন। তা হঠাৎ আমার এই গরিবখানায় আপনাদের মতন লোকের পায়ের ধুলো দেবার মানেটা কী ?"

ইনসপেক্টর এবার গম্ভীর গলায় বললেন, "সেটা এক্ষুনি জানতে পারবে। তবে তার আগে যা জিজ্ঞেস করব তার সঠিক উত্তর দেবে। মিথ্যে কথা বললে যা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে এমন পেটাব যে, পুবের সূর্য উত্তরে দেখতে হবে।"

মঞ্জুর চোখে আগুন জ্বলে উঠল এবার। বলল, "আপনি কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলছেন তা জানেন ? নতুন আমদানি হয়েছেন বুঝি ?"

ইনসপেক্টর বললেন, "নতুন কি পুরনো সেটা যখন লকআপে ঢুকিয়ে নেঙড়াব, তখন বুঝতে পারবি। আমি থানার দারোগা নই। ভিজিলেন্সের ও· সি·।"

লালজি এবার একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "আঃ মঞ্জু ! নিসপেক্টরবাবুর সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে তোমাকে কে বলল ? আপনি ওর কথায় কুছু মনে করবেন না সার। বলুন আমার কী গোস্তাকি হল ?"

"ওই মেয়েটা কোথায় ?"

মঞ্জু রেগে বলল, "জাহান্নমে।"

ইনসপেক্টর বললেন, "এই ! একদম গরম নিবি না। তোর ন্যাড়া মাথা আমি চ্যাপটা করে ছেড়ে দেব তা হলে। ছালচামড়া ছাড়িয়ে নেব কেন, বল শিগগির মেয়েটা কোথায় ?"

লালজি বললেন, "হামি বতাচ্ছি বাবু। হামি শিউজির নাম নিয়ে বলছি, ওসব লেড়কি-টেঁড়কির ব্যাপারে হামি নাই। উসবের কুছু হামি জানে না।"

ইনসপেক্টর বললেন, "এবার তা হলে সোজা আঙুল বেঁকানো যাক, কী বলো ?"

মঞ্জু বোমার মতো ফেটে পড়ল, "ই-ন-স-পেক্টর- !"

ইনসপেক্টর একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন মঞ্জুকে। তারপর মসমস করে ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে রুলের বাড়ি মুখের ওপর মারলেন এক ঘা। তারপর বললেন, "আর একবার গরম হয়েছিস কি ময়দার মতন নরম করে দেব একেবারে।"

মঞ্জু পালটা আক্রমণ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু সঙ্গের কনস্টেবলরা ওর দিকে বন্দুক তাক করতেই থেমে গেল ও।

ইনসপেক্টর বললেন, "অনেকদিন ধরে অনেক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিস তোরা। বস্তি পোড়াচ্ছিস, ছেলেমেয়ে চুরি করছিস, খুন করছিস। সব খবর আছে আমার কাছে। এখন ভাল চাস তো বল সোলেমানের মেয়েটা কোথায় ?"

লালজি এবার আবার নিজমূর্তিতে ফিরে এলেন। বললেন, "শুনুন নিসপেক্টরবাবু ! এই লালমহলে ঢুকে কোনও পুলিশ আমার সঙ্গে কখনও এইভাবে কথা বলেনি। কিন্তু আমার মালুম হচ্ছে আপনি আমার পরিচয়টা ঠিকমতো জানেন না। আপনি যেখান থেকেই আসুন না কেন, আপনার বারোটা বাজাবার ক্ষমতা হামি হাতে রাখি। লেকিন পুলিশের সঙ্গে দুশমনি হামি চাই না। তাই আপনাকে রসগোল্লা খাবার জন্যে পাঁচ হাজার রুপিয়া হামি দিয়ে দিচ্ছি। এই নিয়ে সন্তোষ করে আপনি চলে যান। আর কখনও এদিকে আসবার চেষ্টা আপনি করবেন না। এলে আপনার বিপদ হবে।"

ইনসপেক্টর বললেন, "তাই নাকি। ঠিক আছে। আপাতত টাকাটা তো দিন। পকেটে পুরি। তারপর দেখা যাবে।"

লালজি বললেন, "ভিকি, নিসপেক্টরবাবুকো পাঁচ হাজার রুপিয়া দে দো।"

ভিকি আদেশ পেয়ে উঠে গেল। তারপর কিছু সময়ের মধ্যেই পাশের কোনও ঘর থেকে টাকাটা নিয়ে এসে তুলে দিল ইনসপেক্টরের হাতে।

ইনসপেক্টর টাকার বাণ্ডিল নিয়ে পকেটে পুরলেন। তারপর বললেন, "শোনো লালজি, আমার কাজই হচ্ছে খেতেও খাব মারতেও মারব। খাওয়া হয়ে গেছে। এখন বলো মেয়েটা কোথায় ? ওকে আমার চাই।"

লালজি বললেন, "নিসপেক্টর ! আপনি আমার সঙ্গে বেইমানি করলেন ?"

"আমি সবার সঙ্গেই এইরকম করে থাকি। এটা কোনও নতুন ব্যাপার নয়। এখন ভাল চাস তো মেয়েটার খবর দে। না হলে বেধড়ক পেটানি শুরু করলাম বলে। রাম-দুই-তিন...।"

লালজি বললেন, "বলছি বলছি। লেকিন ওকে তো আর পাওয়া যাবে না সার। আমরা বিশ হাজার রুপিয়ায় এক সার্কাস কম্পানিতে ওকে বিক্রি করে দিয়েছি।"

"সে এখন কোথায় ?"

"তা তো বলতে পারব না। তবে ও এখন কলকাতার বইরে।"

ইনসপেক্টর একটু সময় কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "ঠিক আছে। আমি বেলায় আসছি।" বলে ভিকির কাছ থেকে একটা তালাচাবি চেয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দরজা বন্ধ করে তালা দিলেন।

ভেতরের ওরা সবাই চেঁচাতে লাগল, "এ কী ! দরজায় তালা দিচ্ছেন কেন ? আমরা বাথরুমে যাব কী করে ? ঢের-ঢের পুলিশ অফিসার দেখেছি আমরা কিন্তু এরকম তো দেখিনি।"

ইনসপেক্টর ধমক দিয়ে বললেন, "চোপ ! বদমাশ কোথাকার। আমি পুলিশ অফিসার তোদের কে বললে ? পুলিশ অফিসারের খেয়েদেয়ে কাজ নেই রাত দুপুরে তোদের ধরতে আসবে। পুলিশ যদি ধরত তোদের তা হলে তোরা এত বাড়তে পেতিস ?"

মঞ্জু তাড়াতাড়ি ছুটে এল জানলার কাছে। বলল, "তোমরা তা হলে কারা ?"

ইনসপেক্টর বললেন, "ওরে বুদ্ধু, আমাদের তোরা চিনবি কী করে ? থিয়েটারের ড্রেস পরে নকল বন্দুক নিয়ে তোদের সঙ্গে নকশা মারতে এসেছিলাম। তা মাঝখান থেকে হাজার-পাঁচেক টাকা তো ফালতু লাভ হয়ে গেল। এখন মেয়েটা কোথায় আছে বলতে পারিস ভাল, না হলে তালাবন্ধ থাকবি দিনের পর দিন। ভেবে দ্যাখ, কী করবি।"

লালজি বললেন, "লেকিন তুম হো কৌন। মেরা সাথ দোস্তি তো করো।"

ইনসপেক্টর বললেন, "আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ তো নেই, তোমার সঙ্গে যাব দোস্তি করতে। এখন পোলট্রির মুরগির মতন এই ঘরের ভেতর থাকো, তারপর দুপুরের ভেতরে পাকা খবর না পেলে এক-এক করে জবাই করব সব্বাইকে।"

ইনসপেক্টর সঙ্গের ছদ্মবেশী কনস্টেবলদের সঙ্গে নিয়ে নেমে এলেন নীচে। সেই নেপালি দরোয়ানটা হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। তাকে বললেন, "এই ! বাড়ির চাবির গোছা কার কাছে ?"

"বাবুজি, ওসব ও লোগ্‌নকা পাশ হ্যায়।"

"হুঁ। ওরা একটা মেয়েকে চুরি করে এনেছে। তাকে কোথায় রেখেছে বলতে পারিস ?"

"মুঝে মালুম নেহি বাবু। লেকিন ও হিঁয়া নেহি হ্যায়।"

"তুই এখানে কী কাজ করিস ?"

"দরোয়ান কা কাম।"

"যা, ভাগ হিঁয়াসে। ইধার কভি মাত আনা।"

নেপালি দরোয়ান তার তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে পালাল।

ওর কাছ থেকে গেটের চাবিটা নিয়ে গেট বন্ধ করে বাইরের থেকে তালা দিল ওরা।

তখন ভোরের আলো একটু-একটু করে ফুটে উঠছে।

ইনসপেক্টর এবং তার চারজন কনস্টেবল রাস্তায় এসে হঠাৎ একটি ট্যাক্সি পেয়ে তাতে উঠে পড়ল।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার বলল, "বলুন সার, কোথায় যাবেন ?"

ইনসপেক্টর বললেন, "আমি আবার সার কবে থেকে হলুম জগাদা ? বলি, চেনা লোককেও চিনতে পারছ না যে ?"

ড্রাইভার এবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে হোহো করে হেসে উঠল, "আরে সেন্টু ! তুই এমন সময় এই বেশে ! বলি ব্যাপারটা কী ?"

সেন্টুদা বলল, "আরে ! আজ এক জায়গায় একটা শো ছিল আমাদের। শেষ হতে-হতেই ভোর হয়ে গেল। তা ভাবলাম ড্রেস চেঞ্জ না করলে ট্যাক্সি একটা পাবই। তোমাদের তো হাত দেখালেও থামো না দাদা। কিন্তু থানার বাবুরা হাত দেখালে শ্রদ্ধা তোমাদের উথলে ওঠে।"

"যাঃ। কীসব যা-তা বলছিস।"

সেন্টুদারা ট্যাক্সিতে উঠে সোজা বাড়ি চলে এল। সেখানে ড্রেস চেঞ্জ করে সেন্টুদা দলের লোকেদের বলল, "তোরা পোশাকগুলো নিয়ে যা। আর ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা বন্দুক দুটো আমার কাছেই থাক। সময়মতো পুলিশের হাতে পৌঁছে দিলেই হবে। কিন্তু দেবেটা কে ?"

ড্রাইভার জগাদা বলল, "আরে আমাকে দাও তো। আমিই দিয়ে দেব। বলব, গাড়ি নিয়ে আসবার সময় নতুন রাস্তার ধারে ঝোপের কাছে পড়েছিল। কুড়িয়ে এনে জমা দিচ্ছি। এতে আমারও দাম বেড়ে যাবে।"

"সেই ভাল।"

"কিন্তু ব্যাপারটা কী সেন্টুবাবু ? আমি কিন্তু অন্যরকম গন্ধ পাচ্ছি।"

সেন্টুদা বলল, "পরে একদিন তোমাকে সব কথা খুলে বলব জগাদা। তবে জেনে রেখো, আমি কিন্তু আবার আমার আগের লাইনে ফিরে যাইনি।"

সকলকে বিদায় দিয়ে সেন্টুদা বিজয়গর্বে বুক ফুলিয়ে তাতারদের বাড়ির সামনে এল, "তাতার ! তাতার !"

ওদের বাড়ির পরিবেশটা তখন কী বিশ্রী রকমের থমথম করছে।

সেন্টুদার গলা পেয়েই ছুটে এলেন নন্দা দেবী, "সেন্টু ! সেন্টু এলে ! আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে সেন্টু !"

"কেন ? কী হয়েছে ?"

"আমার তাতার নেই।"

"তার মানে ?"

"আমার তাতারকে ওরা কোথায় নিয়ে গেছে কে জানে ? ওকে ওরা নিশ্চয়ই মেরে ফেলেছে।"

"এ হয় না। হতে পারে না মাসিমা। ঠিক করে বলুন। বলুন, কী হয়েছে। আমি তো কাল সন্ধেবেলা ওকে বলেই গেলুম সোনাইয়ের ব্যাপারটা আমি দেখছি। তারপরে...।"

"হ্যাঁ। তার পরেই যা হবার হয়েছে। এখন কী করব তুমি বলে দাও। শঙ্কু আর দেবুর মুখে সব শোনো।"

দেবু আর শঙ্কু কাঁপছিল।

টিঙ্কু তো আছাড়-কাছাড় করছে।

শ্যামবাবু একেবারেই নীরব।

সেন্টুদা বলল, "ব্যাপারটা কী ? কী হয়েছে রে ?"

দেবু, শঙ্কু সব বলল।

শুনে থরথর করে কাঁপতে লাগল সেন্টুদা। তারপর বলল, "ওর জন্য আপনি কোনও চিন্তা করবেন না মাসিমা। ওই দুষ্কৃতীগুলোকে আমি ওদেরই ঘরে তালা বন্ধ করে এসেছি। ওদের নাকে ছুঁচ ঢুকিয়েও কথা আদায় করব আমি। যেভাবেই হোক তাতারকে ফিরিয়ে আমি আনবই।"

শ্যামবাবু বললেন, "আমি কি একবার থানায় যাব সেন্টু ?"

"হ্যাঁ। নিশ্চয়ই যাবেন। তবে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করুন।"

"কত দেরি হবে তোমার ?"

"যত দেরিই হোক আমি না ফেরা পর্যন্ত ঘর থেকে বেরোবেন না।"

সেন্টুদা বাইক নিয়ে এসেছিল ওদের বাড়ি। তাই হনহন করে লন পেরিয়ে বাইকে উঠতেই মালিনীও কোথা থেকে ছুটে এসে লাফিয়ে উঠল বাইকের পিছনে। সেন্টুদা ঝড়ের বেগে বাইক নিয়ে উধাও হয়ে গেল। কোথায় গেল, কেন গেল, কী বৃত্তান্ত কেউ তার কিছুই টের পেল না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে সেন্টুদা যখন আবার ফিরে এল, সে তখন রণক্লান্ত। কেমন যেন মাতালের মতো টলছে।

শ্যামবাবু উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, "কী খবর সেন্টু ! তুমি এমন করছ কেন ?"

সেন্টুদা একটু সময় চুপ করে থেকে বলল, "খুব খারাপ খবর মেসোমশাই। তাতারকে উদ্ধার করতে পারলাম না। তবে যারা ওকে সলিলসমাধি দিয়েছে আমি তাদের প্রত্যেককে প্রায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে এসেছি। কারও চোখ, কারও হাত, কারও পা... । যাক। আপনি আর দেরি করবেন না। সোজা থানায় চলে যান। আর এই

নিন লালমহলের চাবি।"

শ্যামবাবু কাঁপা-কাঁপা হাতে চাবিটা নিয়ে বললেন, "তাতার তা হলে সত্যিই নেই?"

নন্দা দেবী জ্ঞান হারালেন।

সেন্টুদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুমালের খুঁটে চোখের জল মুছে বলল, "আমার কথা পুলিশকে কিছু বলবেন না মেসোমশাই। আমি পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

শ্যামবাবু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সেন্টুদা গেটের দিকে এগোল।

এবার তাতারের কথায় আসা যাক। অল্প বয়সে সাঁতার শিখে রাখাটা যে ছোট্ট একটি কিশোরের জীবনে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কতখানি সহায়ক তাতারই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অন্তিম মুহূর্তেও জীবের ধর্মই এই যে, বাঁচার জন্য শেষবারের মতো একবার চেষ্টা করা। তাতারও তাই করল।

জুলি আর ববের কথায় মরীচিকার মতো ক্ষণিকের একটু আশার আলো দেখতে পেয়েও তাতার যখন বুঝল নিষ্ঠুর নিয়তি ওকে নিতান্তই বিপাকে ফেলার চেষ্টা করছে, তখনই ওর উপস্থিত বুদ্ধিটাকে কাজে লাগল ও। হিপ পকেটে রাখা সেই পেনসিল-কাটা ছুরিটা বার করে অপেক্ষা করতে লাগল জলে পড়ার মুহূর্তটির জন্য। তাই যে মুহূর্তে ওরা ওকে জলে ফেলল তাতার তখনই ছুরি দিয়ে বস্তা কেটে বেরিয়ে এল তার ভেতর থেকে। কোনওরকম শব্দ না করে একটু সময় ডুব সাঁতার দিয়ে মাথাটা যখন তুলল তখন দেখল কেউ নেই। তারপর কিছু সময় ভেসে থাকার পর মোটর গাড়ির চলে যাবার শব্দ কানে আসতেই নির্ভয়ে সাঁতার কেটে ডাঙায় উঠল সে। মুক্তির আনন্দে এবং পুনর্জন্ম পেয়ে সর্বপ্রথম হাত দুটো জোড় করে রাতের চাঁদটাকে প্রণাম করল সে।

জল-সপসপ শরীরে ধীরে-ধীরে বাঁধের ওপর উঠে এল তাতার। এসে দেখল, একজন লোক ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে টলতে টলতে অতি কষ্টে এগিয়ে চলেছে।

তাতার ছুটে গিয়ে লোকটাকে ধরল।

লোকটা আর কেউ নয়, বব।

বব সবিস্ময়ে বলল, "এ কী! তুমি বেঁচে আছ?"

তাতার বলল,"হ্যাঁ, ববদা। বেঁচে আছি। বস্তার ভেতর থেকে আমি তোমাদের কথা সব শুনেছি। তুমি আমার জীবন রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলে। আর সেইজন্যেই তোমার এই অবস্থা।"

বব বলল, "তুমি এক কাজ করো দিকিনি, আমার পিঠে ছোরাটা খুব জোর গিঁথে দিয়েছে শয়তানটা। এটাকে হেঁচকা একটা টানে খুলে দাও দিকিনি। আমি তো পারছি না। কোনওরকমে এ-যাত্রা যদি বাঁচি তবে ওদের হাড়ে আমি ঘুণ ধরিয়ে ছাড়ব।"

তাতার বলল, "তুমি একটু বোসো। না বসলে ঠিক কায়দা করতে পারব না।"

বব বসল। তাতার ববের নির্দেশমতো হ্যাঁচকা একটা টান দিয়ে বার করল ছোরাটা। প্রচন্ড ব্লিডিং হচ্ছে তখন ববের পিঠ বেয়ে।

বব বলল, "তুমি আমার সঙ্গে এসো। আমার এক বন্ধু থাকে এখানে। আড়ুপাড়ার কাছে। একটু কষ্ট করে তুমি আমাকে ধরে ওখানে পৌঁছে দাও। তা ছাড়া এখন এই অন্ধকারে একা তোমার পক্ষে বাড়ি ফিরে যাওয়াও ঠিক না।"

তাতার বলল, "আমি তো এখনই বাড়ি ফিরতে চাই না ববদা। তোমাকে তোমার বন্ধুর বাড়িতে পৌঁছে দেব। ভাল ডাক্তার দেখিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধাব তারপর যাব। তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করতে চেয়েছিলে, তাই তোমার জন্য আমি নিশ্চয়ই কিছু করব। তা ছাড়া আমি চাই তুমি শিগগির ভাল হয়ে ওঠো। কেননা, তোমাকে আমার বিশেষ দরকার।"

বব বলল, "এমন অতর্কিতে ছুরিটা মেরেছে আমায় যে আমি ধাঁধিয়ে গেলাম। তাই ওকে পালটা আক্রমণ করতে পারিনি। কী ভাগ্যিস, গুলি করেনি। রিভলভারটা বোধ হয় সঙ্গে ছিল না ওর।"

তাতার বলল, "ববদা, তুমি খারাপ লোকেদের সঙ্গে থাকলেও সত্যিই তুমি ভাল লোক। তাই শেষ মুহূর্তে বেঁচে গেলে। আর আমার কপালে যেটুকু বিপর্যয় ঘটল তা শুধু আমার বুদ্ধির দোষে। কোনও অবস্থাতেই অত বেশি বেপরোয়া হতে নেই। শুধু ভগবান রক্ষা করেছেন আমায়।

বব বলল, "কয়েকটা দিন যাক। একটু সুস্থ হই। তারপর ওদের ব্যবস্থা আমি করছি। দরকার হলে ওদের সব ক'টাকে খুন করে জেলে যাব আমি।"

তাতার বলল, "কিন্তু তার আগে তুমি আমাকে একটা খবর দাও ববদা। সোলেমানের সেই মেয়েটা কোথায়? ওকে খোঁজার জন্যই আমি কিন্তু এসেছিলাম এখানে। তোমাদের বিপদে ফেলার জন্য নয়। তুমি হদিস দিলেই ওকে আমি উদ্ধার করব।"

বব বলল, "সব বলব তোমাকে। কোনও চিন্তা নেই। ব্যস্ত হোয়ো না। আমি যখন আছি তখন কিছু ভেবো না।"

ওরা মতিঝিল এবং সংলগ্ন মাঠ পার হয়ে যখন বড় রাস্তার কাছাকাছি এল, তখন হঠাৎই দেখল ভয়ঙ্কর ডগার দু'জন লোকের সামনে দাঁড়িয়ে গোঁ-গোঁ করছে। ডগারের আঁচড়ে-কামড়ে তাদের জীবনের আর আশা নেই। ডগারকে দেখেই তাতার চেঁচাল, "ডগার! ডগার!"

ডগার ছুটে এসে যেন হারানিধি ফিরে পেয়েছে এমনভাবে লুটিয়ে পড়ল তাতারের পায়ে।

তাতার ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ওরা সব ঠিক আছে তো? শঙ্কু, দেবু, মালিনী, ওরা?"

ডগার 'আঁউ, আঁউ' করে দু'বার ডেকে ওর ভাষায় তার জবাব দিল। তারপর ববকে দেখে গোঁ-গোঁ করতে লাগল একটা চাপা আক্রোশে।

তাতার ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, "ওকে কিছু বলিস না ডগার। ও আমাদের বন্ধু। দাদা। তোর সোনাইদিদিকে এইবার তুই দেখতে পাবি। এখন আয়, আমাদের এগিয়ে দিবি চল।"

ডগার শেষবারের মতো আর-একবার শাসিয়ে এল লোক দুটোকে। তারপর আবার ফিরে এল তাতারের কাছে।

ওরা লাইন ধরে এগিয়ে বেলতলা ক্রসিং-এর কাছে এল। এই জায়গাটায় ইদানীং লোকজনের বসতি হচ্ছে। ওরা একটু হেঁটে এসে ছোট্ট একটি খোলার ঘরের সামনে দাঁড়াল।

বব ডাকল, "লেটো, এই লেটো।"

ভেতর থেকে সাড়া এল, "কৌন হ্যায়?"

"শিগগির দরজা খোল।"

রোগা বেঁটে সাধারণ চেহারার লেটো দরজা খুলে বেরিয়ে এল। তারপর ওদের দেখেই চমকে উঠল, "এ কী! ববদা! এ কী অবস্থা তোমার?"

"ঘরে চল। সব বলছি।"

লেটোর ঘরে হ্যারিকেনের ব্যবস্থা। তাই পলতেটা উসকে দিয়ে ববকে আর-একবার ভাল করে দেখেই বলল, "ইস্‌স রে। এ যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কে করল এই রকম?"

"জুলি।"

"তোমাকে তো আমি অনেক আগেই বলেছি ববদা, এসব লাইন তুমি ছেড়ে দাও। যে কাজে রাতে ঘুম হবে না, পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে, ধরা পড়লে জেলের ঘানি টানতে হবে, কেন করবে সে-কাজ?"

"সেই যন্তরগুলো, যেগুলো রেখেছিলাম তোর কাছে, ঠিক আছে?"

"আছে।"

"কার্তুজ, গুলি?"

"আছে। কিন্তু ও-নিয়ে এখন তুমি কী করবে?"

"আছে, আছে। দরকার আছে বন্ধু। দল যখন ছেড়ে দিলাম তখন যারা আমাকে এত বড় আঘাতটা করল তাদের তো আমি এত সহজে ছেড়ে দিতে পারি না।"

"এই ছেলেটি কে?"

"ওর পরিচয় পরে পাবি। ওই ছেলেটাকে বাঁচাতে গিয়েই এত কান্ড। তবে আমি ওকে বাঁচাতে না পারলেও ও নিজেই নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। এখন তুই এক কাজ কর। যে ভাবেই হোক ডাক্তার সান্যালকে একবার তুলে নিয়ে আয়।"

"যদি না আসতে চায়?"

"যন্তর দেখাবি।"

লেটো চট করে ওর ঘরের ভেতর থেকে সাইকেলটা বার করে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বব বলল, "তাতারবাবু, তুমি একটু কষ্ট করে আমার ক্ষতস্থানটা কোনও ছেঁড়া কাপড় দিয়ে চেপে রাখো। বড্ড বেশি ব্লিডিং হচ্ছে। তারপর ডাক্তারবাবু এসে যা করবার করবেন।"

"ডাক্তারবাবু আসবেন তো?"

"প্রথমে আসতে চাইবেন না। তারপর রাজি হবেন। ভাল ডাক্তার। আগে মিলিটারির ডাক্তার ছিলেন। আমাদের এইসব ঝুটঝামেলা তো উনিই পোহান। তবে এবারের আঘাতটা একটু বেশি।"

"আমার কিন্তু খুব ভয় করছে।"

"ভয় কী! হয়তো সারতে একটু দেরি হবে। তবে বেঁচে যাব। শুধু গেঁথে দিয়েছে। টেনে তো দেয়নি। তা হলে মরে যেতাম। যাক গে। গলাটা বড্ড শুকিয়ে আসছে। একটু জল দাও তো আমাকে।"

তাতার ঘরের কোণে রাখা একটা কলসি থেকে জল গড়িয়ে এক গেলাস জল দিল ববকে। তারপর একটা রুমাল নিয়ে এসে ওর পিঠ চেপে ধরল। কিন্তু তাতে কি রক্ত বন্ধ হয়?

একটু পরেই ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল লেটো। ডাক্তারবাবু ববকে দেখেই বললেন, "তোদের জ্বালায় কি রাত্রে একটু ঘুমোতেও পারব না? কই, দেখি, কোথায় কী করে এসেছিস?"

বব বলল, "আপনার পা ছুঁয়ে আমি কসম খাচ্ছি ডাক্তারদা, আর কখনও খারাপ কাজে থাকব না। এবার আমি সত্যিই ভাল হয়ে যাব।"

"তাই নাকি! ভূতের মুখে এরকম রাম নাম আমি অনেক শুনেছি। তুই একটু সেরে উঠলেই আগে যাবি বদলা নিতে। ঠিক কি

না বল ?"

বব খিকখিক করে হাসতে লাগল।

ডাক্তারবাবু বেশ ভাল করে ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করে বললেন, "এসব আমার মতন হাতুড়ে ডাক্তার দিয়ে হবার নয় বাবা। এসব হচ্ছে হসপিটাল কেস। এতে রক্ত দিতে হয়। ছোটখাটো অপারেশনের ব্যাপারও আছে। তবে তোদের জান তো,গলা থেকে মুন্ডু উড়ে গেলেও তোরা ঠিক চলে-ফিরে বেড়াবি। টিটেনাস নেওয়া আছে ?"

"হ্যাঁ।"

"আমি অন্য একটা ইনজেকশন দিচ্ছি। দ্যাখ কী হয়।" বলে বেশ ভালভাবে ব্যান্ডেজ করে একটা ইনজেকশন দিলেন।

বব বলল, "আমাদের জন্য আপনিই তো আছেন ডাক্তারদা। আপনার ভরসাতেই বেঁচে আছি।"

"শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না বাবা। সেরে উঠে যা হোক কিছু দিয়ে দিস।" তারপর বললেন, "যদি খুব বেশি অসুবিধে বুঝিস তা হলে দেরি করবি না। সকালেই আমাকে খবর দিবি। আমার চেনাজানা একটা নার্সিং হোমে ভর্তি করিয়ে দেব। পুলিশের বাবাও টের পাবে না। তবে হাজারখানেক টাকা অন্তত হাতের কাছে রাখিস।"

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন।

বব বলল, "চন্ডীকে একবার ডাক তো লেটো।"

লেটো আবার বেরিয়ে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই এক যণ্ডাগুণ্ডা যুবককে ধরে আনল। চেহারা তো নয়, যেন নৃসিংহঅবতার। মাথায় কদমছাঁট চুল। মুখে-কপালে অসংখ্য কাটা দাগ।"

চন্ডী এসেই বলল, "কী খবর গুরু ?"

"মেয়েটার ব্যবস্থা কী করলি ?"

চন্ডী একবার তাতারকে দেখল। তারপর বলল, "মঞ্জুদার কথামতো ওকে তো নাগিনার হাতে তুলে দিয়েছি।"

"যদি না দিয়ে থাকিস, তা হলে নিয়ে আয়।"

"এখন আর কোনও উপায় নেই গুরু। মাল পাচার হয়ে গেছে।"

"কখন ?"

"কাল রাতে। ওরা চলেও গেছে।"

"ওই মেয়েটাকে যেভাবেই হোক ফিরিয়ে আনতে হবে।"

"অসম্ভব। পুরোপুরি কুড়িটি হাজার টাকা গুনে দিয়েছে ওরা। বিশেষ করে ওই সার্কাস-পার্টির ম্যানেজার নাগিনা ভয়ঙ্কর কড়া লোক। ওর খপ্পর থেকে···।"

"প্রয়োজন হলে একটা খুনও হবে। কিন্তু মেয়েটাকে চাই। যেভাবেই হোক।"

তাতার বলল, "না, না। খুন-জখমের দরকার নেই। ওই বিশ হাজার টাকা আমরা দেব। আমার বাপি দেবেন। সোনাইকে ওদের কাছ থেকে কিনেই নেব আমরা।"

বব বলল, "তুমি ছেলেমানুষ তাতার। কিছু জানো না, তাই এই কথা বলছ। এখন আর ওর দাম বিশ হাজার নেই। ওর দাম এখন পঞ্চাশ হাজার। ওরা খড়্গপুরের গিরিময়দানে এখন খেলা দেখাচ্ছে। ওখানকার মেয়াদ শেষ হলে চলে যাবে ওড়িশার কোরাপুটে।"

তাতার বলল, "তা হলে উপায় ?"

"ছিনিয়ে আনতে হবে। তুমি সকাল হলেই বাড়ি চলে যাও। চন্ডী অথবা লেটো গিয়ে রেখে আসবে তোমাকে। তারপর আমরা দেখছি কীভাবে কী করা যায়।"

তাতার বলল, "না। আমি এখন কিছুতেই বাড়ি ফিরব না। মৃত্যুর মুখ থেকে যখন ওইভাবে বেঁচে ফিরেছি, তখন সোনাইকে না নিয়ে বাড়ি আমি কিছুতেই ফিরব না। তা হলে আমার পরাজয় হবে। তা ছাড়া আমি বাড়ি ফিরলে আমার বাপি-মা আর আমাকে ঘর থেকে বেরোতেই দেবেন না। তোমরা আমাকে বলে দাও কীভাবে কোথা দিয়ে কোথায় যেতে হবে। আমি ঠিক ওকে বার করে আনব। মারদাঙ্গা কোনও-কিছুরই দরকার হবে না।"

"কিন্তু···।"

"আমার সঙ্গে ডগার আছে। এখন আমি কাউকে ভয় করি না।"

লেটো বলল, "তাই যাও। ওকে এখন ওদের খপ্পর থেকে কোনওরকমে বের করে আনা ছাড়া উপায় দেখছি না।"

চন্ডী বলল, "আসলে অচেনা জায়গা তো। আর আমরা যাওয়া মানেই খুনখারাপি হওয়া। ওসব জায়গায় চট করে মাথা গরম করার বিপদও আছে। তা ছাড়া মেয়েটাই তো আমাকে বিশ্বাস করবে না। আমিই তাকে ওদের হাতে তুলে দিয়েছি। আবার আমিই তাকে ফিরিয়ে আনতে যাব, এ হয় না। ও কিছুতেই আসবে না আমার সঙ্গে।"

লেটোর ঘরে একটা টেবিল-ঘড়ি ছিল। বব ঘড়ি দেখে বলল, "তা হলে আর দেরি করে লাভ নেই। এক্ষুনি গেলে ফার্স্ট ট্রেনটা পেয়ে যাবে। চন্ডী, তুমি ওকে দাশনগরে নয়, রামরাজাতলাতেই ট্রেনে চাপিয়ে দাও। খড়্গপুরের পরের স্টেশনেই গিরিময়দান। মেয়েটিকে ওখানেই নাগিনা সার্কাসের তাঁবুতে পাবে।"

চন্ডী বলল, "সে তুলে দিয়ে আসছি। কিন্তু একে ওর জামাপ্যান্ট ভিজে, তার ওপরে রক্তের দাগ। এই অবস্থায় ও বেরোবে কী করে ?"

"কিছু তো করার নেই। তবে রক্তের দাগগুলো তোমরা পরিষ্কার করে দাও। আর হ্যাঁ, ওকে যেন শুধু হাতে ছেড়ে দিও না। কিছু টাকাও সঙ্গে দিয়ে দাও।"

তাতার বলল, "যা পারো, যতটা পারো দাও। আমি ফিরে এসেই আমার বাপিকে বলব সব টাকা দিয়ে দিতে।"

বব বলল, "আরে সে হবে'খন। খুব সাবধানে যাবে কিন্তু। তবে তোমার সাহস এবং জেদের ওপর আমার আস্থা আছে। এ-কাজ তোমার দ্বারাই সম্ভব।"

লেটো আর চন্ডী তাতারের জামা-প্যান্টে ববের গা থেকে ঝরে পড়া রক্তের দাগ মুছিয়ে দিল। তারপর ওর পকেটে দু'শোর মতো টাকাও গুঁজে দিল। এর পর চন্ডী ওর বাড়ি থেকে মোটরবাইকটা নিয়ে এসে তাতার ও ডগারকে তাতে চাপিয়ে পৌঁছে দিল সাঁত্রাগাছিতে। রামরাজাতলার থেকেও সাঁত্রাগাছিতে যাওয়ারই এ-পথে সুবিধা বেশি। হাটপুকুর, জগাছা, বাকসাড়া হয়ে সোজা পথ।

সাঁত্রাগাছি থেকে আবার গিরিময়দানের টিকিট পাওয়া গেল না। তাই খড়্গপুরের টিকিট কেটেই ট্রেনে চাপল তাতার। ও যাওয়ামাত্রই এসে গেল ট্রেন। মেদিনীপুর লোকাল। আর-একটু দেরি হলেই হয়েছিল আর কি।

ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে এখন দু'-একজন ছাড়া লোকই নেই। তাতার ইচ্ছে করেই সিটে না বসে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। কেননা, চলন্ত ট্রেনের হাওয়ায় তাড়াতাড়ি ভিজে জামা-প্যান্ট শুকিয়ে যাবে তাই। কিন্তু এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে শীতে যেন হিহি করে কাঁপতে লাগল সে। একে ভোরের হাওয়া, তায় ভিজে জামা-প্যান্ট। সে কী কাঁপুনি !

দু'-একটা স্টেশন যাবার পর গাড়িতে চা উঠল। চা-অলার কাছ থেকে দুটো কেক কিনে ডগারকে একটা দিয়ে একটা নিজেও খেল

টেনিদা, আসল টেনিদা ও দারুণ মজার মজার বই

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্যের নামে শুধু ছোটদের কেন, বড়দের চিত্তও যে প্রসন্ন হয়ে ওঠে এর কারণ তাঁর রচনার রম্য ভঙ্গি, কাম্য স্বাদ। টেনিদা ও সাকরেদবাহিনীর কীর্তিকাহিনী এখন তো প্রায় কিংবদন্তী, অন্যান্য গল্প-উপন্যাসেও তিনি জলজ্যান্ত করে তোলেন ছোটদের মনের অন্ধিসন্ধিতে লুকনো দুরভিসন্ধির মিষ্টি ঘটনাগুলো। এহেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের যাবতীয় ছোটদের রচনা নিয়ে একদিকে যেমন প্রকাশিত হয়েছে 'সমগ্র কিশোর-সাহিত্য' গ্রন্থমালা, তেমনি আলাদাভাবেও পাওয়া যায় তাঁর মজার মজার গল্পের বইগুলো।

'সমগ্র কিশোর সাহিত্য'র চার খণ্ড নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, ছড়া, আত্মকথা, প্রবন্ধ— এমন সব-কিছু নিয়ে তৈরি হয়েছে একেকটি খণ্ড। সম্পাদনা করেছেন আশা দেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

ওহো, এই প্রসঙ্গেই বলি আশা দেবীর 'আসল টেনিদা' নামের বইটির কথা। এর মধ্যে কী আছে জানো ? যে-মানুষটিকে নিয়ে নারায়ণবাবুর টেনিদার গল্প, সেই মানুষটির আসল পরিচয় নিয়ে মজার মজার গল্প।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাসম্ভার , তপন চরিত ১০·০০ ঘন্টাদার কাবুলকাকা ৮·০০ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৮·০০ টেনিদা ও ভুতুড়ে কামরা ১০·০০ সমগ্র কিশোর-সাহিত্য ১ম ২য় ও ৩য় প্রতি খণ্ড ৩০·০০, চতুর্থ খণ্ড ১৫·০০

আশা দেবীর আসল টেনিদা ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩১-৪৩৫২

আরও 'আনন্দ'-উপহার

ডজন ডজন গল্প

সত্যজিৎ রায়ের
এক ডজন গপ্‌পো ১৫·০০
আরো একডজন ১৫·০০
আরো বারো ১২·০০
এবারো বারো ১২·০০

গোয়েন্দা-গোগোলের রহস্য-অ্যাডভেনচার

সমরেশ বসুর
বন্ধ ঘরের আওয়াজ ১৫·০০
গোগোল চিক্কুস নাগাল্যাণ্ডে ১২·০০
সেই গাড়ির খোঁজে ১০·০০
শিমুলগড়ের খুনে ভূত ১০·০০
জঙ্গলমহলে গোগোল ১০·০০
ভুল বাড়িতে ঢুকে ১০·০০

ম্যাজিসিয়ান কিকিরার রহস্য-সন্ধান

বিমল করের
কাপালিকরা এখনও আছে ১২·০০
রাজবাড়ির ছোরা (সঙ্গে হারানো জীপের রহস্য) ১২·০০
জাদুকরের রহস্যময় মৃত্যু ১২·০০

তাতার।

যথাসময়ে সকাল হতেই সূর্যোদয় হল। রোদ উঠলে আর কোনও অসুবিধাই রইল না। এইভাবে কোলাঘাটে যখন পৌঁছল তখন ওর জামা-প্যান্ট শুকিয়ে গেছে।

খড়্গপুরে এসে ট্রেন থামল।

ওর টিকিটের এইখানেই মেয়াদ শেষ। এর পরেই গিরি ময়দান। টিকিট যখন পাওয়া যায়নি, তখন এই টিকিটেই যেতে হবে। ভাড়া অবশ্যই একই। যাক। খড়্গপুরে অনেকক্ষণ থেমে থাকার পর ছাড়ল ট্রেন। ছেড়েই গিরিময়দানে থামল। কী সুন্দর লাল মাটির দেশ। কেমন সব ছবির মতন ঘরবাড়ি।

তাতার ট্রেন থেকে নেমে কোন দিকে যাবে ঠিক করতে পারল না। তবু সে স্টেশনের বাইরে এসে মনে জোর এনে ঘোরাফেরা করতে লাগল। খিদেও পেয়েছে খুব। আগে পেটটাকে ঠাণ্ডা করবার জন্য কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার। এখানে ভাল খাবারের দোকানের অভাব নেই। তারই একটি পছন্দ করে ডগারকে নিয়ে ঢুকে পড়ল তাতার।

দোকানদার বললেন, "কুকুরটাকে একটু সাবধানে রেখো ভাই। কাউকে কামড়ায় না যেন।"

তাতার বলল, "ভয় নেই। পোষা কুকুর। আমার আদেশ না পেলে ও কারও কিছু করবে না।"

মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে আসতে পারায় তাতারের মনে এখন দারুণ আনন্দ। আর ওকে পায় কে। সোনাইকে এখনও উদ্ধার করতে না পারলেও তার খোঁজ তো পাওয়া গেছে। ও একাই এই অভিযানে দেখিয়ে দেবে পাণ্ডব-গোয়েন্দার বাবলুর চেয়ে ও কোনও অংশে কম নয়। গত রাতের বিভীষিকার কথা এখন স্বপ্ন বলে মনে হয়। এই উজ্জ্বল দিন, এই মানুষজন, এই নতুন দেশ—ওর কাছে বড় বেশি বাস্তব। ওর উদ্যম আরও যেন প্রাণবন্ত হয়। মন বলে সফল ও হবেই। ওর জয় অনিবার্য।

পেট ভরে জলখাবার খেয়ে দু-একজনকে জিজ্ঞেস করার পর নাগিনা সার্কাসের তাঁবু খুঁজে বার করতে খুব বেশি বেগ পেতে হল না তাতারকে। স্টেশনের কাছেই গিরিময়দানের মাঠ। তাতার সেদিকে লক্ষ না করে অন্যদিকে চলে গিয়েছিল। তারপর আবার ফিরে এল সেইদিকে। খুব ছোটখাটো সার্কাস কম্পানি। রঙিন তাঁবু। চারিদিক ঘেরা। এরই মধ্যে একপাশে টিনের পার্টিশনে টিকিট-ঘর। তাতার সব-কিছু খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে এগোতে লাগল। একটি হাতি, একটি বাঘ, দুটি ভালুক, দুটি ঘোড়া, কতকগুলো বাঁদর, দু'জন জোকার আর কয়েকজন সুশ্রী চেহারার যুবক-যুবতীকে নিয়ে সার্কাসের ঘর-সংসার। দেখেই মনে হয় শুধু খেলোয়াড় নয়, সুন্দর মুখের দিকে সার্কাস-মালিকের তীক্ষ্ণ নজর। তাই সোনাইয়ের জন্য বিশ হাজার টাকা খরচা করতে ওদের একটুও আটকায়নি।

এই সার্কাসের তাঁবুর জঠরে কোথায় যে বন্দিনী আছে সোনাই তা কে জানে?

ম্যানেজার নাগিনাসাহেব বিশাল শরীর নিয়ে টকটকে লাল মুখে চুরুট ধরিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পরনে হাফ প্যান্ট, স্যান্ডো গেঞ্জি, মাথায় হ্যাট, পায়ে বুট।

দু'জন জোকার ঘোরাঘুরি করছিল তাঁবুর আশেপাশে। তাতার ওদের সঙ্গে ভাব জমাল। বলল, "তোমাদের তাঁবুর ভেতরে আমাকে একবার ঢুকতে দাও না গো। ভেতরটা কেমন একটু দেখি।"

ওরা বলল, "না। নাগিনাসাহেবের নিষেধ আছে। বাইরের কোনও লোকের ভেতরে ঢোকবার অধিকার নেই। তা ছাড়া ভেতরে গিয়েই বা কী করবে তুমি? যখন সার্কাস শুরু হবে তখন টিকিট কেটে ঢুকো।"

তাতার নিরুপায় হয়ে অন্য ধান্দা দেখতে লাগল। এইসময় মালিনীটা থাকলে কাজে লাগত বেশ। ও ঠিক বেড়া টপকে ঢুকে যেত ভেতরে। তাতার যখন এইসব ভাবছে আর ঘুরঘুর করছে তখন হঠাৎ ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল নাগিনাসাহেব। বেশ ভারিক্কি গলায় বললেন, "বেঃ। তুম ইঁয়া ক্যা করতে ও?"

তাতার বলল, "কিছু না সাহেব। আপনাদের সার্কাস আমার খুব ভাল লেগেছে। তাই চারিদিক ঘুরে-ঘুরে দেখছি। ওই বাঘের খাঁচাটার কাছে যাব একবার?"

"নে-ঈ। হতো ইঁয়াচে। বাগো। তিকত কাতকে গুচো।"

অতএব পালাতেই হল। তবুও এই তাঁবুর চারপাশে কতবার যে ঘুরপাক খেল তাতার, তার ঠিক নেই। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল ওর। মাঝে একবার নাগিনার একজন লোক এসে ওয়ার্নিং দিল ওকে। তাতার প্রতিবাদ করল না। একবার একটু পিছিয়ে এসে আবার আদা-জল খেয়ে লাগল। ওরও জেদ, যেভাবেই হোক ওদের নজর এড়িয়ে ভেতরে ও ঢুকবেই।

কিন্তু না। তাতারের সবরকমের চেষ্টাই ব্যর্থ হল একসময়। দেখতে-দেখতে বেলা গড়িয়ে গেল। দুপুরে ডগারকে নিয়ে একটা হোটেলে ভাত-টাত খেয়ে মাঠের প্রান্তে একটি গাছতলায় শুয়ে বিশ্রাম নিল ও। তারপর বিকেলে একটা টিকিট কেটে ডগারকে নিয়ে সার্কাস দেখতে ঢুকল।

ছোট্ট দল। কিন্তু খেলা দেখে মন ভরে গেল ওর। পাকা খেলোয়াড় সব। খেলা দেখার মাঝে তাতার যতবার ভাবল এক ফাঁকে ও গ্যালারির নীচে দিয়ে সুট করে ঢুকে পড়বে গ্রিনরুমের ভেতরে, ততবারই ব্যর্থ হল। কেননা, সার্কাস-পার্টির লোকেরা কেমন যেন সন্দেহ করতে লাগল ওকে। তাই ওর দিকে ওরা কড়া নজর রাখল। তাতার যেই একটু নড়াচড়া করে, অমনি দ্যাখে, কেউ-না-কেউ ওকে দেখছে। ওরা কি ওকে চোর ভেবেছে? যদি ভেবেই থাকে তাতেই বা ক্ষতি কী? এখন না হোক, গভীর রাতে একবার ও ভেতরে ঢুকবেই। ঢুকতে ওকে হবেই। না হলে সোনাই উদ্ধার হবে কেমন করে?

এমন সময় হঠাৎই একটা ঘোষণায় ও চমকে উঠল, "এইবার আপনারা দেখবেন সিঙ্গাপুরের ছোট্ট কিশোরী বেবি ইরানির দড়ির ব্যালান্স। সারা ভারতে তাকলাগানো এই দড়ির খেলা আশা করি গিরিময়দানের দর্শকরা ভালভাবেই নেবেন।"

তাতারের বুক কেঁপে উঠল। কে এই বেবি ইরানি? সোনাই নয় তো? টাকা দিয়ে কিনে এনেছে বলে একটা দিনও কি ওরা রেহাই দেবে না মেয়েটাকে? এ কী নিষ্ঠুরতা! নাকি সত্যিই ওই নামের অন্য কেউ আছে? তবে মনে হয় না। ওরা নিশ্চয়ই সোনাইয়ের নাম পালটে এই নাম রেখেছে।

যা ভাবল তাই। তাতারের অনুমান ঠিকই হল। তবে দড়ির খেলা দেখাবার সরঞ্জাম ঠিক হলেও খেলা দেখাবার মুহূর্তে কারও পাত্তা পাওয়া গেল না। এমন সময় হঠাৎ দু'জন লোক ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিল একটি মেয়েকে খেলা দেখানোর ল্যান্ডের দিকে। মেয়েটি পড়ে যেতে-যেতে সামলে নিল। বোঝা গেল খেলা দেখানোয় দারুণ অনিচ্ছা মেয়েটির। কী অপরূপ সাজ ওর। রংচঙে পোশাক। পেন্ট করা মুখ। কে ও? আরে! ওই তো! ওই তো সোনাই। তাতারের আন্দাজ কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক হল।

একজন ট্রেনার গোছের লোক এক ঘা চাবুক মারল সোনাইকে। সোনাই চেঁচিয়ে উঠল, "আ-ব্বা-জা-ন!"

ডগার দারুণ উত্তেজিত। তাতার ওকে শক্ত করে টিপে ধরে

রইল। দেখাই যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়। চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করেও সোনাইকে উদ্ধার করবে তাতার।

চাবুক খেয়ে নীরবে চোখের জল মুছে দড়ির ওপর দিয়ে চলা শুরু করল সোনাই। সার্কাস-পার্টির আলাদা একটা মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট থাকে। তবুও এই খেলায় নাগিনাসাহেব নিজে একটা ঢোল নিয়ে দারুণ সুন্দরভাবে বাজাতে লাগলেন। একেবারে পাকা হাত। ঢোলের বোলে যেন খই ফুটতে লাগল। রঙিন পোশাকে অপরূপা সোনাই সেই বাজনার তালে-তালে এক-পা এক-পা করে দড়ির ওপর দিয়ে দু' হাত ছেড়ে এগিয়ে আসতে লাগল। জোকার দুটো ওকে দেখে সিটি মেরে কী কাণ্ডটাই না করতে লাগল। সোনাইয়ের বদলে অন্য কেউ হলে মজা পেত তাতার। কিন্তু যেহেতু সোনাই, তাই রাগে ওর সর্বাঙ্গ জ্বলে যেতে লাগল।

হঠাৎ রঙ্গমঞ্চে কোথা থেকে যেন একটা বাঁদর এসে লাফিয়ে পড়ল 'কক কক' করে।

তারপর যাকে পারল তাকেই শুরু করল আঁচড় কামড়। সেই সঙ্গে সে কী দাঁতখিচুনি।

তাতার অবাক হয়ে গেল। এ তো মালিনী! মালিনী এখানে কোত্থেকে এল? মালিনীর আবির্ভাবের পর ডগারকেও ধরে রাখা গেল না আর। সেও একেবারে মারমুখী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আসল জায়গায়।

জোকার দুটোর তখন, যাকে বলে, নাজেহাল অবস্থা। তিড়িংবিড়িং করে লাফিয়ে চোখের পলকে কেটে পড়ল তারা।

সোনাই তখন টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। তবে পড়ার আগেই ভাগ্যিস ঝুলে ধরে ফুলে পড়েছিল, না হলে কী যে হত তা কে জানে?

তাতারও সাহস পেয়ে ছুটে গেল, "সোনাই! সোনাই রে! আমি এসেছি।"

"ভাইয়া! ভাইয়া তুমি এসেছ? এ আমি ভাবতেও পারছি না। আল্লা তা হলে সত্যিই আমাকে দোয়া করলেন!"

মালিনী তখন নাগিনার ঢোলকের ওপর লাফিয়ে উঠে ওর কান দুটোকে ধরে শুধু দাঁতই খিচোচ্ছে। আর নাগিনার গলা দিয়ে প্রচণ্ড ভয়ে কেমন যেন একটা "ব্যা ব্যা" করে শব্দ বেরোচ্ছে।

তাতার ছুটে গিয়ে সোনাইকে ধরল।

সোনাইও "ভাইয়া, ভাইয়া" করে জড়িয়ে ধরল ওকে।

তাতার বলল, "আমি এসে গেছি সোনাই। আর তোর কোনও ভয় নেই।"

"তুমি আমাকে নিয়ে শিগগির এখান থেকে পালিয়ে চলো।"

কিন্তু পালাব বললেই কি পালানো যায়? তাঁবুর ভেতরে তখন দক্ষযজ্ঞ হচ্ছে। এই চিৎকার চেঁচামেচিতে দর্শকরা ভয় পেয়ে সবাই আগে পালাতে চায়। সে কী প্রচণ্ড কোলাহল। এরই মধ্যে ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে আলো নিভে অন্ধকার। ভাগ্যিস সন্ধে হয়নি, তাই রক্ষে। ডগারের চিৎকারে আর তাড়া খেয়ে দড়ি খুলে দুটো ঘোড়া দৌড়চ্ছে। অন্য বাঁদরগুলোও ছাড়া পেয়ে লাফাচ্ছে তখন। ওদিকে খাঁচার ভেতরে বাঘের সে কী গর্জন। হাতিটাও ঠ্যাং তুলে "হ্যারো, হ্যারো" করছে।

তাতার সোনাইয়ের হাত ধরে ওর ছুরি দিয়ে তাঁবু কেটে ওকে নিয়ে বাইরে পালাল। ডগার এবং মালিনীও তখন সঙ্গ নিল ওদের। একবার বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারলে আর তো কিছু করতে পারবে না ওরা।

তাতার ও সোনাই যখন বাইরে এসে প্রশস্ত রাজপথের ওপর দিয়ে ছুটছে, তখন হঠাৎই ওরা শুনতে পেল অনেক দূর থেকে দেবু ও শঙ্কু চেঁচাচ্ছে, "তাতার! সোনাই! একটু দাঁড়া। আমরা এসে গেছি।"

তাতার ও সোনাই থমকে দাঁড়াল। শঙ্কু এবং দেবু। তাও এই গিরিময়দানে! এ কী করে সম্ভব!

তাতার বিস্মিত হয়ে বলল, "এ কী তোরা!"

ওরা হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "সেন্টুদাও আছে। ওঃ, তোকে যে আমরা ফিরে পাব তা স্বপ্নেও ভাবিনি তাতার। শুধু সেন্টুদা নয়। তোর বাবা-মা সবাই আছেন।"

"কিন্তু আমি যে এখানে, তোরা জানলি কী করে?"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই বাইক নিয়ে সেন্টুদা এসে হাজির। বলল, "কী করে জানলাম? তোর ববদা, লেটো আর চণ্ডীকে তোর খবর দিয়ে পাঠিয়েছিল। তাই শুনেই সবাই এসেছি আমরা। আমি যেখানে কেসটা হাতে নিয়েছি সেখানে তুই কেন অত রিস্ক নিতে গেলি? একটু ভুলের জন্যে কী বিপদটা ঘটাতে গিয়েছিলি বল তো? তবে হ্যাঁ, তোর সাহস আছে। তুই কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছিস যে বাঙালি ছেলেরা কাপুরুষ নয়।"

ওরা সবাই পায়ে-পায়ে স্টেশনে নয়, থানায় এসে হাজির হল।

শ্যামবাবু, নন্দা দেবী—দু'জনেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন তাতারকে।

তাতার বলল, "টিঙ্কু কই?"

মা বললেন, "ওকে আনিনি। ও শঙ্কুদের বাড়ি আছে।" তারপর সোনাইকে বুকে নিয়ে বললেন, "শুধু তোমার জন্যই এত কাণ্ড মা। যাক, তোমাকে যে পাওয়া গেছে এই ঢের। এখন থেকে তুমি আমার কাছেই থাকবে। জানব আমি আমার আর-একটা মেয়ে পেলাম।"

ওরা যখন এইসব কথা বলছে তখন দেখা গেল, নাগিনাসাহেবের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে আসছে পুলিশ।

তাতার বলল, "বাপি, ওই লালজি, মঞ্জু ওদের খবর জানো?"

বাপি চাপা গলায় বললেন, "ওদের অবস্থা খুব খারাপ। সেন্টুটা ওদের যা হাল করেছে না? তবে পুলিশ ওদের অ্যারেস্ট করেছে।"

সেন্টুদা বাপিকে ইশারা করেই দেবু ও শঙ্কুকে নিয়ে স্টেশনের দিকে কেটে পড়ল।

ডগার, মালিনী ও সোনাইসহ তাতার চলল ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে। ওর মন এখন আনন্দে ভরে উঠেছে। ওরাও স্টেশনের দিকেই চলল। যেতে-যেতে তাতার বলল, "আমাদের বেনারসের পরিকল্পনাটা তা হলে ঠিক আছে তো বাপি?"

মা বললেন, "আছে আছে। এখন ঘরে তো চল।"

গিরিময়দানের লোকেরা তখন অবাক চোখে তাতারকে দেখছে। তাতার সবাইকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাল।

সেন্টুদা প্রত্যেকের টিকিট কেটে অপেক্ষা করছিল স্টেশনে। ওরা যাবার পরই ট্রেন এল। একেবারে ফাঁকা গাড়ি। তাতার, সোনাই, শঙ্কু, দেবু জানলার ধার ঘেঁষে বসল। সেন্টুদা, বাপি, মা আলাদা বসে গল্প করতে লাগলেন।

আর ডগার, মালিনী? ওরা দুটোতে সিটের তলায় বসে যত রকমের ছটফটানি সব করতে লাগল। ট্রেনে চেপে কী দারুণ ফূর্তি ওদের। এই ঘটনার পর গোয়েন্দা-তাতারের কাহিনী লোকের মুখে-মুখে ঘুরতে লাগল। শুধু তাই নয়, খবরের কাগজেও ফলাও করে ছাপা হল সেসব কথা। তাই দেখে তাতার, সোনাই, শঙ্কু ও দেবুর বুক গর্বে ভরে উঠল।

আর টিঙ্কু? দাদাকে ফিরে পেয়ে তার যেন খুশির আর অন্ত নেই। এত খুশি যে, তাতারকে সে আর একদমই কাছছাড়া করতে চাইল না।

(সমাপ্ত)

ছবি : অনুপ রায়

পশ্চিম জার্মানির এক সংবাদসংস্থার সম্পাদকীয় দফতর

সাংবাদিক হতে গেলে

অমর দাশ

পেশা হিসেবে অনেকেই আজকাল সাংবাদিকতার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। প্রতিদিন আমাদের চারপাশে এবং দূর বিশ্বে কত কিছুই না ঘটছে। যুদ্ধ, মহামারী, খরা, প্লাবন। খেলাধুলোর আসরেও নিত্যনতুন তারকার উদয় হচ্ছে। রেকর্ড ভাঙছে, গড়া হচ্ছে নতুন নতুন রেকর্ড। মানুষ পাড়ি দিচ্ছে দূর মহাকাশে। উৎসুক পাঠকদের এসব খবর জানানোর দায়িত্ব সাংবাদিকদের। তাঁদের কাজের মধ্যে যেমন আছে সৃষ্টির আনন্দ, তেমনই আছে ঝুঁকি। আছে সাহসের পরীক্ষা। তবু সারা বিশ্বের প্রতিদিনের খবরাখবর মানুষকে জানানোর মধ্যেই আছে একটা বড় আনন্দ।

সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ। দেশ-বিদেশের ঘটনাপ্রবাহ—যা মানুষকে ভাবিত করে, জনচিত্তকে আলোড়িত করে, সংবাদপত্রে তারই প্রতিফলন ঘটে। সাংবাদিকতা বৃত্তিটি এখন আর শুধু সংবাদপত্রনির্ভর নয়, নানা মাধ্যমে তা প্রকাশিত। ইলেকট্রনিক মিডিয়া, যেমন, রেডিও, টিভি ক্রমশই ব্যাপক এবং সম্প্রসারিত হচ্ছে।

তরুণ মনে সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন থাকা খুবই স্বাভাবিক। সাংবাদিকের কাজের মধ্যে যেমন সৃষ্টির আনন্দ আছে, তেমনই আছে ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা এবং সাহসের পরীক্ষা। আধুনিক যুগে মুদ্রণশৈলীর ব্যাপক উন্নতির ফলে সংবাদপত্র জগতে অবিশ্বাস্য পরিবর্তন এসেছে, উন্মোচিত হয়েছে নতুন দিগন্ত।

সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকতা পড়ানো এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি এবং বহরমপুর, বাঙ্গালোর, কলকাতা, কালিকট, গুয়াহাটি, গাড়োয়াল, জব্বলপুর, কেরল, মাদ্রাজ, মাদুরাই কামরাজ, মহর্ষি দয়ানন্দ রোটাক, মারাঠওয়াড়া, মহিশূর, নাগপুর, ওসমানিয়া, পঞ্জাব, পুনে, পঞ্জাবি, রাজস্থান, শিবাজি এবং সৌরাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জার্নালিজমের ডিগ্রি, ডিপ্লোমা অথবা সার্টিফিকেট কোর্স পড়ানো হয়ে থাকে। মহিশূর, ওসমানিয়া, কলকাতা, জব্বলপুর, কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্নালিজমে মাস্টার'স ডিগ্রি কোর্স পড়ানো হয়। বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ে বি·এসসি (কমিউনিকেশন) এবং এম·এসসি (কমিউনিকেশন) কোর্স পড়ানো হয়। পঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি-সাংবাদিকতার দু' বছরের একটি কোর্স পড়ান। এই কোর্সে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের স্নাতকরাই পড়ার সুযোগ পান।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নেতাজিনগর কলেজে (রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা-৪০) স্নাতকস্তরে সাংবাদিকতা বিষয় নিয়ে পড়া যেতে পারে। কলকাতার মুরলিধর কলেজেও এই সুযোগ আছে। তা ছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় এম·এ· পড়ার সুযোগ রয়েছে। সদ্য অনার্স সহ স্নাতক হয়েছেন এমন ছাত্রছাত্রীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভর্তির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নির্ধারিত আবেদনপত্রে আবেদন জানাতে হয়।

> ভাল সাংবাদিক হতে হলে সব বিষয়ে দখল থাকা দরকার। চিন্তাশক্তি প্রখর ও দৃষ্টি হওয়া চাই তীক্ষ্ণ। বিশ্লেষণী ক্ষমতাও থাকা চাই। তা হলে পরিবেশিত সংবাদ হয়ে উঠবে জীবন্ত। মনে সাহস রাখতে হবে, প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করার মতো মানসিকতা তৈরি রাখতে হবে। বিজ্ঞান, রাজনীতি, উন্নয়ন, সমাজ, খেলাধূলা সবকিছু নিয়েই আধুনিক সাংবাদিকতা। সাহস, নিষ্ঠা, সততা এবং ধৈর্য নিয়ে এগোলে সফলতা অনিবার্য।

আসনসংখ্যা ৬৫টি। কলা বিভাগের স্নাতকদের জন্য ২০টি, বিজ্ঞানের স্নাতকদের জন্য ২০টি এবং বাণিজ্য স্নাতকদের জন্য ১০টি। কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য আছে ১৫টি সিট, তবে তাঁদের ক্ষেত্রে অ্যাডমিশন টেস্টে বসতে হয় এবং মৌখিক পরীক্ষাও দিতে হয়। এ ছাড়া ভবন'স কলেজ অব কমিউনিকেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (ব্লক এফ/এ, সেক্টর তিন, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১) জার্নালিজম এবং পাবলিক রিলেশন্স-এ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পড়িয়ে থাকেন। সেশন শুরু জুলাই থেকে। ভর্তির বিজ্ঞপ্তি বেরোয় সাধারণত এপ্রিল মাসে। যে-কোনও স্তরের স্নাতক ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। আবেদনকারীর ইংরেজি ভাষায় দখল থাকা চাই। লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন করা হয়। কোর্স ফি ২৩৮০ টাকা। দু'টি কিস্তিতে দেওয়া চলে। এই প্রতিষ্ঠানের ডিপ্লোমা ভারত সরকার স্বীকৃত। উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ কলকাতায় ভবন'স আশুতোষ মুখার্জি কলেজ অব কমিউনিকেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (আশুতোষ সদন, ৭৭ আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০২৫) খুলেছেন। এই সেশন থেকেই ক্লাস শুরু হবে। ভারতীয় বিদ্যাভবন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, যেমন, আমেদাবাদ, বাঙ্গালোর, বরোদা, বোম্বাই, চণ্ডীগড়, কোচিন, গুন্টুর, হায়দরাবাদ, জয়পুর, মাদ্রাজ, নাগপুর, ত্রিচুর প্রভৃতি জায়গায় মাস

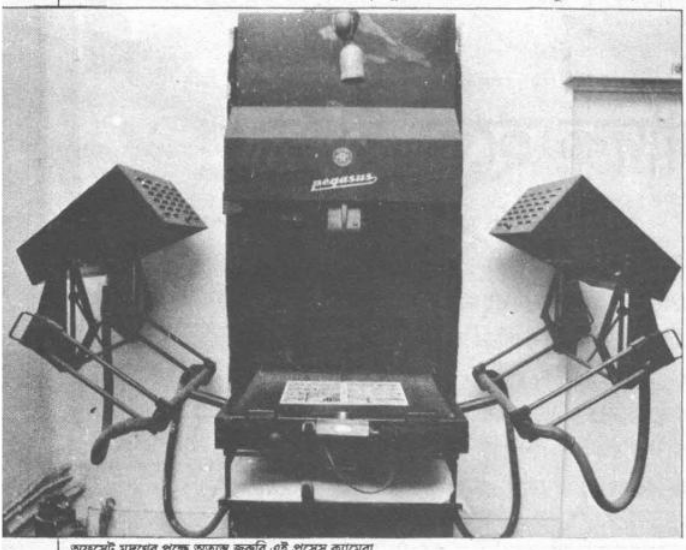

অফসেট মুদ্রণের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি এই প্রসেস ক্যামেরা

কমিউনিকেশনের বিভিন্ন কোর্স পড়িয়ে থাকেন।

নয়াদিল্লির দা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশন, জনসম্পর্ক এবং সাংবাদিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অগ্রণী জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন সার্ভিসে বহিরাগতদের ওরিয়েনটেশন কোর্স পড়ানো হয়। অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং দূরদর্শন কর্মীদের জন্য রিফ্রেশার কোর্স এবং তৃতীয় বিশ্বের নির্জোট রাষ্ট্রসমূহের সংবাদপ্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিদের ডিপ্লোমা কোর্সও পড়ানো হয় এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। এ ছাড়া সাধারণ ছাত্রদের জন্য রয়েছে জার্নালিজমে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স, অ্যাডভার্টাইজিং এবং পাবলিক রিলেশনসে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স, এবং হিন্দি জার্নালিজমে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স। প্রত্যেকটি কোর্সেরই দারুণ চাহিদা।

যে-কোনও স্তরের স্নাতকরাই এসব কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। যাঁরা ভর্তির বছরে স্নাতক পর্যায়ের ফাইনাল পরীক্ষা দেবেন তাঁরাও আবেদন করতে পারেন। তবে কোর্স শুরুর আগে পরীক্ষার ফলাফল জানা দরকার। প্রার্থীর বয়স হওয়া চাই ২৫ বছরের মধ্যে। তবে কর্মরত, তপশিলি জাতি, উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ বছর বয়সের ছাড় আছে। জার্নালিজম, অ্যাডভার্টাইজিং ও পাবলিক রিলেশনস কোর্সের জন্য কোর্স ফি দু' হাজার টাকা এবং হিন্দি জার্নালিজমের জন্য কোর্স ফি দেড় হাজার টাকা। জার্নালিজমে সিট আছে ২০টি। সাধারণ ছাত্রদের জন্য ১৫টি এবং তপশিলিদের জন্য ৫টি আসন সংরক্ষিত। অ্যাডভার্টাইজিং এবং পাবলিক রিলেশনসে সিট আছে ২৫টি। সাধারণ ছাত্রদের জন্য ১৯টি এবং তপশিলিদের জন্য সংরক্ষিত ৬টি। হিন্দি জার্নালিজম কোর্সে সিট আছে ৩০টি। সাধারণ ছাত্রদের জন্য ২২টি এবং সংরক্ষিত ৮টি। উপরন্তু প্রতিটি কোর্সে আরও ১০টি আসন রয়েছে বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্য। শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি এবং হিন্দি। হিন্দি জার্নালিজম কোর্সের জন্য শিক্ষার মাধ্যম অবশ্যই হিন্দি। ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে। হস্টেলে বহিরাগত ছাত্রছাত্রীদের জন্য থাকার ব্যবস্থা আছে। সেক্ষেত্রে মহিলা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার।

এপ্রিল মাসে সাধারণত ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র

বাছাই হয়। পরীক্ষা হয় দিল্লিতে। যথেষ্টসংখ্যক প্রার্থী হলে বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, জয়পুর, পাটনা, ভোপাল, লখনৌ এবং বেনারসে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলে প্রার্থীদের দিল্লিতে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়।

সেশন শুরু অগস্ট মাসে এবং শেষ এপ্রিল মাসে। সংবাদপত্রে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি বেরোনোর পর অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশন, শহিদ জিৎ সিং মার্গ, জে-এন-ইউ- নিউ ক্যাম্পাস, নয়াদিল্লি-১১০০৬৭ ঠিকানা থেকে আবেদন ফি আগাম দিলে ডাকযোগে আবেদন ফর্ম পাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্য ২৭×১০ সেমি মাপের নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ষাট পয়সার ডাকটিকিটযুক্ত একটি খাম পাঠাতে হবে। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট জার্নালিজম এবং পাবলিক রিলেশনস কোর্সের জন্য আবেদন ফি ৩০ টাকা এবং হিন্দি জার্নালিজম কোর্সের জন্য ২০ টাকা। ডাকে আবেদন ফর্ম নিতে হলে মনি-অর্ডার কিংবা পোস্টাল-অর্ডার পাঠালে চলবে না। শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মাস কমিউনিকেশন, নয়াদিল্লির অনুকূলে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট পাঠাতে হবে। তপশিলি জাতি বা উপজাতি প্রার্থীদের কোনও আবেদন ফি লাগে না। তাঁদের শুধু জাতিগত সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল পাঠাতে হয়।

আর-একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম না বললে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ইউনিভার্সিটি, নয়াদিল্লিতে জামিয়া মাস কমিউনিকেশন রিসার্চ সেন্টার পত্তন করেছেন। এখানে মাস কমিউনিকেশনে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্স পড়ানো হয়। দু' বছরের কোর্স। রেডিও, টেলিভিশন, ফিল্ম প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে থিওরিটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা দেওয়া হয়। যেসব ছাত্রছাত্রী স্নাতকস্তরে অন্তত শতকরা ৪৫ নম্বর পেয়ে পাশ করেছেন, তাঁরা আবেদন করতে পারেন এই কোর্সে ভর্তির জন্য। লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন করা হয়। শতকরা ২০টি আসন তপশিলি জাতি/উপজাতি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। এখানে দু' বছরের মাস কমিউনিকেশন এম-এ- কোর্সে ভর্তি হলে প্রায় ৩০ জন ছাত্রকে মাসিক স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়ে থাকে। যেসব বিষয় এখানে পড়ানো হয় তার মধ্যে আছে—অডিও - ভিস্যুয়াল প্রোডাকশন, রেডিও প্রোডাকশন, ভিডিও প্রোডাকশন, মিডিয়া স্ক্রিপটরাইটিং, ডাইরেকশন অ্যান্ড প্রোডাকশন, মিডিয়া অ্যাপ্রিসিয়েশন, গ্রাফিক্স, ক্যামেরা অ্যান্ড লাইটিং, সাউন্ড রেকর্ডিং, এডিটিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস ইত্যাদি।

এ ছাড়া পুনের ফিল্ম অ্যান্ড টি-ভি- ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন ডিপ্লোমা কোর্স সম্বন্ধে তো আগেই আমরা জেনেছি। টাইমস অব ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ দি টাইমস সেন্টার ফর মিডিয়া স্টাডিজ, টি আর এফ ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল সায়েন্সেস রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন (টাইমস হাউস, ৭ বাহাদুর শাহ জাফর মার্গ, নয়াদিল্লি-১১০০০২) বিজনেস জার্নালিজমের ওপর কোর্স শুরু করেছেন। পাবলিক রিলেশন্স সোসাইটি অব ইন্ডিয়া ঘরে বসে পাবলিক রিলেশন্স পড়ার জন্য কোর্স চালু করেছেন। এ-বিষয়ে যোগাযোগের ঠিকানা : ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, হোম স্টাডি ক্যাম্পাস, ৭৯৮ জীবনানন্দম রোড, কে কে নগর, মাদ্রাজ-৬০০০৭৮। কলকাতার ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন (৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯) বিভিন্ন সংবাদপত্রে সায়েন্স রিপোর্টিং এবং আকাশবাণী ও দূরদর্শনে বিজ্ঞানভিত্তিক অনুষ্ঠান বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করেছেন। আট সপ্তাহের সান্ধ্যকালীন কোর্স। যাঁদের জার্নালিজমে ডিপ্লোমা আছে এবং যাঁরা বিভিন্ন মিডিয়ায় কাজ করতে উৎসাহী তাঁদের ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কোর্স ফি ২৫০ টাকা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সহযোগিতায় শুরু-করা এই কোর্সটির নাম ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন সায়েন্স কমিউনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া প্র্যাকটিস।

আমাদের দেশে জার্নালিজমে পড়াশোনা শেষ করে বিদেশে পড়ারও সুযোগ রয়েছে। INLAKS FOUNDATION, (পোস্ট বক্স ২১০৮, দিল্লি-১১০০০৭) প্রতি বছর আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শিক্ষায়তনে কমিউনিকেশনে (ফিল্ম, টেলিভিশন, মিডিয়া বিভিন্ন বিষয়ে) উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশী বৃত্তি মঞ্জুর করে থাকেন। প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, বয়স হবে ১৯ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে এবং প্রথম শ্রেণীর স্নাতক হওয়া চাই। এ ছাড়া রয়েছে রয়টার ফাউন্ডেশন ফেলোশিপ। এক্ষেত্রে প্রার্থীকে কর্মরত সাংবাদিক হতে হবে ; বয়স হবে ২৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। ইংরেজিতে ভাল দখল থাকা চাই। বিস্তারিত যোগাযোগের ঠিকানা : ডিরেক্টর, দি রয়টার ফাউন্ডেশন, ৮৫ ফ্লিট স্ট্রিট, লন্ডন ই সি ৪পি ৪ এ জে, ইংল্যান্ড। কমিউনিকেশন টেকনোলজিতে গবেষণার জন্য নানা বিদেশী বৃত্তিও রয়েছে। কেমব্রিজ নেহরু স্কলারশিপ স্কিমের অধীনেও জার্নালিজম নিয়ে বিদেশে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে গবেষণা করার সুযোগ আছে। প্রার্থীর বয়স হওয়া চাই ২৬ বছরের কম, তাঁকে প্রথম শ্রেণীর অনার্স গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। বিস্তারিত খবরাখবরের জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে : জয়েন্ট সেক্রেটারি, নেহরু ট্রাস্ট ফর কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি, তিনমূর্তি ভবন, নয়াদিল্লি-১১০০১১ এই ঠিকানায়।

জার্নালিজম কিংবা মাস কমিউনিকেশন কোর্স পাশ করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয় না। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংবাদ কিংবা জনসংযোগ বিভাগে চাকরি পাওয়া যেতে পারে। ফ্রিল্যান্সিং করা যেতে পারে রেডিও, টিভিকেন্দ্র কিংবা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে যেমন সাংবাদিকের চাকরি পাওয়া যায় তেমনই বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি অফিসে পাবলিক রিলেশনস অফিসারের চাকরিও পাওয়া সম্ভব। চাকরি না পেলে নিজের উদ্যোগে নিউজ এজেন্সি খুলে আয়ের সংস্থানও করা যেতে পারে। সংবাদপত্র অফিসে কি কম কাজ আছে? নিউজ রিপোর্টার, সাব-এডিটর, কমেনটেটর, ক্রিটিক, লিডার - রাইটার, করসপনডেন্ট, এডিটর, অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর, কার্টুনিস্ট, আর্টিস্ট, ফোটোগ্রাফার, কমপোজার, এনগ্রেভার, প্রুফরিডার, কত ধরনের কাজ-ই না অপেক্ষা করছে জার্নালিজমের নানা কৌশল জানা প্রার্থীর জন্য। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রোগ্রাম অ্যানাউনসার, নিউজ রিডার, প্রোডিউসার, নিউজ রিপোর্টার, নিউজ এডিটর, টিভি ফোটোগ্রাফারের নানা পদে লোক নেওয়ার সময় জার্নালিজম জানা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার থাকে।

সবশেষে বলে রাখি, ভাল সাংবাদিক হতে হলে সব বিষয়ে দখল থাকা দরকার। চিন্তাশক্তি প্রখর ও দৃষ্টি হওয়া চাই তীক্ষ্ণ। বিশ্লেষণী ক্ষমতাও থাকা চাই। তা হলে পরিবেশিত সংবাদ হয়ে উঠবে জীবন্ত। মনে সাহস রাখতে হবে, প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করার মতো মানসিকতা তৈরি রাখতে হবে। বিজ্ঞান, রাজনীতি, উন্নয়ন, সমাজ, খেলাধুলা সবকিছু নিয়েই আধুনিক সাংবাদিকতা। সাহস, নিষ্ঠা, সততা এবং ধৈর্য নিয়ে এগোলে সফলতা অনিবার্য।

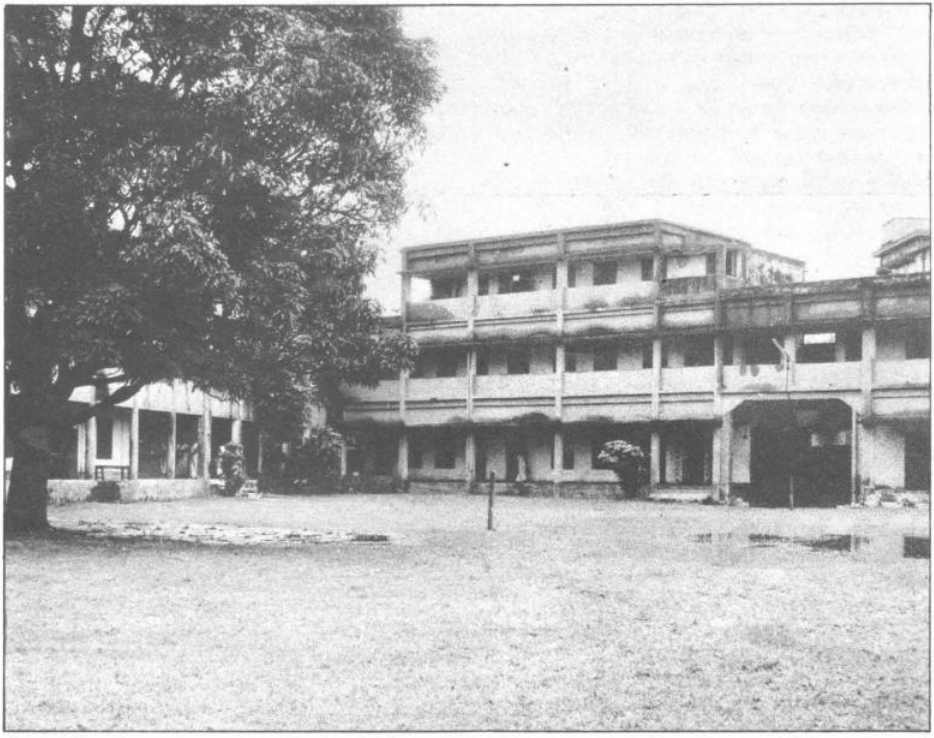

শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুল

দেশ-বিভাগের পর দার্জিলিং জেলার সমতলে বেশি বিদ্যালয় ছিল না। ঠিক সেই সময় সমতলের ছোট্ট শহর শিলিগুড়িতে, ১৯৪৭ সালে, কয়েকজনের প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছিল একটি বালিকা বিদ্যালয়। ১৭ জন ছাত্রী ও ৩ জন শিক্ষিকাকে নিয়ে শুরু হয়েছিল জয়যাত্রা। প্রয়াত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, প্রাক্তন প্রধানশিক্ষিকা শ্রীমতী নিভা দাশগুপ্ত এবং সদ্য অবসরপ্রাপ্তা শ্রীমতী কণিকা দে এবং আরও কয়েকজন বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যে অর্থ, জমি ইত্যাদি সংগ্রহ করে গড়ে তুলেছেন আজকের বৃহৎ বিদ্যালয়টি।

স্বাধীনতার ৪২ বছর পর শিলিগুড়ি এখন ব্যস্ত, বড় শহর এবং শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুলও এখন অনেক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম বাঁয়ে রেখে যে রাস্তাটা মহকুমা হাসপাতালের পেছন দিয়ে শিলিগুড়ি কলেজের দিকে এগিয়ে গিয়েছে সেই রাস্তার বাঁ দিকে কলেজ মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই স্কুল। বর্ষার কালো মেঘ মাথার ওপর থমকে আছে। স্কুলের সদর দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেই চোখে পড়ে সবুজ ঘাসের লন। একপাশে আমের গাছ, সেই গাছের ছায়ায় ঢাকা প্রধানশিক্ষিকার কোয়ার্টার্স। স্কুলের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতেই প্রধানশিক্ষিকা শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্ত জানালেন, তিনি এই স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এবছর

প্রধানশিক্ষিকা

অগস্ট মাসেই অবসর নিচ্ছেন। তিনি আরও বললেন, অবসরপ্রাপ্তা সহপ্রধানশিক্ষিকা শ্রীমতী কণিকা দে-র কাছে এই বিদ্যালয়ের গোড়ার কথা সব জানতে পারবেন।
বিদ্যালয়ের ছাত্রী-সংখ্যা এখন প্রায় ১৪০০ জন এবং শিক্ষিকা ৪৩ জন। প্রতিদিন বিদ্যালয় শুরুর আগে প্রার্থনা সভা হয়।
শ্রীমতী কণিকা দে বলেছেন, ১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগের পর হিমালয়ের কোলে মহানন্দা নদীর ধারে অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে শিলিগুড়ির এই স্কুলে এসে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত খোলা হয় পরিত্যক্ত একটা মিলিটারি ব্যারাকে। ১৯৫০ সালে বিদ্যালয়টি স্থায়ী ভবনে উঠে আসে। প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধানশিক্ষিকা ছিলেন শ্রীমতী নিভা দাশগুপ্ত। তারপর আসেন শ্রীমতী অমিয়া সেনগুপ্ত।
তিনি এখন কলকাতায় থাকলেও এই স্কুলে এখনও তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে সবাই স্মরণ করেন। বিদ্যালয়ের গত তিন বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রসঙ্গে বর্তমান প্রধানশিক্ষিকা জানিয়েছেন, ১৯৮৭ সালে ১০৯ জন ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। ৪০ জন প্রথম বিভাগে, ৬১ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং তৃতীয় বিভাগে পাঁচজন পাশ করেছিল। কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছিল তিনজন। ১৯৮৮ সালে ১৫৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম বিভাগে পাশ করে ২৬ জন। দ্বিতীয় বিভাগে

ল্যাবরেটরিতে ছাত্রীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা

পাশ করেছিল ১১৫ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ১০ জন। ছ'জন পেয়েছিল কম্পার্টমেন্টাল। এবছর ১২১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫০ জন প্রথম বিভাগে, ৬৪ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং তৃতীয় বিভাগে তিনজন পাশ করেছে। চারজনের ফল অসমাপ্ত।

এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রীরা অনেকেই পরবর্তী জীবনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কেউ হয়েছেন ডাক্তার, কেউ আইনজীবী, কেউ অধ্যাপিকা, আবার কেউবা সাংবাদিক। এই বিদ্যালয়েরই কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রী উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে এসে এখানেই শিক্ষকতা করছেন। খেলাধুলোয় এই স্কুলের এখন ততটা নাম না থাকলেও একসময় ছিল। এই স্কুলেই ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিলেন মধুমিতা গোস্বামী। এখন তিনি মধুমিতা বিস্ত। ব্যাডমিন্টনে সারা ভারতে তাঁর নাম।
স্কুলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়মিত হয়ে থাকে। হয়ে থাকে বার্ষিক ক্রীড়া। তা ছাড়া নাচ, গান, বিতর্ক, ছবি আঁকা ইত্যাদি তো আছেই। 'নির্ঝরিণী' নামে বার্ষিক পত্রিকাটিও নিয়মিত প্রকাশিত হয়।
লাইব্রেরি ও তিনটি ভাল ল্যাবরেটরি আছে স্কুলে।
এই স্কুলের লেখাপড়ার পরিবেশ ভারী সুন্দর। লেখাপড়া ছাড়াও শিল্পচর্চা ও বিজ্ঞান গবেষণারও চমৎকার সুযোগ আছে।
ছাত্রীদের সদাসর্বদা অনুপ্রাণিত করার জন্য আছেন শিক্ষিকারা। শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, সারা বাংলাতেই একদিন এই স্কুলের নাম ছড়িয়ে পড়বে এই আশা আমাদের সকলের।

রেবা ঘোষ (মৈত্র)

ফোটো : প্রদীপ ঘোষ

দশম শ্রেণীর প্রথম ছাত্রী

দার্জিলিং জেলার প্রাণচঞ্চল শহর শিলিগুড়ির রবীন্দ্রনগরের একটি বাড়িতে বসে যে মেয়েটির সঙ্গে কথা হল সেই মেয়েটির নাম নীলাঞ্জনা চক্রবর্তী। নীলাঞ্জনা জানাল, সে নবম শ্রেণী থেকে প্রথম হয়ে দশম শ্রেণীতে উঠেছে। পঞ্চম শ্রেণী থেকে বরাবর প্রথম হয়ে আসছে। ওর সবচেয়ে প্রিয় বিষয় অঙ্ক ও ভৌত বিজ্ঞান। এবারে ভৌত বিজ্ঞানে নীলাঞ্জনা পেয়েছে ৯৩। ছ'-সাত ঘন্টা সে পড়াশোনা করে। গল্পের বই পড়তে ও গান শুনতেও ভালবাসে। ভালবাসে বেড়াতে। ওর প্রিয় লেখক সত্যজিৎ রায়, সৈয়দ মুজতবা আলি ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ওর বাবা শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক, মা শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপিকা। নীলাঞ্জনা বড় হয়ে বাবা-মায়ের মতোই অধ্যাপিকা হতে চায়।

টিনটিন * হার্জ

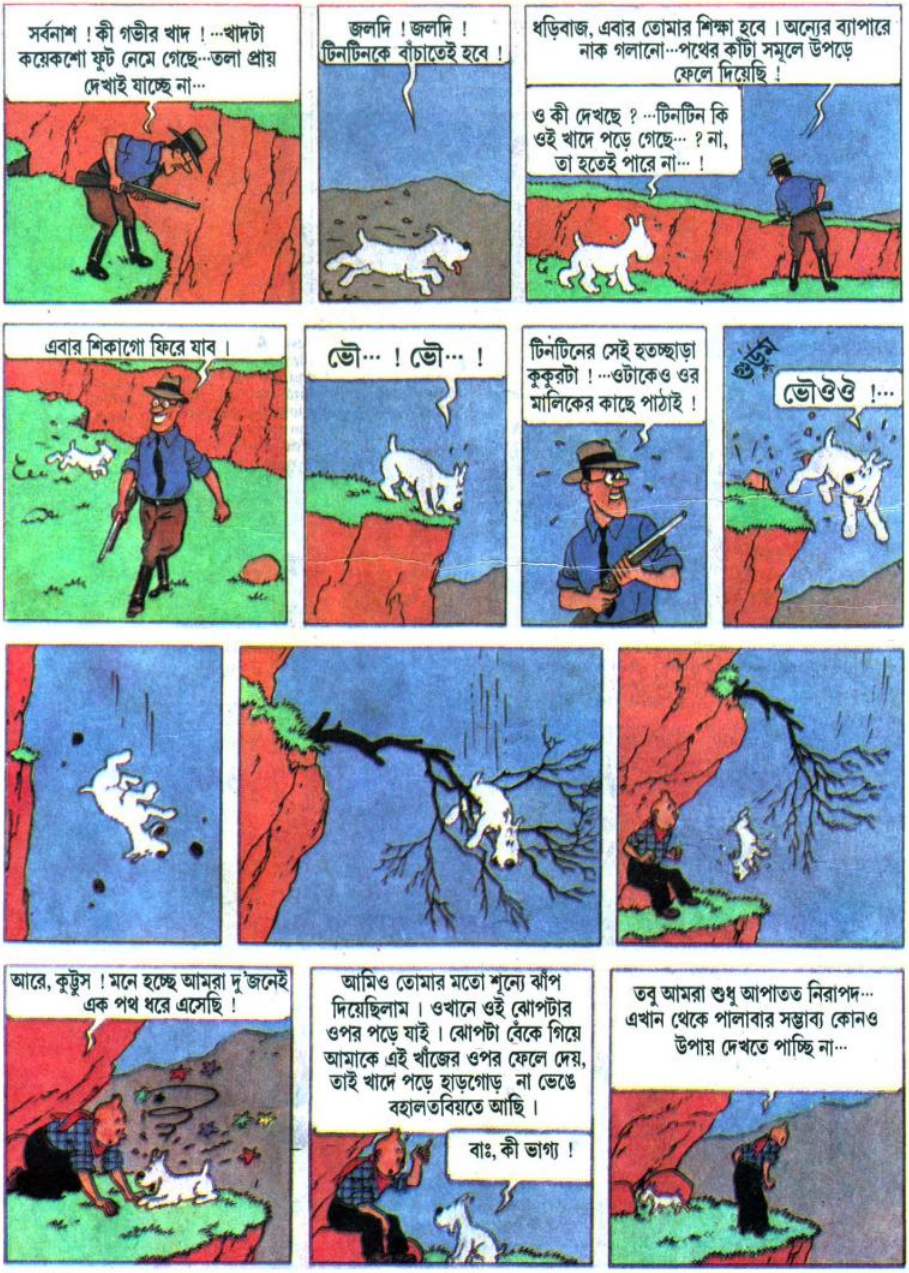
সর্বনাশ ! কী গভীর খাদ ! ...খাদটা কয়েকশো ফুট নেমে গেছে...তলা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না...
জলদি ! জলদি ! টিনটিনকে বাঁচাতেই হবে !
ধড়িবাজ, এবার তোমার শিক্ষা হবে । অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো...পথের কাঁটা সমূলে উপড়ে ফেলে দিয়েছি !
ও কী দেখছে ? ...টিনটিন কি ওই খাদে পড়ে গেছে... ? না, তা হতেই পারে না... !
এবার শিকাগো ফিরে যাব ।
ভৌ... ! ভৌ... !
টিনটিনের সেই হতচ্ছাড়া কুকুরটা ! ...ওটাকেও ওর মালিকের কাছে পাঠাই !
গুড়ুম
ভৌওও !...
আরে, কুট্টুস ! মনে হচ্ছে আমরা দু'জনেই এক পথ ধরে এসেছি !
আমিও তোমার মতো শূন্যে ঝাঁপ দিয়েছিলাম । ওখানে ওই ঝোপটার ওপর পড়ে যাই । ঝোপটা বেঁকে গিয়ে আমাকে এই খাঁজের ওপর ফেলে দেয়, তাই খাদে পড়ে হাড়গোড় না ভেঙে বহালতবিয়তে আছি ।
বাঃ, কী ভাগ্য !
তবু আমরা শুধু আপাতত নিরাপদ... এখান থেকে পালাবার সম্ভাব্য কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছি না...

আমেরিকায় টিন টিন

ওখানে কী শুঁকছিস, কুট্টস ?...কিছু দেখতে পেয়েছিস নাকি ?
হে ঈশ্বর !...আশ্চর্য...একটা গুহা মনে হচ্ছে...এটা কোথায় গেছে দেখি না কেন ?
এগিয়ে যাওয়া যাক !
আমরা কোথায় ?
কুট্টস, সাবধান !...
এটা ক্রমেই আরও উপরে উঠে গেছে...
আমরা কোথায় গিয়ে উঠব ?
দ্যাখ ! ইন্ডিয়ানদের আঁকা ছবিতে সাজানো বিরাট এক গ্যালারি...
সম্ভবত শত্রুর তাড়া খেয়ে কালো-পা ইন্ডিয়ানরা এখানে লুকিয়ে ছিল...
এটা আর-একটা মুখ...
এখনও উপরে উঠছে !...এই সুড়ঙ্গ কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে ?
আহ্, এবার এটা নীচের দিকে যাচ্ছে...
... আবার খাড়া উপরে উঠছে...
অবশেষে অপদার্থ রিপোর্টারটার হাত থেকে রেহাই পেয়েছি ! এখন ফিরতি পথে রওনা হবার আগে কিছু খেয়ে নিতে হবে...
এখানে এসব কী হচ্ছে, অ্যাঁ ? নিশ্চয় ভূমিকম্প ! আমার পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে...
?
বাপ রে ! কী ভারী !

এনিড ব্লাইটন অবলম্বনে **পঞ্চরত্ন** সোনার তরী মূল কাহিনী : ক্লদ ভয়লার লেখা : সার্জ-রোজেনজাইগ আঁকা : বার্নার্ড দুফোসে

এনিড ব্লাইটন অবলম্বনে **পঞ্চরত্ন** **সোনার তরী** মূল কাহিনী : ক্লদ ভয়লার লেখা : সার্জ রোজেনজাইগ আঁকা : বার্নার্ড দুফোসে

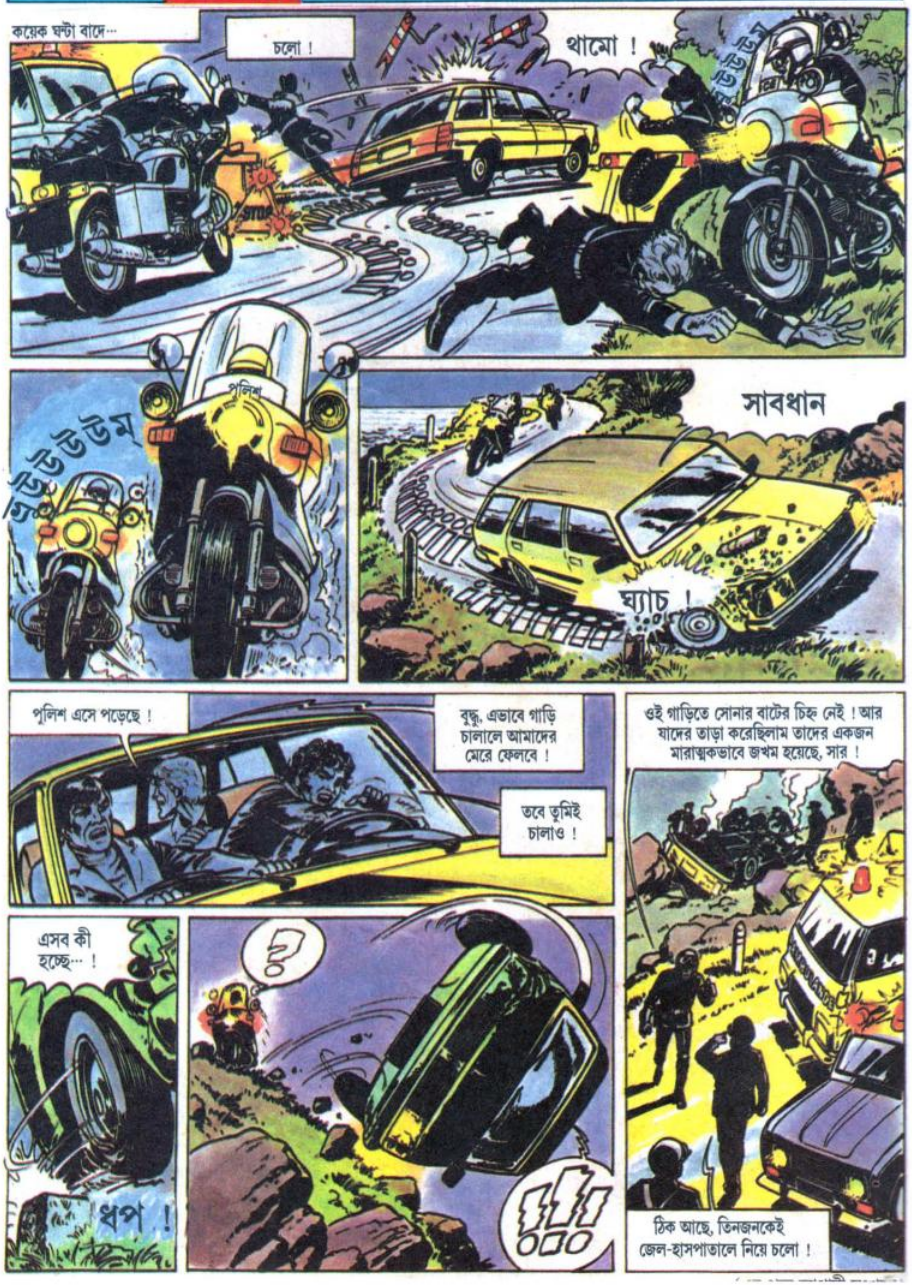

মুঠো শক্ত করার কৌশল

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

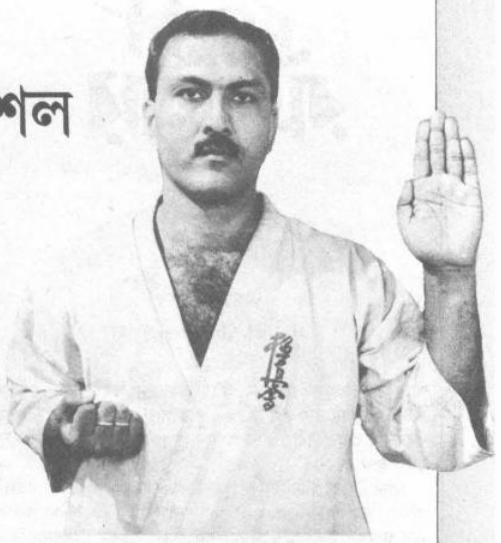

গত কয়েকটি সংখ্যায় আমি কিওকুশিন ক্যারাটের বেশ কিছু ব্যায়াম ও স্ট্রেচিং নিয়ে আলোচনা করেছি। হাতের আঙুলের জোর বাড়ানোর পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। আগেই বলেছি ক্যারাটে কথাটার মানে হল, "খালি হাতে আত্মরক্ষার কৌশল।" সুতরাং এই কথা থেকেই বোঝা যায়, ক্যারাটেতে হাতের ভূমিকা কতটা। প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করে তাকে প্রতি-আক্রমণে কাবু করাই হাতের প্রথম ও প্রধান কাজ। হাতের আঙুলগুলো পাশাপাশি রেখে, আঙুলগুলো গুটিয়ে এনে কীভাবে মুঠো শক্ত করা যায়, এটাই প্রথমে শিখতে হবে। মুঠো ঠিকমতো করতে পারলে একটা কৌশলের সাহায্যে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করা যায়, এবং অন্য আর এক কৌশলে 'পাঞ্চ' করে বা ঘুসি মেরে প্রতিপক্ষকে পালটা আক্রমণে পর্যুদস্ত করা যায়। ঠিক কীভাবে মুঠো শক্ত করতে হবে তা নিয়ে আমি এখন আলোচনা করছি। মুঠো ঠিকমতো শক্ত হলে প্রতিপক্ষকে যেমন ঘুসিতে কাবু করা যায়, তেমনই নিজেরই কোনও চোট লাগে না।

প্রথমে দু' হাত শরীরের পাশে ঝুলিয়ে রেখে দাঁড়াতে হবে। তারপর একটা হাত কনুই থেকে মুড়ে ওপর দিকে তুলে হাতের প্রত্যেকটা আঙুল পাশাপাশি রাখতে হবে। তারপর কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা—এই তিনটি আঙুল দ্বিতীয় সন্ধিস্থল থেকে মুড়তে হবে। তর্জনী সোজা থাকবে। এবার তিনটি আঙুল

মুড়ে হাতের তালু স্পর্শ করবে। প্রথম যে তিনটি আঙুল মোড়া রয়েছে, তর্জনী তার পাশাপাশি মুড়ে রাখতে হবে। এবার হাতের তালুর ওপর আঙুলের প্রথম সন্ধিস্থল থেকে চারটি আঙুল আবার মুড়তে হবে শক্ত করে। ঠিকভাবে মোড়া হয়ে গেলে বুড়ো আঙুলটাকে প্রথম ও দ্বিতীয় সন্ধিস্থল থেকে মুড়ে শক্ত করে তর্জনী ও মধ্যমার ওপর রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, আঙুলগুলো যখন মুড়ে রাখা হচ্ছে তখন সেগুলোর মধ্যে কোনওরকম অসমান অবস্থা বা ফাঁক না থাকে। হাত ঠিকমতো মুঠো না করে ঘুসি মারা ঠিক নয়। অনেকের হাতের নমনীয়তার জন্য হাতের মুঠো ঠিক হয় না। ক্যারাটের পাঞ্চের জন্য বিশেষ করে তর্জনী ও মধ্যমার অবস্থান (আঙুল মোড়ার পর) সমান হওয়া চাই। অনেক সময় হাত খোলা রেখে প্রতিপক্ষের আক্রমণ 'ব্লক' করা যায়। কিন্তু এখানে হাতের মুঠো শক্ত রাখার কথা বলছি, ঘুসি মারার জন্য যা একান্তই প্রয়োজন।

শরীরটাকে ক্যারাটের জন্য কীভাবে তৈরি করতে হবে, কীভাবে নিজের মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে এই বিষয়গুলি নিয়েই এতদিন আলোচনা করলাম। কিওকুশিন ক্যারাটের মূল পর্বের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি নিয়ে আগামী পর্বে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

ফোটো : উৎপল সরকার

উদাসী রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মাত্র চারজন দেহরক্ষী নিয়ে মহারানি তলতাদেবী বেরিয়ে পড়লেন রাজধানী থেকে। তাঁর সাদা ঘোড়ার পিঠে রাজছত্র বসানো। তলতাদেবীও পরে আছেন রেশমের পোশাক। তিনি সাদা রং পছন্দ করেন।

নগর থেকে খানিকটা দূরে একটা উঁচু টিলার ওপর মহাকালের মন্দির। তলতাদেবী প্রথমে চললেন সেই দিকে। রাজধানীর প্রজারা মনে করবে যে, মহারানি মন্দিরে পূজা দিতে যাচ্ছেন। সেখানে তিনি প্রায়ই যান।

প্রথমে তলতাদেবী মহাকালের মন্দিরে এসে সত্যিই ভক্তিভরে পূজা দিলেন। সেখানকার পুরোহিতের সঙ্গে কথা বললেন খানিকক্ষণ। এই মন্দিরের জন্য একটি অতিথিশালা বানানো দরকার। মহারানি প্রতিশ্রুতি দিলেন, শীঘ্র একটি অতিথিশালা বানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

তারপর মন্দির থেকে বেরিয়ে মহারানি গেলেন কাছাকাছি একটা ঝরনা দেখতে। তীর্থযাত্রীরা অনেকেই এই ঝরনায় এসে স্নান করে। রাজা-রানির জন্য আলাদা করে ঘেরা একটা জায়গা আছে। তলতাদেবী সেখানে গিয়েও স্নান করতে নামলেন না। তিনি আগেই স্নান করে এসেছেন।

ঝরনাটা ছাড়িয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন জঙ্গলের মধ্যে।

একটু পরেই দেহরক্ষীরা পৌঁছে গেল তাঁর কাছে। সবাই মিলে যেতে লাগলেন গভীর জঙ্গলের দিকে, একজন গুপ্তচর পায়ে হেঁটে আগে আগে তাঁদের পথ দেখিয়ে যেতে লাগল।

এদিকে আর কোনও গ্রাম নেই। শুধু পাহাড়ের পর পাহাড় আর জঙ্গল। একটু সরু পায়ে-চলা পথ রয়েছে শুধু। তলতাদেবী এদিককার পথ চেনেন না। তবু তিনি একটুও ভয় পেলেন না। তাঁর দেহরক্ষী চারজন অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং নিপুণ যোদ্ধা। তারা মহারানির জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। এ-রাজ্যে চোর-দস্যুরও তেমন উৎপাত নেই। তা ছাড়া মহারানির পথ আটকে দাঁড়াবার মতন সাহস এ-রাজ্যের কোনও মানুষের হবে না।

মহারানি শুধু একটাই চিন্তা করতে লাগলেন, কাজ উদ্ধার করে তাঁকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসতে হবে। মহারাজ জেগে ওঠার আগেই!

চম্পকের রাগ করার কারণ আছে। সে এই রাজ্যের সেনাপতি। তার বাবাও সেনাপতি ছিলেন। হঠাৎ মহারাজ মহাচূড়ামণি তাকে সেনাপতিত্ব থেকে সরিয়ে জুতো পরাবার কাজ দিলেন। মহারাজের মাথায় মাঝে-মাঝে এরকম অদ্ভুত খেয়াল জাগে।

অবশ্য যুদ্ধের সময় মহারাজ নিজেই সৈন্য পরিচালনা করেন। সেনাপতি চম্পকের বিশেষ কোনও কাজ থাকে না। চম্পকের সুন্দর চেহারা, সেইজন্য আড়ালে অনেকে তাকে ঠাট্টা করে বলত, পুতুল-সেনাপতি!

কিছু পাহাড়ি উপজাতির সৈন্য জুটিয়ে নিয়ে চম্পক বিদ্রোহ-ঘোষণা করে নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছে। এত সাহস তার হল কী করে? মহারাজ মহাচূড়ামণি নিজে অস্ত্র ধারণ করে, উত্তর পাঞ্চালের সৈন্যবাহিনী সঙ্গে নিয়ে এলে, চম্পক এই সামান্য দলবল নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারবে না। নির্ঘাত তার প্রাণ যাবে। বিদ্রোহীদের মহারাজ কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

এখন চম্পকের বাঁচার একমাত্র উপায় কিছুদিনের জন্য কোথাও লুকিয়ে থাকা। এমনকী, সে যদি এ-রাজ্যের বাইরে চলে যায়, তা হলে আরও ভাল।

হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে প্যাঁ পোঁ প্যাঁ পোঁ করে খুব জোর ভেঁপু বেজে উঠল।

শব্দ যে কোথা থেকে এল তা বোঝাই গেল না প্রথমে। তারপর সেই শব্দটা ক্রমেই দূর থেকে আরও দূরে ছড়িয়ে পড়ল।

দেহরক্ষী চারজন চতুর্দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দেখে এসে জানাল যে, এখানকার অনেকগুলো গাছে প্রহরীরা বসে আছে। তারা ভেঁপু বাজিয়ে সঙ্কেত দিচ্ছে। নিশ্চয়ই কাছেই কোথাও চম্পকের বাহিনীর শিবির।

তলতাদেবী বললেন, "হুঁ, ব্যবস্থা ভালই করেছে দেখছি! এগিয়ে চলো!"

ক্রমশই ভেঁপুর আওয়াজ বাড়তে লাগল। আরও খানিকটা এগোবার পর দেখা গেল জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে সারি-সারি তাঁবু।

তাঁবুগুলোর সামনে অন্তত পঞ্চাশজন পাহাড়ি যোদ্ধা দাঁড়িয়ে

আছে। তাদের খালি গা, কোমরের নীচে পালকের পোশাক, মাথাতেও পালক গোঁজা। তাঁরা তীর-ধনুক উঁচিয়ে আছে। ছিলা টান টান, যে-কোনও মুহূর্তে ছুটে আসবে ধারালো তীর।

তলতাদেবী ঘোড়া থামিয়ে ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন।

প্রধান দেহরক্ষী সোমদত্ত জিজ্ঞেস করল, "মহারানি, আমরা কি আর এগোব?"

তলতাদেবী বললেন, "তুমি সাদা পতাকা এনেছ তো? সেই পতাকা উড়িয়ে দাও।"

সোমদত্ত সাদা পতাকা তুলে মহারানিকে আড়াল করে দাঁড়াল।

তলতাদেবী তখন গুপ্তচরটিকে বললেন, "তুমি আমাদের দূত হয়ে সামনে এগিয়ে যাও! সেনাপতি চম্পককে আমার এই বার্তা দেবে; উত্তর পাঞ্চাল রাজ্যের মহারানি এসেছেন সেনাপতি চম্পকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তিনি সঙ্গে সেনাবাহিনী আনেননি। সেনাপতি চম্পক তাঁর অনুচরদের অস্ত্র নামিয়ে ফেলতে আদেশ দিল।"

গুপ্তচরটি সেই তীর-ধনুক উঁচানো পাহাড়ি সৈন্যদের দিকে, আর-একবার মহারানির দিকে তাকিয়ে ভয়-পাওয়া কাঁপা-কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "যাব? আমি একা যাব?"

মহারানি আঙুল তুলে আদেশ দিলেন, "যাও!"

সে দুরুদুরু বুকে এগিয়ে যেতে লাগল। পাহাড়ি যোদ্ধারা তখনও তীর-ধনুক উঁচিয়ে আছে।

একটু পরেই মহারানির দূত ফিরে এল, সঙ্গে বিপক্ষের একজন দূত। সেই বিপক্ষের দূতটি রানিকে প্রণাম জানিয়ে বলল, "স্বাগতম মহারানি! আমাদের দলপতি আপনাকে তাঁর শিবিরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তবে, আপনার চারজন দেহরক্ষীকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। তারা আর এগোতে পারবে না!"

প্রধান দেহরক্ষী সোমদত্ত তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, "না, আমরা মহারানিকে একলা যেতে দেব না!"

তলতাদেবী হাত তুলে সোমদত্তকে চুপ করতে ইঙ্গিত করলেন।

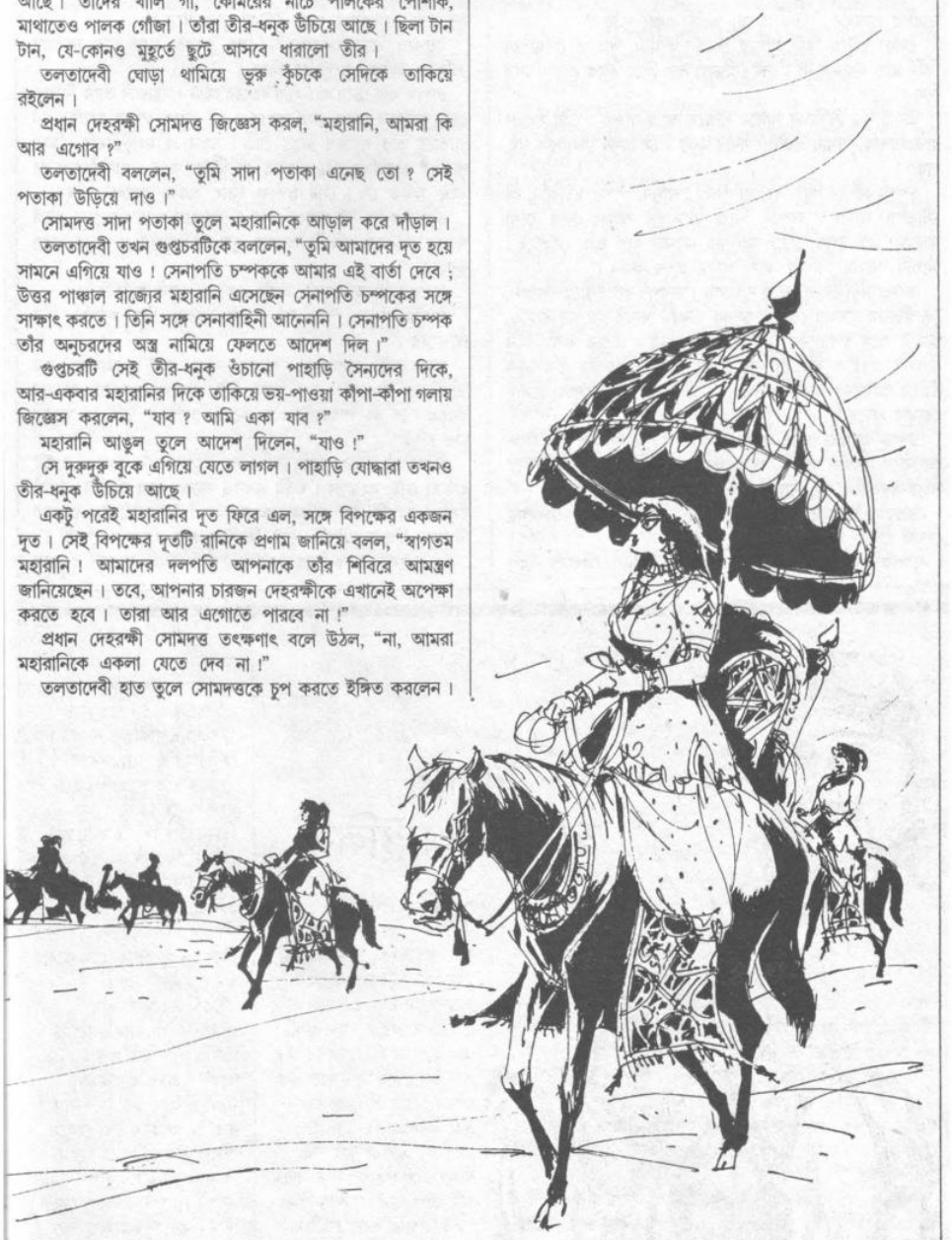

তারপর বললেন, "ঠিক আছে, আমি একাই যাব !"

ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন সামনে, পাহাড়ি যোদ্ধাদের তিনি গ্রাহ্য করলেন না। সেই যোদ্ধারা সরে গিয়ে তাঁকে জায়গা করে দিল।

একটি বড় শিবিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে চম্পক। তার সর্বাঙ্গে রাজপোশাক, মাথায় একটা সোনার মুকুট। সে এখন সেনাপতি নয়, রাজা !

চম্পক এগিয়ে গিয়ে সহাস্যে বলল, "আসুন, আসুন, মহারানি, কী সৌভাগ্য আমার ! আপনি নিজে এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। এই দুপুর রৌদ্রে আপনার সোনার বর্ণে আঁচ লেগেছে। আপনি আমার শিবিরে এসে আসন গ্রহণ করুন।"

তলতাদেবী ঘোড়া থেকে নামলেন। তারপর রাগত স্বরে বললেন, "এ কীরকম ব্যবহার তোমার, চম্পক ! আমি দিনের আলোয় এসেছি, আমার সঙ্গে চারজনের বেশি দেহরক্ষী নেই। গাছের ওপর বসে তোমার প্রহরীরা সব দেখেছে। তবু তোমার সৈন্যরা তীর-ধনুক উঁচিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করল ? আমি কি শত্রু হিসেবে এসেছি তোমার কাছে ?"

চম্পক এবারও হেসে বলল, "আমার পাহাড়ি সৈন্যরা অস্ত্র তুলে আপনাকে সম্মান জানিয়েছে। তা ছাড়া, আমি যে একেবারে সহায়-সম্বলহীন নই, সে-কথাও আপনাকে জানানো হল।"

তলতাদেবী বললেন, "হুঁ, তুমি এর মধ্যেই রাজা হয়ে গেছ দেখছি !"

চম্পক মহারানিকে নিয়ে এল শিবিরের মধ্যে। সেখানটা বেশ সুন্দরভাবে সাজানো প্রচুর টাটকা ফুল দিয়ে।

ভেতরে এসে তলতাদেবী বেশ কয়েক মুহূর্ত অপলকভাবে তাকিয়ে রইলেন চম্পকের দিকে।

চম্পক তাঁর চেয়ে প্রায় পাঁচ বছরের ছোট। মহারানি তাকে নিজের ছোট ভাইয়ের মতন স্নেহ করেন। এর আগে চম্পক প্রায়ই নানা ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ নিতে যেত। মহারাজা মহাচূড়ামণি ঘুমিয়ে থাকলে মহারানির কাছ থেকেই সে নির্দেশ নিত। মহারানিকে খুব ভক্তি করত সে। সেই চম্পক হঠাৎ অনেক বদলে গেছে।

চম্পক বলল, "কী খাবেন বলুন ? রোদ্দুরের মধ্যে এসেছেন, আগে শরবত আনতে বলি ? তারপর দুপুরের আহার্য এখানেই গ্রহণ করবেন।"

তলতাদেবী বললেন, "আমি এখানে খেতে আসিনি !"

চম্পক বলল, "আপনার সেবা করার কিছু সুযোগ দিন আমাদের !"

তলতাদেবী বললেন, "আমার সময় নেই। আমাকে খুব তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। আমি ছুটে এসেছি তোমাকে সাবধান করতে। এ কী পাগলামি শুরু করেছ, চম্পক ? তমি কি মরতে চাও ?"

চম্পক হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "মৃত্যুর জন্য আমার মোটেই ব্যস্ততা নেই, মহারানি ! আমি এখনও অনেক বছর বাঁচব। আপনি বসুন। আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন ? উত্তর পাঞ্চাল রাজ্যের বিপদের চিন্তায় আপনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়ছেন দেখছি !"

তলতাদেবী ধমক দিয়ে বললেন, "আমি উত্তর পাঞ্চাল রাজ্যের

কে প্রথম

বিমানে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া

বিমানে প্রথম ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া যাতায়াত করেন অগ্রণী ইংরেজ বৈমানিক অ্যালান কবহ্যাম। তাঁর বয়েস তখন ৩২ বছর। ১৯২৬ সালের ৩০ জুন একটি এক ইঞ্জিনের বাইপ্লেনে কেন্টের রচেস্টার থেকে তিনি যাত্রা শুরু করেন। সঙ্গে তাঁর বন্ধু এবং এঞ্জিনিয়ার এ. বি. এলিয়ট। চারদিন বিমান চালিয়ে তাঁরা বাগদাদ পৌঁছলেন। পঞ্চম দিনে ঘটে গেল এক বিয়োগান্ত ঘটনা। ছোট্ট বিমানটি যখন তাইগ্রিস উপত্যকার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, এক আরব বিমানটিকে লক্ষ করে গুলি ছোঁড়ে। গুলি এলিয়টের হাত ভেঙে দিয়ে ফুসফুসের গভীরে ঢুকে যায়। কবহ্যাম শব্দ শুনে দেখতে পেলেন তাঁর বন্ধু আহত হয়ে ঢলে পড়ছে। ঝড়ের বেগে বিমান নিয়ে তিনি বসরায় ছুটে গেলেন, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরেই এলিয়টের মৃত্যু হল।

এলিয়টের জায়গায় রাজকীয় বিমানবাহিনীর সার্জেন্ট ওয়ার্ডকে নিয়ে ১৩ জুলাই কবহ্যাম আবার রওনা হলেন। প্রচণ্ড বৃষ্টির ভিতর দিয়ে তাঁরা ডারউইন পৌঁছলেন ৫ অগস্ট। ফিরতি পথে যাত্রা শুরু হয় ২৯ অগস্ট। প্রচণ্ড ঝড়ের জন্য মালয় ছাড়িয়ে এক দ্বীপে নামতে বাধ্য হন কবহ্যাম এবং রেঙ্গুনে আবার তাঁর দেরি হয়ে যায়। কিন্তু ২৮,০০০ মাইল পথ উড়ে এবং ৩২০ ঘণ্টা আকাশে থেকে তিনি নিরাপদে ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন।

বিপদের কথা একবারও ভাবিনি। আমি ছুটে এসেছি তোমাকে বাঁচাতে। তোমাকে বলেছিলাম, মহারাজের রাগ কমে যাওয়ার অপেক্ষায় কোনও গ্রামে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে। তুমি আমার কথা শুনলে না।"

চম্পক বলল, "আমি লুকিয়ে থাকব কেন ? মহাচূড়ামণিকে আমি গ্রাহ্য করি না। ওই হোঁতকাটাকে আমি আর ভয়ও পাই না।"

"তোমার এত সাহস এল কোথা থেকে ? মহারাজ এখনও কিছুই জানেন না। আমি তোমাকে বলতে এসেছি, তুমি সন্ধের আগেই পালিয়ে যাও ! কিছুদিনের জন্য অন্য রাজ্যে আশ্রয় নাও। প্রয়াগ কিংবা বারাণসী ঘুরে এসো !"

"আমি অন্য রাজ্যে পালাব ? আমি মহাচূড়ামণিকে এবার চরম শিক্ষা দেব। ওই মূর্খ রাজাটা এতদিন অন্যদের যা ইচ্ছে শাস্তি দিয়েছে। এবার আমি তাকে এমন শাস্তি দেব যে, সে কল্পনাও করতে পারবে না !"

"কী পাগলের মতন কথা বলছ, চম্পক ? মহারাজ যখন শুনবেন যে, তুমি বিদ্রোহ করেছ, অমনি তিনি ক্রোধে জ্বলে উঠবেন। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ছুটে এলে তুমি তৃণখণ্ডের মতন উড়ে যাবে।"

"আমি তো মহাচূড়ামণির জন্যই অপেক্ষা করছি। আসুক না সে !"

"তুমি এই সামান্য কয়েকজন সৈন্য নিয়ে মহারাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে ?"

"আমার সৈন্যরা মোটেই সামান্য নয়। শিগগিরই অন্য সাহায্য আসবে।"

"অন্য সাহায্য মানে ? তুমি কী বলছ, চম্পক ? তুমি কি বিদেশী শত্রুদের সাহায্য নিয়ে দেশের সর্বনাশ করতে চাও ? তুমি এমন কুলাঙ্গার হয়েছ ?"

"বিদেশী সাহায্যেরও দরকার হবে না। সাহায্য আসবে দেশের মধ্যেই আসল জায়গা থেকে। তবে আপনি চিন্তা করবেন না, মহারানি। ওই ঘটোৎকচ মহাচূড়ামণিটাকে আমি কঠিন শাস্তি দিলেও আপনার কোনও ক্ষতি হবে না !"

তলতাদেবী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক এখানেই শেষ ! এর পর তোমার যা হয় হোক, তা নিয়ে আর আমি ভাবব না !"

চম্পক দু' হাত ছড়িয়ে মহারানির পথ আটকে বলল, "বসুন, বসুন, এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? আমার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক শেষ কী বলছেন ? এই তো সবে শুরু। মহাচূড়ামণির যাই-ই হোক না কেন, আপনি যেমন উত্তর পাঞ্চালের মহারানি আছেন, তাই-ই থাকবেন।"

তলতাদেবী বললেন, "তার মানে ?"

চম্পক মহারানির দু' বাহু ছুঁয়ে বলল, "আমি বসব উত্তর পাঞ্চালের সিংহাসনে, আপনি হবেন মহারানি।"

তলতাদেবী কয়েক মুহূর্ত মহাবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন চম্পকের দিকে।

তারপরেই ক্রোধে তাঁর মুখ রক্তিমবর্ণ হয়ে গেল। তিনি ঠাস করে এক চড় কষালেন চম্পকের গালে।

দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন, "অকৃতজ্ঞ ! অমানুষ !"

চড় খেয়েও চম্পক হাসতে-হাসতে বলল, "কেন, আমার কথাটা পছন্দ হল না ? আমি রাজা হলেও রানি হিসেবে আপনাকে মানাবে। প্রজারাও আপনাকে পছন্দ করবে !"

তলতাদেবী বললেন, "আর-একবার ওই কথা উচ্চারণ করলে একটা একটা করে তোমার দাঁত খুলে নেওয়াব ! আমি আর এক মুহূর্ত এখানে অপেক্ষা করব না। তুমি নরকে যাও !"

মহারানি শিবিরের দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই প্রথমে ঢুকল দু'জন সৈন্য, তাদের হাতে খোলা তলোয়ার। তারপর আরও দশ-বারোজন সৈন্য ঢুকে এসে গোল হয়ে দাঁড়াল।

চম্পক বলল, "শিকল দিয়ে বাঁধো এই নারীকে। সাবধান, দেখো, এই রমণী অতিশয় বুদ্ধিমতী। কোনওরকম দুর্বলতা দেখিয়ো না, শক্ত করে হাত বাঁধো !"

একজন সৈনিক শিকল ঝনঝনিয়ে এগিয়ে এল মহারানির দিকে।

তলতাদেবী সেই সৈনিকটির চোখে চোখ রেখে প্রবল ঘৃণার সঙ্গে বললেন, "ছিঃ ! তুমি উত্তর পাঞ্চালের মানুষ না ? তুমি এ-রাজ্যের মহারানির গায়ে হাত তুলছ ? তোমার লজ্জা করে না ? মহারাজ তোমাদের এজন্য কী শাস্তি দেবেন, সে ভয় নেই ?"

সৈনিকটা কোনও কিছু বলার আগেই চম্পক বলে উঠল, "এই সৈন্যদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করলে কোনও লাভ হবে না, মহারানি। এরা ভালভাবেই জানে, মহাচূড়ামণি আর বেশিক্ষণ মহারাজ থাকবে না। মহাচূড়ামণির আয়ু শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তী মহারাজ হব আমি !"

তলতাদেবী বুঝতে পারলেন, এতগুলি সৈনিকের সামনে কোনওরকম বাধা দেবার চেষ্টা করে লাভ নেই। তিনি সঙ্গে কোনও অস্ত্র আনেননি। মহারাজের কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আর কখনও অস্ত্র ধারণ করবেন না।

সেই সৈনিকটি মহারানির হাত দুটি শিকলে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গেল পিছন দিকে অন্য একটি তাঁবুতে। বাইরে তিনি একটা কোলাহল শুনতে পেলেন। নিশ্চয়ই তাঁর দেহরক্ষীদের সঙ্গে এখানকার সৈন্যদের লড়াই বেঁধে গেছে। সেই চারজন রক্ষী এতজন সৈন্যের বিরুদ্ধে কী করে দাঁড়াবে ! ওরা সাদা পতাকা উড়িয়েছিল, তবু এরা আক্রমণ করল ?

খানিক পরে চম্পক একটা ঝলসানো হরিণের ঠ্যাং কামড়াতে-কামড়াতে ঢুকল এই তাঁবুতে।

তলতাদেবী ঘৃণায় তার দিকে তাকালেন না।

চম্পক বলল, "আপনার চারজন দেহরক্ষীই শেষ হয়ে গেছে। একজনও পালাতে পারেনি। গুপ্তচরটিকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে !"

মাটির দিকে চোখ রেখে তলতাদেবী বললেন, "মানুষ এত দ্রুত বদলে যেতে পারে ? তোমাকে আমি স্নেহ করতাম, তুমি তার এই প্রতিদান দিলে ? রাজ্যের লোভে তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ ! পিঁপড়ের পাখা গজালে কী হয়, তুমি জানো না ?"

চম্পক বলল, "আমি শুধু-শুধু রাজ্যের লোভ করিনি, তলতাদেবী। সবরকম আটঘাট বাঁধা হয়ে গেছে। মহাচূড়ামণির এবার নিস্তার নেই। যথাসময়ে তুমি সব জানতে পারবে ! আঃ, মহাচূড়ামণি যখন ঘুম ভেঙে জানতে পারবে যে, তার প্রিয়তমা মহারানি আমার হাতে বন্দিনী, তখন তার মুখের অবস্থা কীরকম হবে ? সেই গণ্ডমূর্খটা নিশ্চয়ই হাই হাউ করে কাঁদতে শুরু করবে। আঃ, সেই দৃশ্যটা ভেবেই যা আনন্দ হচ্ছে আমার !"

মহারানি আর কোনও কথা বললেন না।

চম্পক জিজ্ঞেস করল, "এখন আপনি কিছু খাবেন তো ? খিদে পায়নি ?"

তলতাদেবী বললেন, "তুমি আমার সামনে থেকে চলে যাও !"

চম্পক বলল, "ঠিক আছে, একেবারে রাজধানীতে গিয়ে আমার পাশে বসে মহারানি হয়ে রাজভোগ খাবেন। ততক্ষণ উপবাসেই থাকুন !" (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

ধাঁধা

কথাটা অবশ্য ছোট্‌কা অনেকবারই বলে, কিন্তু আমিই খেয়াল রাখতে পারি না। তাই আবারও বকুনি খেলাম। কোথায় জামা কিনব, না তার বদলে প্রথমেই একটা ধাক্কা। তবে ধাক্কাটা সামলাতে পারলে জামাটা যে পাব, সেটা জানি। তাই আপাতত বকুনিটা অত কড়া মনে হচ্ছে না। আর ধাক্কাটা যে দুরূহ একটা ধাঁধা, এটা বুঝতে পেরেছি বলেই তোমাদের জানাচ্ছি। তোমরা নিশ্চিত সমাধান করে ফেলতে পারবে। আমার আগেই পারবে।

গোড়া থেকেই বলি ব্যাপারটা। সবসময় চোখ-কান খোলা রেখে দোকানপাট করবে, এ-কথা ছোট্‌কা বারবার বলে আমাদের। তা, কথাটা অত তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করিনি কখনও। আর তাই চট করে ধরা পড়ে গেলাম সেদিন।

সেদিন, মানে আমার জন্মদিনের আগের দিন। না, জন্মদিন কবে সেটা বলছি না। কেননা, মিষ্টি খেতে চাইলে, তখন ? তখন, কী

করব ? সে যাক। ছোট্‌কা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল একটা জামার দোকানে। দোকানের বাইরেই লেখা ছিল, অবিশ্বাস্য কম দামে দারুণ-দারুণ জামাকাপড়। সত্যিই তাই। জামাকাপড়গুলো দেখতে বাহারি, দামেও কম। আমি খুঁজছিলাম চেক-কাটা একটা জামা। দুটো জামা ঝুলছে শোকেসে, দুটোই আমার পছন্দসই। একটার দাম ৩৫ টাকা। অন্যটার দাম ৩০ টাকা। এ-দাম অবশ্য বিক্রির দাম, অর্থাৎ বাদ দিয়ে। আসল দাম একটার ছিল ৪০ টাকা, অন্যটার ৩৫ টাকা। দু'ক্ষেত্রেই পাঁচটা করে টাকা বাদ দিয়েছে দোকানদার। ছোট্‌কা বলল, "কোনটা কিনলে বেশি লাভ হবে আমাদের সতুবাবু ? সেটা যদি বলতে পারো, তা হলে জামা পাবে। আর তখন কোন্‌টা পাবে, সেটা আমার উপর ছেড়ে দাও।"

আমি তো হাঁ হয়ে গেছি। মুখে বাক্য নেই। আর তাই ছোট্‌কার ধমক খেলাম। "বলেছি না চোখ-কান খোলা রাখবে।" কান তো ছিলই, চোখও খোলা ছিল। কিন্তু বুদ্ধি খুলছে না। তোমরা বলতে পারো, কোনটা কিনলে বেশি লাভ হবে আমাদের ? এটাই **প্রথম ধাঁধা**।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ দুটো হাঁস দু' দিনে দুটো ডিম পাড়লে, চারটে হাঁস চার দিনে কটা ডিম পাড়বে ? খুব চটপট বলতে হবে।

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও, মানে বলো শব্দটার—

নানসিতক

গতবারের উত্তর ॥ (১) দুই বোন এক ভাই তাদের বাবা-মা ও ঠাকুর্দা-ঠাকুমা—এই সাতজনে মিলে এক পরিবার। সম্পর্কের হিসেবে হয় ২৩ রকম। (২) মাইনে ৯৫০ টাকা, ওভারটাইম ২৫০ টাকা। (৩) শপথ।

সত্যসন্ধ

কত কথা

এর আগে অনেকবার অক্ষর উলটে-পালটে এক শব্দকে অন্য শব্দে পরিণত করেছ। সেরকম আরও চারটি শব্দ দেওয়া হল। দ্যাখো তো এগুলোর অক্ষর উলটে-পালটে কোন্ কোন্ শব্দ পাও !

(ক) রজনী। (খ) রক্ষণ। (গ) বদল। (ঘ) ফসল।

২। এবারে কিন্তু সেই 'কোন্ বাচ্চা কাঁদে না ?—চৌবাচ্চা' ধরনের কথার মারপ্যাঁচ। উপস্থিতবুদ্ধি খাটিয়ে চটপট উত্তর দিতে হবে :

(ক) কোন্ বন গৃহ ? (খ) কোন্ গ্রহ স্থির ? (গ) কোন্ গম গান হয়ে ফলে ?

৩। নীচে দুই সারিতে আটটি শব্দ দেওয়া হল। জোড় মিলিয়ে এদের চারটি সার্থক শব্দে বাঁধতে হবে।

মৎস্য	রাক্ষস
মুদ্রা	সংকট
গিরি	তারা
নয়ন	কন্যা

উত্তর : ১। (ক) নীরজ (খ) ক্ষরণ (গ) বলদ (ঘ) সফল। ২। (ক) ভবন (খ) বিগ্রহ (গ) সরগম। ৩। মৎস্যকন্যা, মুদ্রারাক্ষস, গিরিসংকট, নয়নতারা।

কথক

মজার খেলা

এবারের মজার খেলাটা সত্যিই দারুণ মজার। কেননা, এর জন্য কোনও বাড়তি উপকরণ জোগাড় করতে হবে না। কাগজ-পেনসিল আর বোকা বানাবার জন্য বন্ধু থাকলেই হল। আর কিছু চাই না।

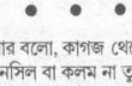

খেলাটা দেখানোও যায় যখন-তখন। খেলা দেখানো মানে সমস্যাটা বন্ধুদের সামনে তুলে ধরা। কাগজের উপর তিন সারিতে ন'টা বিন্দু এঁকে ফেলে বন্ধুদের দেখাও। ঠিক এইরকম—

এবার বলো, কাগজ থেকে পেনসিল বা কলম না তুলে এমনভাবে চারটে সরলরেখা আঁকতে হবে, যাতে কিনা ন'টা বিন্দুকেই স্পর্শ করে কোনও-না-কোনও রেখা। অন্যভাবেও বলতে পারো। তা হল এই যে, কাগজ থেকে কলম-পেনসিল না তুলে এমনভাবে চারটে সরলরেখা আঁকতে হবে যাতে প্রত্যেক রেখাতেই থাকে কোনও-না-কোনও বিন্দু এবং ন'টি বিন্দুকেই ছুঁয়ে টানা হয় রেখাগুলো।

যেভাবেই বলো, উত্তর একটাই। অর্থাৎ, ধরনটা এক। সে-তুমি যেখান থেকেই শুরু করো, আর যেখানে গিয়েই শেষ করো। সমাধানের ধরনটা দেখলেই বুঝতে পারবে, কেন এ-কথা বলছি।

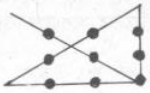

মজারু

ধাঁধানো ছবি

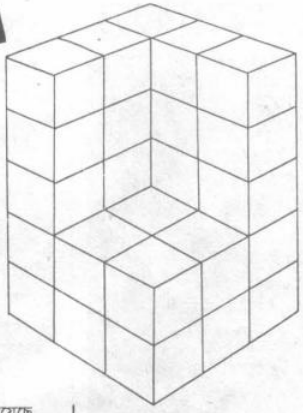

এখানে যে ছবিটা রয়েছে এটি অনেক ব্লক দিয়ে তৈরি। কতগুলো ব্লক আছে গুনে বলতে হবে। আর বলতে হবে যে ফাঁকা জায়গাটি আছে, ওখানে আর কতগুলো ব্লক বসালে জায়গাটি ভরে যাবে ? দ্যাখোই না চেষ্টা করে।

উত্তর : ব্লক আছে ৩৩টি। আরও ১২টি ব্লক বসালে জায়গাটি ভরে যাবে।

চিত্রক

হাসিখুশি

"আমাকে একবার কুড়ি কেজি ওজনের বোঝা মাথায় করে পাঁচ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল।"

"বুঝতে পেরেছি তোমার খুব কষ্ট হয়েছিল। প্রতি পদক্ষেপে মনে হত না কি পা ক্রমেই ভারী হয়ে যাচ্ছে ?"

"ঠিক তার উলটো। পাতলা চট দিয়ে মোড়া ছিল বরফ। প্রতি পদক্ষেপে এক আশ্চর্য অনুভূতি হচ্ছিল। ভারী বোঝা যেন ক্রমেই হালকা হয়ে যাচ্ছে।"

"ডাক্তারবাবু, আমার জন্যে কার্যকর কিছু একটা ব্যবস্থা করুন, এত জোরে আমার নাক ডাকে, একদম ঘুমোতে পারি না, সারা রাত জেগে কাটাতে হয়।"

"এক কাজ করুন, অন্য ঘরে শুয়ে দেখুন তো ঘুমোতে পারেন কি না।"

কিসের ফোটো

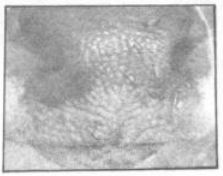

গত সংখ্যায় ছিল মাটির ভাঁড়-এর ফোটো

ফোটো : রবিন বিশ্বাস

ট্যানগ্রাম

বাড়িতে তোমরা সাতটি টুকরো দিয়ে নৌকো বানাতে পেরেছ কি ? না পারলে দেখে নাও এবারের নৌকোর ছবি। সঙ্গে রইল আরও দুটি নৌকো। এর পর আমরা বানাব খুব মজাদার একটা খরগোশের ছবি। এবারে একটি খরগোশের ছবি দিলাম। বাড়িতে দ্যাখো বানাতে পারো কিনা। না হলে আগামী সংখ্যায় সমাধানটা দেখো।

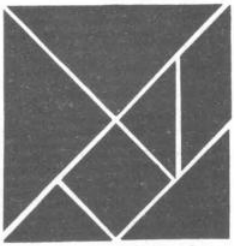

আরও একটি খরগোশও থাকবে কিন্তু আগামী সংখ্যায়।

প্রবীর

আঁকিবুকি

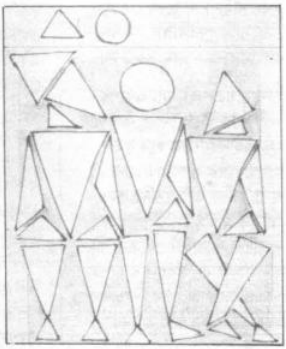

ওরা কাজ করে

এবারের ছবিতে অনেকগুলি ত্রিভুজ এবং দুটি বৃত্ত দেখতে পাচ্ছ। একটু বুদ্ধি খরচ করলে, ত্রিভুজ আর বৃত্তের ভেতর থেকে একাধিক ছবি খুঁজে পাবে। কাজ করছে এমন মানুষের ছবি। দ্যাখো না চেষ্টা করে।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কম্পিউটারে সাহিত্য-বিচার

গল্পে আছে : সারা জীবন লাইব্রেরিতে পুথিপত্র ঘেঁটে কাটিয়ে দিয়েছিলেন এক গবেষক এই তত্ত্ব প্রমাণ করতে যে, ওডিসি আসলে হোমারের লেখা নয়, হোমার নামেই অন্য একজনের রচনা !···এসব গল্প বানানোর মজা আর সহ্য করবে না কম্পিউটার । হোমার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জানিয়ে দেবে সে চোখের পলকে ।

ডেভিড প্যাকার্ড নামে এক সাহিত্যপ্রেমিক বিজ্ঞানী তৈরি করেছেন 'ইবিকাস' নামে এক অভূতপূর্ব কম্পিউটার, যা পুথিপত্র খোঁজখবরের বিপুল পরিশ্রম মুহূর্তে সমাধান করে দেবে ।

ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক বিদ্যা পড়তে গিয়ে শেষপর্যন্ত ১৯৬৭ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধ্রুপদী ভাষাতত্ত্বে পিএইচ.ডি করে ফেললেন প্যাকার্ড । ছাত্রাবস্থায়ই তিনি সাধারণ কম্পিউটারের সীমায়িত ক্ষমতায় বেশ অসুবিধায় পড়েছিলেন । তিনি দেখেছিলেন, চালু কম্পিউটারগুলি খুব বেশি মৌখিক তথ্য নিতে পারে না, এমনকী, অচেনা বর্ণমালা পড়তে বা লিখতেও সে তেমন পটু নয় । তখন তিনি এই সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ।

১৯৭৬ সালে আবিষ্কৃত হয় 'ইবিকাস' । ইবিকাস যে-কোনও প্রাচীন ভাষা পুনর্গঠনে সক্ষম, শব্দ-নির্বাচন বিষয়ে মুহূর্তে যে-কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে পারে । ব্যাকরণগত নানা প্রশ্নের মীমাংসাতেও সে পারঙ্গম, এমনকী ছন্দ এবং ধ্বনিতত্ত্বেও তার পাণ্ডিত্য অগাধ । গ্রিক এবং হিব্রু-সহ যে-কোনও প্রাচীন বর্ণমালা তার কাছে জলবৎ । প্লেটোর সম্পূর্ণ রচনাবলীর অনুপুঙ্খ বিচার করতে তাঁর সময় লাগবে মাত্র ৩০ সেকেন্ড ! প্যাকার্ড এই কম্পিউটারের নিজস্ব সাঙ্কেতিক ভাষা সৃষ্টি করেছেন, 'ইবিক্স' । এই ইবিক্স-এর সাহায্যে যাবতীয় প্রাচীন ভাষার প্রতিটি অক্ষরের চারিত্র্য খুঁজে পাওয়া খুব সহজ ব্যাপার । কেবল তাই নয়, প্রাচীন পুথির নষ্ট হয়ে যাওয়া পৃষ্ঠার লুপ্ত অক্ষর বা শব্দও সে যথাযথ বসিয়ে দিচ্ছে । আর, প্রাচীন যে-কোনও ভাষাকে আধুনিকীকরণের কাজেও তার অনায়াস দক্ষতা ।

তবে প্যাকার্ড নিজেই জানেন, শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে যন্ত্র কখনওই শেষ কথা বলতে পারে না । কেননা, সত্য এবং সুন্দর বিষয়ে যন্ত্র একেবারেই অন্ধ ও বধির ।

গৌতম ঘোষদস্তিদার

মুঘল বাদশাহদের নানা কথা

মুঘলশাহী । বাসুদেব মোশেল মিলিসানি পাবলিশিং কনসার্ন, কলকাতা-৯ । দাম:১০ টাকা

'মুঘলশাহী' নামকরণেই কিছুটা আন্দাজ করা যায় যে, এই বইতে থাকবে মুঘল বাদশাহদের সম্পর্কেই নানা কথা । ঠিক তাই । কীভাবে পালিত হত মুঘল বাদশাহদের জন্মদিন, তাঁরা কী খেতেন, কী যানবাহনই বা ব্যবহার করতেন, কেমন করে করতেন সিংহশিকার, আবার নিজের ভাই,এমনকী, নিজের পুত্রকে পর্যন্ত হত্যা করে কীভাবে নিতেন সিংহাসনের দখল, এসব কাহিনীই বলা হয়েছে গল্পচ্ছলে । মুঘল বাদশাহদের প্রতি বছর জন্মদিনে দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন নেওয়া হত । এ-অনুষ্ঠানের নাম তুলাব্রত । আকবরশাহের জন্য একটি মাত্র রুটি তৈরি হত দশ সের ময়দা, পাঁচ সের দুধ, দেড় সের ঘি, একপো লবণের সঙ্গে ছানার জল, আঙুর কিংবা বেদনার রস, বাদাম পেস্তা, কিশমিশ মিশিয়ে । চন্দ্রকান্ত নামে একধরনের মূল্যবান পাথর চাঁদের আলোয় ধরলে তা থেকে বেরিয়ে আসত বিন্দু-বিন্দু জল, আর এই ছিল আকবরশাহের পানীয় জল । মুঘল বাদশাহদের সম্পর্কে এই ধরনের নানা কৌতূহলকর কথা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এ-বইতে, কিন্তু বলবার ভাষাটি তেমন ঝরঝরে নয় ।

স্বপন সোম

একসঙ্গে অনেক ছড়া

নতুন দিনের ছড়া
সম্পাদনা : সমর পাল, গৌরাঙ্গ ঘোষ
ছোটদের কচিপাতা, কলকাতা
দাম : আট টাকা

ছোটখাটো রংচঙে ছড়ার সঙ্কলনটির নাম 'নতুন দিনের ছড়া' । ভূমিকায় দুই সম্পাদক জানিয়েছেন, "ছোটদের উপযোগী বেশ কিছু ভাল ছড়া দিয়ে এই সঙ্কলন সাজানো হল ।··· ছোটরা যাতে আবৃত্তি করতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই ছড়াগুলো নির্বাচন করা হয়েছে ।" প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিকদের মজাদার ছড়ার পাশে নবীনদের ছড়াও ছাপা হয়েছে যত্নের সঙ্গে । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অমিতাভ চৌধুরী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, হরেন ঘটক, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, বিনম্র বিশ্বাসের ছড়াগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । রাজা আর সেপাইকে নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন এক আশ্চর্য ছড়া :

সেপাই এসে যেই দাঁড়াল
রাজা বললেন, সেলাম,
সেপাই বলল, হঠাৎ যেন
বিড়ির গন্ধ পেলাম ।

নতুন দিনের ছড়ায় সবরকম বিষয় নিয়ে লেখা ছড়াই রয়েছে । শিল্পীদের ছবিগুলিও তারিফ করবার মতো ।

চুনীলাল রায়

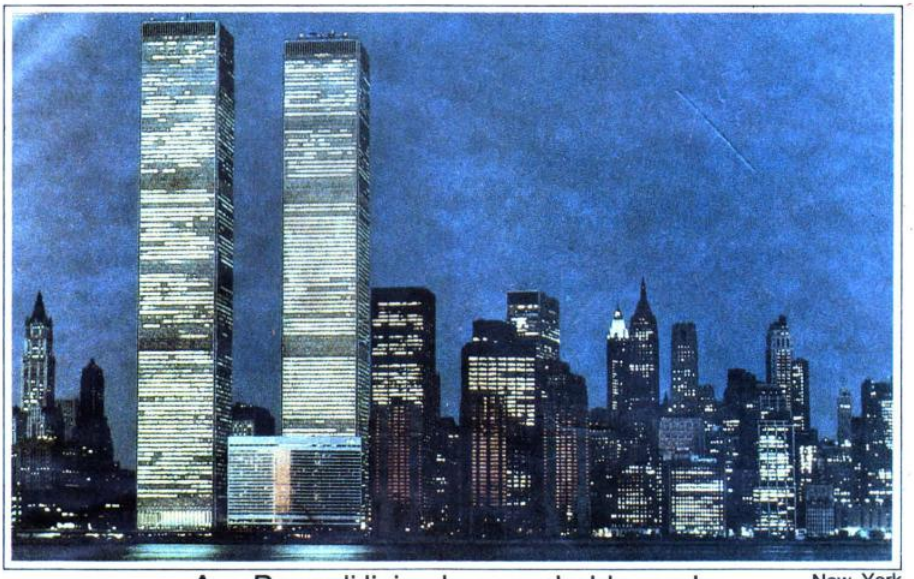

New York

Any Bengali living here probably reads Prabasi Anandabazar every week.

Prabasi Anandabazar was created exclusively
for the Bengalis living abroad.
Every week, we lead our readers to places of great interest.
We give them a complete package of news and features.
With topics ranging from politics to recipes; from
beauty-tips and fashion to literature and sport.
Thirty two pages with offset-printing clarity—
including eight pages in sparkling colour.
We sell the kind of quality that's tried and true.
We give advertisers an exclusive, affluent clientele
and a perfect environment.

Prabasi Anandabazar: The international weekly from The Ananda Bazar Group of Publications.

প্রবাসী আনন্দবাজার

ANANDAMELA 9 AUGUST 1989 REGD N
WB CC-264 MH-BY-SOUTH 683 TN MS(

Su-Fu

জাস্ট-এ-মিনিট নুড্‌ল'!
যেন মায়ের কোমল যত্নে ছোঁয়া

সুফু নুড্‌ল জাপানি কারিগরির কোমল যত্ন দিয়ে তৈরি, যা আজকের স্বাস্থ্যসম্মত আহারের সম্পূর্ণ উপযোগী। অনুপম স্বাদে ভরপুর সুফু সত্যিই নিমেষেই তৈরি করা যায়। সুফু—নতুন অনুপম স্বাদে ভরা জনপ্রিয় নুড্‌লটি খেয়েই দেখুন না।

দারুণ উপাদেয় স্বাদ

সুফু তৈরি করা হয়েছে খাঁটি ময়দা আর টাটকা ভোজ্য তেল দিয়ে সুপার টেস্টারে আছে এমন সব উপাদেয় উপাদান, যার দরুন কিছুতেই আর লোভ সামলানো যায় না। সুফু এমনই এক সহজ খাবার, যা তৈরিও করা যায় খুব সহজে। আর স্বাদ ? তার প্রমাণ তো একমাত্র সুফুই দিতে পারে।

খাদ্যগুণে ভরপুর

সুফু অত্যন্ত পুষ্টিকর সম্পূর্ণ আহার। এতে ক্যালোরির পরিমাণ অনেক বেশি। আর আছে পরিমিত কার্বোহাইড্রেট ও পরিপূর্ণ প্রোটিনও। সবচেয়ে বড় কথা—সুফু খুব সহজেই হজম হয়ে যায়। আর হ্যাঁ, সুফু সবরকমের প্রাকৃতিক গুণে ভরপুর।

জাপানি কারিগরির কোমল যত্ন

জাপানে কম্পিউটারে অভিজ্ঞগণেরা সমস্ত কাজই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনুমোদন করেন। অর্থাৎ সুফু আগাগোড়াই কম্পিউটারে তৈরি—মানুষের হাতের নাগালের বাইরে। অভিজ্ঞ খাদ্য বিশেষজ্ঞগণ এর গুণমান বিষয়ে সবসময়েই পুরোমাত্রায় সচেতন। নিপুণ কারিগরি বিদ্যার দরুন নুড্‌ল তৈরিতে এবার এল কোমল যত্নের ছোঁয়া।

সুফু-স্বাদে গুণে সবার সেরা

মামণির পছন্দ!